ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

[কন্যা শ্রীমতী সাধনার সহযোগিতায়]

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড

কলিকাতা—সাত

বিষয় সূচী

ভূমিকা ১

ব্রিটেন ২৪

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ৫১

হল্যাণ্ড ৯১

পশ্চিম জার্মানী ১০৩

সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ১৩৭

ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড ১৫০

শেষ কথা ১৮০

যাঁরা বিশ্বমানুষের মৌলিক একতা ও সততায় বিশ্বাসী এবং যাঁরা জাতি, ধর্ম ও মত নির্বিশেষে বিশ্বমানুষের সর্বজনীন কল্যাণে ব্রতী তাঁদের উদ্দেশে।

কৃতজ্ঞতা

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলবার্ট আইনষ্টাইন তাঁর নিগ্রো সমস্যার উপর লেখা প্রবন্ধটি এই বইয়ে ব্যবহার করতে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ২০০ কোটি ডলার অর্থাৎ মোট প্রায় ৩৮০০ কোটি টাকা ঃ— আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকারের মোট আদায়ী রাজস্বের চারগুণেরও বেশী। ম্যাসাচুসেট ইনষ্টিটিউট অফ টেকনিলজি। (M. I. T.) পাঁচ হাজার ছাত্রের জন্য বছরে ৩·২ কোটি ডলার বা প্রায় পনের কোটি টাকা খরচ করে। ভারতের জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি অথচ বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিত শিক্ষাব্যয় প্রায় সত্তর কোটি টাকা (১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে)।

অতএব পশ্চিমের অনুকরণে আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা আর্থিক কারণেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের নিজস্ব প্রণালী উদ্ভাবন অতি আবশ্যক। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ভারতের টাটা গবেষণাগার ও জাতীয় গবেষণাগারের ডিরেক্টরদের বেতন হল্যাণ্ডের বিখ্যাত কেমারলিঙ ওনেস বিজ্ঞানাগারের ডিরেক্টর বা হাইডেল্‌বার্গের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউটের সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী রিচার্ডকুনের চেয়ে অনেক বেশী। পশ্চিমের প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেছে। তার উন্নতির জন্যও আছে অবিরাম প্রচেষ্টা। লণ্ডনে স্যার জন কাস কলেজ দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে কথাপ্রসঙ্গে বলি—"অশিক্ষিত লোক জাতির বোঝাস্বরূপ" তৎক্ষণাৎ একজন তরুণ তীক্ষ্ণধী অধ্যাপকের মুখ থেকে জবাব এলো—"আপনি কি মনে করেন না যে, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক সমাজের আরও বড় বোঝা?" আমি বলি—"যদি শিক্ষাপ্রণালী সুষ্ঠু না হয়, তবে সে প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তি শুধু যে সমাজের বোঝাস্বরূপ তা নয়, সমাজের পক্ষে বিপজ্জনকও" মাথা নেড়ে তিনি সম্মতি জানালেন। অতএব একটি সুশিক্ষা-প্রণালী আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি অতি সত্য কথার অবতারণা করতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ কিলপ্যাট্রিক আলোচনা প্রসঙ্গে অত অল্প কথায় খুব সুন্দরভাবে তা ব্যক্ত করেছেন—"ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টির কাজ করতে হবে মুখ্যতঃ ভারতীয়দের, অন্যেরা গ্রহণযোগ্য ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে মাত্র" অনেক সময়ই আমরা এই অতি সহজ সত্য কথাটিকে ভুলে যাই।

এই সব দেশেই উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন। ফিনল্যাণ্ডে শতকরা নব্বই জন ফিনিস ভাষাভাষী এবং দশজন সুইডিস ভাষী। স্কুলে দুইটি ভাষাই শিক্ষার বাহন বলে স্বীকৃত। একটা বয়স পার হলে (এগার বৎসর) ফিন ছাত্ররা সুইডিস এবং সুইডিস ছাত্ররা ফিনিস ভাষা শেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ অধ্যাপকই ফিনিস ভাষায় শিক্ষাদান করেন কিন্তু সুইডিস ভাষায় শিক্ষাদানকারী অধ্যাপকও রয়েছেন। ছাত্ররা সবাই দুটি ভাষাই জানে বলে কোন অসুবিধা বোধ করে না। এইভাবে সংখ্যালঘুদের মনোভাবের প্রতিও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় কবি রুণেবার্গ তাঁর কবিতা লিখেছিলেন সুইডিস ভাষায়।

ইংল্যাণ্ডের অনেক ছাত্র ফরাসী বা জার্মান ভাষা শেখে বটে কিন্তু অধিকাংশ

ছাত্রই শুধু একটি মাত্র ভাষা জানে—সে তাদের মাতৃভাষা ইংরেজী। জার্মানীতেও দেখেছি অনেক বিখ্যাত লোক ইংরেজী বলতে জানেন না একেবারেই। এজন্য একটুও লজ্জিত নন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নাম করছি ঃ—হাইডেলবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ ই স্মিড্‌ট্‌, ফ্রাঙ্কফুর্টে পুষ্টি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডিমায়ার ও পাউল এরলিস ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর শ্রীযুত প্রিগে। অনেক শিক্ষা-বিদের সঙ্গে এই ভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে কোন লোক একথা চিন্তা করতেও পারে না যে পৃথিবীর কোন দেশে (ভারতবর্ষেও) মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষার বাহন হতে পারে। এমন কি ইংল্যাণ্ডে, যেখানে ইংরেজী ভাষার প্রতি পক্ষপাত স্বাভাবিক সেখানেও লণ্ডনের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নিকোলাস হানসের মতে ভারতবর্ষে মাতৃ-ভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। ভারতীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি পেয়েছেন এবং এখনো পাচ্ছেন। ভারতীয় ছাত্রের প্রতিভা বিকাশের জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা যুক্তিযুক্ত, ইংরেজী বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হতে পারে—এই তাঁর নিশ্চিত মত।

পশ্চিমের সমস্ত দেশের স্কুলেই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য অভিভাবকের আপত্তি থাকলে এই ক্লাশে হাজির থাকা ছাত্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। ইংল্যাণ্ডে প্রায় শতকরা পচানব্বই জন ছাত্র ধর্মশিক্ষার ক্লাশে যোগদান করে। ফিনল্যাণ্ডের হেলসিঙ্কি শহরের একটি স্কুলে দেখেছিলাম, সব ছাত্র ও শিক্ষক প্রথমে একটি প্রার্থনা-কক্ষে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন, তারপর ক্লাশে যান। সত্যিই এ বড় দুঃখের কথা, ভারতীয় শিক্ষায়তনে বর্তমানে কোন ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ ধর্মই ভারতীয় কৃষ্টি বা সভ্যতার মূল কথা। অনেকে ভারতবর্ষ ধর্মহীন রাষ্ট্র এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেন। ধর্মের কোন স্থান হবে না ভারতবর্ষ কখনো সেভাবে চিন্তা করতে পারে না। সকল ধর্মাবলম্বী যাতে সমান সুযোগ পায় সে ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ বহুধর্ম-সম্বন্বিত ফেডারেল রাষ্ট্র। এ ভাবেই তাকে দেখা একান্ত দরকার।

ইউরোপের দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। ব্রিটেনে মাত্র পঁচাশী হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাচ্ছে। হল্যাণ্ডে আটাশ হাজার, পশ্চিম জার্মানীতে এক লক্ষ বিশ হাজার, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছে প্রায় পঁচিশ লক্ষ ছাত্র। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করার আমেরিকার পদ্ধতি আমি পছন্দ করি। অবশ্য যদি উপযুক্ত সংখ্যক সুপণ্ডিত অধ্যাপক, সকল রকম সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদি থাকে এবং যোগ্য ছাত্রকেই শুধু ভর্তি করা হয়।

গত দু'শ বছরের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলেই আধুনিক পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। বিজ্ঞান শিল্পজগতে বিপ্লব এনেছে, এমন কি সমস্ত সমাজ-জীবনে কৃষি, পশুপালন

ও শিল্প—এই তিন বিষয়েই কল্পনাতীত উন্নতি সংঘটিত হয়েছে। সেইজন্যই বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করেছি, অনেক বিজ্ঞানাগার ও কারখানা দেখেছি। অনেক কৃতী বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ-আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে আমেরিকার অধ্যাপক আইনষ্টাইন, ডাঃ ওপেনহাইমার, ডাঃ কেণ্ডাল, অধ্যাপক ফ্রুমান, অধ্যাপক ফিজার, অধ্যাপক উডওয়ার্ড, অধ্যাপক ষ্টর্ক, অধ্যাপক হারমান, মার্ক, অধ্যাপক গারনিক, অধ্যাপক মেনার্ড ও অধ্যাপক সুমনার; পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক অটোহান, অধ্যাপক হাইসেনবার্গ, অধ্যাপক ফন লাওয়ে, অধ্যাপক রিচার্ডকুন, অধ্যাপক হাইনরিস্ ভিলাণ্ড, অধ্যাপক শ্লুবাক, অধ্যাপক শেঙ্ক, অধ্যাপক ফ্রয়ডেনবার্গ ও অধ্যাপক বনহোফার; ব্রিটেনের অধ্যাপক ফ্রেডারিক মেরিয়ান, অধ্যাপক হার্ষ্ট, অধ্যাপক রবার্টসন, অধ্যাপক স্প্রিং, অধ্যাপক কেণ্ডাল, অধ্যাপক আর পি লিনষ্টেড, অধ্যাপক রুডল্ফ পিটার্স ও মিঃ এন ডবলিউ পিরি।

অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে মনে হয়েছিল সন্ত—যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অধিকতর মানবদরদী। আমেরিকার নিগ্রো-সমস্যা নিয়ে লেখা তাঁর একটি ছোট প্রবন্ধ প্রিন্সটনে থাকা কালে পড়ি। গান্ধীজীর ভাবধারায় তা ওতপ্রোত। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে একথা তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু এটম বোমা শান্তি আনতে পারবে, এ বিশ্বাস তিনি করেন না। তাঁর পড়বার ঘরে মহাত্মা গান্ধীর একটি আলোকচিত্র আছে। গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন—"তিনি আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

জার্মানীর গ্যাটিংগেন শহরের অধ্যাপক অটোহান ইউরেনিয়াম পরমাণু খণ্ডিত করেন। তাঁর বিনয় আমাকে ভারতের প্রাচীন ঋষিদের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কাজ করেছি জানতে পেরে বললেন—"আমার সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল।" আমি অবশ্য তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলাম—"আপনার চেয়েও আমি ভাগ্যবান।"

"তাহলে আমাদের উভয়েরই কত সৌভাগ্য"—একথা স্বচ্ছন্দভাবেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি সকল বিখ্যাত বিজ্ঞানীর কাছ থেকে। এডিনবরার অধ্যাপক গাই ফ্রেডারিক মেরিয়াণের সঙ্গে যেমন সহজ ভাবে মিশতে পেরেছিলাম এমনটি আর কারো সঙ্গে পারিনি। তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে মনে হয়েছিল যেন এক পুরাতন বন্ধুর সাথে আলাপ করছি। দিলখোলা লোক তিনি। যে সময়টুকু তাঁর কাছে ছিলাম চিরদিন স্মৃতিপটে অটুট হয়ে থাকবে তা। প্রবাসে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গেই ভারতের বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করি। তাঁর মতামত অতি সুস্পষ্ট ও দ্বিধালেশশূন্য। আমি বলি (১) ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানাগারের বাড়ীঘর

খুব জমকালো না হওয়াই উচিত, (২) প্রথমে অধ্যাপক নিযুক্ত হবে এবং তাঁর নির্দেশে তৈরী হবে বিজ্ঞানাগার (৩) বিদেশী বিজ্ঞানীকে যদি নিযুক্ত করতেই হয় তবে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ভিন্ন অন্য কাউকে নয় এবং তাঁর বয়স যেন পঞ্চাশের বেশী না হয়। (৪) যে সব তরুণ বিজ্ঞানী গবেষণা-ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, গবেষণার জন্য মুক্ত হস্তে সাহায্য দিতে হবে তাদের। নূতন বিজ্ঞানাগার তৈরীর পূর্বে এদিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তিনি সাধারণভাবে আমার মত সমর্থন করে অধিকতর উন্নতির ইশারা দিলেন। তিনি বললেন যে, বিজ্ঞানাগার খ্যাতিলাভ করে অধ্যাপককে ঘিরে, কিন্তু বিজ্ঞানাগারকে ঘিরে অধ্যাপক খ্যাতিমান হন না। বিজ্ঞানাগার তৈরীর পূর্বে যদিও অধ্যাপককে সঠিক নিযুক্ত করা সম্ভবপর না হয় তবু এমন একজনকে চোখের সামনে রাখতে হবে যাঁর পরামর্শ নিয়ে তা তৈরী হবে। নিযুক্ত বিদেশী অধ্যাপকের বয়স সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—"পঞ্চাশ বলছেন কেন? চল্লিশের অনূর্ধ্ব হওয়াই বাঞ্ছনীয়"। পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। সাধারণভাবে উপরোক্ত অভিমতের স্বপক্ষে সকলেই মত প্রকাশ করেছেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন অধ্যাপক (অধ্যাপক হার্স্ট) ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে খুব দরদ দিয়ে কথা বললেন। বিদায় নেবার মুহূর্তে বলেছিলেন—"মনে রাখবেন, বেশ ভাল গবেষণা করেছে এমন অনেক ভারতীয় ছাত্রও ভারতে কোন কাজ পাচ্ছে না।"

মিউনিকের অধ্যাপক ভিলাণ্ডও তাঁর ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে খুব দরদী মন নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ অতি ধীমান রসায়ন অধ্যাপক উডওয়ার্ড যা বলেছিলেন সত্যিই তা খুব উৎসাহব্যঞ্জক। "ভারতীয় তরুণ রসায়নবিদের মধ্যে বেশ ধী-সম্পন্ন লোক আছেন। কার্যকরী কিছু করতে হবে, তাঁদের এ নির্দেশ না দিয়ে তাঁরা যা চায় সে কাজ করতে দিন এবং সুযোগ দিন। তাঁরা ফল দেখাতে সমর্থ হবেন।"

ভারতবর্ষের প্রয়োজনের দিক দিয়ে হেলসিঙ্কির অধ্যাপক এ, আই, ভিরতানেনের গবেষণা আমায় আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে বেশী। তাঁর গরুর খাদ্যরক্ষা ও বায়ুতে অবস্থিত নাইট্রোজেনকে জমিতে সাররূপে পরিবর্তিত করা বিষয়ক গবেষণা অনন্যসাধারণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যখন তাঁর বিজ্ঞানাগার ও কৃষিক্ষেত্র (ফার্ম) দেখতে যাই তখন তিনি ফিনল্যাণ্ডের বাইরে ছিলেন। তাঁর সহকর্মী শ্রীযুত মিত্তিনেন আমাকে তাঁর বায়োকেমিক্যাল ইনষ্টিটিউট দেখান এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণা ব্যাখ্যা করে বুঝান। ফিনল্যাণ্ডে বছরে প্রায় ৮ মাস বরফ পড়ে। কাজেই বছরের অধিকাংশ সময় তাজা শাকসব্জী উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না। ফিনল্যাণ্ড তাই খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভাইটামিন সরবরাহের জন্য উৎকৃষ্ট দুধ তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করে। গরু যে ঘাস খায় তার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে দুধের গুণ, এমন কি পরিমাণও। সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষিত

ঘাসের একান্ত দরকারী এ্যামিনো এ্যাসিড ও ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাপক ভিরতানেন ঘাস-সংরক্ষণের এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন যাতে ঐ সব অতি সামান্য পরিমাণেই নষ্ট হয়। প্রণালী অতি সহজ। পাতলা হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক এ্যাসিড মিশিয়ে ঘাসের পি এইচ (P. PH) মান ৩-৪-এর মধ্যে রাখা। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় ভারতে কয়েকমাস টাটকা সবুজ পশুখাদ্য পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ভিরতানেনের নূতনপদ্ধতি এদেশের পক্ষে উপযোগী কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এখানে একটি কথা বলা অবান্তর হবে না যে, পৃথিবীর মধ্যে ফিনরাই সবচেয়ে বেশী দুধ খায়। ফিনল্যাণ্ডে লোকে প্রোটিনও খায় সর্বাধিক;—গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ১০৪ গ্রাম। আর ভারতবর্ষে তার পরিমাণ দৈনিক মোটে তেতাল্লিশ গ্রাম। হেলসিঙ্কি হতে কুড়ি মাইল দূরে অধ্যাপকের ফার্ম দেখতে যাই। তাঁর ছেলে ঠিক সাধারণ চাষীর মত কাজ করছিলেন। সময় কম ছিল বলে ফার্মের স্বল্প মাত্র অংশই তিনি আমাকে দেখাতে পেরেছিলেন। আরো কিছু সময় ফিনল্যাণ্ডে থাকতে পারলে ভাল হত। গবেষণা কাজের জন্য ঐ ফার্ম খরিদের পর গত বিশ বৎসরের মধ্যে ফার্মে কোন নাইট্রোজেনযুক্ত কৃত্রিম সার ব্যবহার করা হয়নি। ক্লোভার ও লুসার্ণ প্রভৃতি কলাই জাতীয় গাছ লাগিয়ে এবং নানা জাতীয় শস্য পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন করে জমিতে প্রচুর নাইট্রোজেন সাররূপে ধরে রাখা হয়। কৃত্রিম নাইট্রোজেনযুক্ত সারের কোন প্রয়োজনই হয় না। শুধু তাই নয় তাঁর মতে, "জমিতে ক্লোভার ও লুসার্ণ উৎপন্ন করে জমির ক্ষয় নিবারণ, উর্বরাশক্তি সংরক্ষণ ও বর্ধন করার মত কার্যকরী অন্য কোন পন্থাই নেই।" ভারতের এই অতি প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত এবং হাতেকলমে পরীক্ষামূলক কাজ হওয়া দরকার।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক ভিরতানেনকে। ফিনল্যাণ্ডে ফিরে এসেই তিনি এবিষয়ে প্রকাশিত তাঁর সকল প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন। কিছু কিছু অবশ্য তাঁর সহকর্মী আমাকে আগেই দিয়েছিলেন।

এর পর হামবুর্গের অধ্যাপক শলুবাকের ঘাস নিয়ে গবেষণা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর গবেষণাগার দেখার সময় তিনি সংক্ষেপে নিজ পরিকল্পনা বিবৃত করেন। ভারতবর্ষের পক্ষে এরকম কাজের প্রয়োজনীয়তা খুবই তাই এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। তিনি যা বলেছিলেন অল্প কথায় তা হলো এই —গত একশো বছরে জার্মানীতে একর প্রতি মানুষের খাদ্য উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু ঘাস নিয়ে কোন সুনিয়ন্ত্রিত কাজ হয়নি। আমি বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের শ্রেণীবিভাগ করছি। কোন্ ঘাস একর প্রতি কত উৎপন্ন হয় তার কার্বোহাইড্রেট (শর্করা জাতীয় পদার্থ) ও প্রোটিন পরিমাণ কি এবং কোন্ সময়ে তাদের পরিমাণ সর্বাধিক হয়, কখন ঘাসকাটা দরকার এবং কোন্ ঘাস কেটে রেখে দিলে তার ভেতরকার খাদ্যবস্তু নষ্ট হয় এবং কোন্ ঘাস বেশীদিন রাখা যায় ইত্যাদি

বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি। এই গবেষণা শেষ হলে আমরা হয়তো এমন প্রণালী বের করতে পারব যাতে সব পরিমাণ জমিতে উৎপন্ন ঘাসের খাদ্যমূল্য দ্বিগুণ হবে। ফলে তাতে মানুষের খাদ্যের পরিমাণই বাড়বে।

ইংল্যান্ডে রথামস্টেডের মিঃ এন ডবলিউ পিরির গবেষণাও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর মতে ঘাসের প্রোটিনে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় সমস্ত এ্যামিনো এ্যাসিড রয়েছে। মানুষের খাদ্যে কিছু কিছু পরিমাণ জান্তব প্রোটিন অবশ্য থাকা দরকার ঐ গবেষণা সে বিশ্বাসের মূলে আঘাত করতে পেরেছে। অতএব আমরা যেসব শাকপাতা খাই তা হতে অত্যাবশ্যক সমস্ত এ্যামিনো এ্যাসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে পারি কিনা সে বিষয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। এতে একটি বিরাট সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে, কারণ জান্তব প্রোটিন ব্যয়বহুল বলে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক তা পায় না।

ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের কয়েকটি কারখানা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র উচ্চতম হারে বেতন দিয়েও জগতের অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করে অনেক জিনিস বিক্রী করে। ১৯৫৩ সালের ১৪ই এপ্রিল দর্শক হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপস্থিত ছিলাম। সেটা ছিল বাজেট পেশ করার দিন। মিঃ বাটলার, চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী) তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, মজুরীর হার বৃদ্ধি সম্ভব নয়, কারণ তাতে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে এবং অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। নটিংহাম হতে নির্বাচিত এক শ্রমিক দলের সদস্য এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে মিঃ বাটলার অযোগ্য পুঁজিপতিদের মুখপাত্র। যুক্তরাষ্ট্রে অনেক উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয় তথাপি সেখানকার অনেক জিনিস সস্তাদরে বিক্রী হয়। কথাটি আমি বিশেষভাবে মনে রাখি এবং ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাগুলি দেখার সময় সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করি। ইংল্যান্ডে গ্ল্যাকসো লিমিটেড ও বারোজ ওয়েলকাম কারখানার সর্বনিম্ন মজুরী সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ডের সামান্য কম (প্রায় পনের ডলার) কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনের হেডেন কেমিক্যাল করপোরেশনে সর্বনিম্ন মজুরী ষাট ডলার এবং নায়াগারা শহরে হুকার কেমিক্যাল কোম্পানীতে বাহান্ন ডলার। অথচ আমি জানতে পারি হেডেন কেমিক্যাল কোম্পানীর তৈরী পেনিসিলিন প্রভৃতি ওষুধ বারোজ ওয়েলকাম ও গ্ল্যাকসোর তৈরী ঐ সব ওষুধের চেয়ে সস্তা। এর দুটি কারণ আমাকে বলা হয়—(১) অধিকতর উৎকর্ষের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও (২) দক্ষতাপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থা। এই সব দেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। দেখলাম বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী নিযুক্ত রয়েছেন কারখানাগুলিতে। নিউজার্সির রহাওয়েতে মার্কের কারখানায় প্রায় ৫

শত রসায়নবিদ কাজ করছেন। প্রত্যেক আধুনিক কারখানাতেই পুরোপুরি সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ গবেষণাগার রয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডের একটা জিনিস খুবই ভাল লাগল, বৈজ্ঞানিক কারখানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সুনিবিড় সহযোগিতা। বড় বড় রাসায়নিক কারখানাগুলি রাইসষ্টাইন, রুৎসিসকা ও কারারের ন্যায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর উপদেশ ও নির্দেশ পাবার সুযোগ পেয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে কয়লা নেই, কোন আলকাতরাশিল্পও নেই। কৃত্রিম রং, ওষুধ প্রস্তুতের জন্য আমেরিকা ও জার্মানী হতে আলকাতরাজাত দ্রব্য ক্রয় করে কিন্তু তার কৃতিত্ব এই যে সে আমেরিকা ও জার্মানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কৃত্রিম রং ও ওষুধ তৈরী করে সরবরাহ করে। বাজেল শহরে সিবা কোম্পানীর ওষুধ তৈরী বিভাগের কিছুটা অংশ আমি দেখেছি। সর্বতোভাবে আধুনিক তা।

সুইডেনের সোয়েডারফোর্স ইস্পাতের কারখানা দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। এই কারখানায় খুব উঁচুদরের এবং মরচে-না-ধরা ইস্পাত তৈরী হয়। সুইডেনে যথেষ্ট লৌহ আকরিক আছে কিন্তু কয়লা অতি সামান্যই পাওয়া যায়। কাজেই সুইডেন লক্ষ লক্ষ টন লোহা তৈরীর কথা ভাবতেও পারে না। তাই অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ উঁচুদরের ইস্পাত তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করেছে। সুইডেনের ইস্পাত উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত। সোয়েডারফোর্স কারখানার শ্রমিকদের জীবনধারণের মান বেশ সন্তোষজনক।

হেলসিঙ্কিতে বিখ্যাত মৃৎশিল্পের কারখানা এরেবিয়ার (Arabia) চৌদ্দশত কর্মচারীর মধ্যে প্রায় এক হাজার মহিলা। যে সমস্ত চীনামাটির বাসন সেখানে তৈরী হচ্ছে তা সত্যিই সুষ্ঠু ও মনোমুগ্ধকর এবং মহিলা-কর্মীরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সাধারণ মহিলা-কর্মীর (বিশেষজ্ঞ নন) মাসিক বেতন ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০০ টাকা। যে কাজ তাঁরা করেন বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত মেয়েদের পক্ষে তা খুবই উপযোগী।

ব্যবসায়ী মাত্রেই ভাব-আবেগশূন্য বাস্তববাদী, এই সকলের ধারণা। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখেছি প্রিন্সটনের হেডেন কেমিক্যাল কর্পোরেশনের ডাঃ হারমান শোকোল ও ন্যুরেনবার্গের এম এ এন কারখানার কার্ষ্টানিয়েনকে। এ দুজনকেই দিলখোলা সাদাসিধে লোক বলে মনে হল। এখানে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এম এ এন কোম্পানীর শতকরা পঁচাশী ভাগ গত যুদ্ধের সময় বোমায় ধ্বংস হয়। নূতন তৈরী কারখানা নিঃসন্দেহে পুরানো কারখানার চেয়ে অনেকগুণ ভাল। পুরানো কারখানার সামান্য কিছু অংশ এখনো অবশিষ্ট আছে।

এই সমস্ত কারখানা দেখছিলাম এবং কখনো কখনো বিজ্ঞানের অবদানের কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছিলাম। কিন্তু একটি চিন্তা সেই সঙ্গে ব্যথিত করছিল আমাকে—এ সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকাংশই বিজ্ঞানে অনগ্রসর দেশগুলিকে শোষণ করে। নব-জাগ্রত জার্মানী ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের মতই তার তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ভারত, আফ্রিকা

প্রভৃতি দেশে বিক্রী করতে চায়। শোষক ও শোষিত উভয়েই পরিণামে দুঃখের ভাগী হয়। ইহাই প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। অতীতে শিল্পক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সংঘটিত হয়েছে যুদ্ধ, যার পরিণতি ধ্বংস ও এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ অধিকার।

আমাদের দেশে কিছু লোকের ধারণা যন্ত্রীকরণই পশ্চিমের কৃষির উন্নতির প্রধান কারণ। আমার অভিজ্ঞতা, তা সত্য নয়। আমার মতে যে সমস্ত কারণ কৃষিজগতে যুগান্তর এনেছে তা মুখ্যতঃ—ভাল বীজ নির্বাচন ও তা কৃষকদিগকে সরবরাহের সুব্যবস্থা, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া, একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও জলসেচের ব্যবস্থা। অবশ্য বৃষ্টিপাত, তার পরিমাণ ও সমস্ত বৎসরে বণ্টন, স্থানীয় তাপমাত্রা ও জমির উৎকর্ষতা—এ সমস্তই কৃষির প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। ইংলণ্ডে বৃষ্টিপাত পশ্চিম বাংলার চেয়ে অনেক কম। আর বৎসরের সব সময়েই সমানভাবে 'টিপ-টিপ করা' বৃষ্টি পড়ে। কাজেই আমাদের চাষের প্রকৃতি ভিন্নরূপ হতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রীকরণ সর্বাধিক। কারণ, লোকাভাব। ইউরোপে তেমনটি নয়। আমাদের দেশে তো লোকের যথেষ্ট কাজ নেই। যুক্তরাষ্ট্রে কম লোক দিয়ে যাতে বেশী কাজ করা যায় এরূপ যন্ত্রপাতি তৈরীর প্রয়োজনীয়তা বেশী। আর ভারতবর্ষে বেকারীই আসল সমস্যা। এর অর্থ এই নয় যে আমরা যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করব না। কিন্তু যেভাবে হোক অল্প লোক দিয়ে বেশী কাজ করাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়। যন্ত্রীকরণের পরিমাণ যাই হোক না কেন, পশ্চিমের প্রত্যেক দেশ কিন্তু কৃষককে ভাল বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের দেশে এবিষয়ে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়নি। অথচ শুধু এই একটি কাজ করেই আমরা খাদ্যদ্রব্য উৎপন্নের পরিমাণ অন্তত শতকরা পনর ভাগ বাড়াতে পারি, অন্য সব ব্যবস্থা পূর্বের মত থাকলেও। মানুষের মত উদ্ভিদেরও সুষম খাদ্য প্রয়োজন। তাই জমিতে সার দেওয়ার সময় এই অতি মূল্যবান তথ্যটি মনে রাখা দরকার। নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম সুষমসারের মুখ্য উপাদান। আমি দেখেছি ইউরোপের জমিতে ঠিকমত হারে ঐ সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়। প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, জমিতে কলাই জাতীয় গাছ উৎপন্ন করে প্রয়োজনের সবটা না হলেও আংশিক-ভাবে সাররূপে বায়ুতে অবস্থিত নাইট্রোজেনকে জমিতে ধরে রাখা সম্ভব। অতএব কৃত্রিম নাইট্রোজেনযুক্ত সার না দিলেও চলতে পারে। কিন্তু ফস্‌ফরাস্, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের যৌগিক পদার্থ সাররূপে দিতেই হবে। আমাদের দেশে ফস্‌ফরাস ও ক্যালসিয়াম জোগায় প্রধানতঃ মৃত পশুর হাড়। দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের সরকার হাড়ের গুঁড়ো ও ঐ জাতীয় জিনিস বিদেশে রপ্তানী করার অনুমতি দেয়। ফলে হাড়ের অধিকাংশ পরিমাণ (প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) বিদেশে চালান যায়। অন্যদিকে সিন্ধ্রি সারকারখানা চালু হওয়ার পর থেকে য়্যামোনিয়াম সালফেট

ব্যবহারের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। এ হলো বিজ্ঞানের অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বা অপব্যবহার। এর পরিণাম খুব ক্ষতিকর হতে বাধ্য। যে কোন ভাবেই হোক ভারত সরকারের হাড় রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া সংগত। তাদের দেখা উচিত যেন জমিতে সুষমসার দেওয়া হয়।

ভার্জিনিয়ার (আমেরিকা) গর্ডনস্ভিল নামক স্থানে আশে-পাশের কৃষিজীবীদের কল্যাণের জন্য তৈরী প্রায় চল্লিশ একরের একটি ফার্ম দেখি। কৃষকরা সেখানে যায় এবং কত খরচে কত শস্য উৎপন্ন হয়, কি ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয়, কি পরিমাণ সার জমিতে দেওয়া হয় ইত্যাদি সব জানতে পায়। যাতে তারা জ্ঞানলাভ করে লাভবান হতে পারে সেই জন্যই এ ব্যবস্থা। সেখানে প্রতি একরে একশো বুশেল (এক বুশেল=ষাট পাউন্ড) বা তিয়াত্তর মণের কিছু বেশী ভুট্টা উৎপন্ন হয়। প্রতি একরে এক হাজার পাউন্ড সার ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে এ শ্রেণীর পরীক্ষামূলক ফার্মের প্রয়োজনীয়তা খুবই।

গো-পালন ব্যাপারেও প্রধান জিনিস—উপযুক্ত খাদ্য ও প্রজননের সুব্যবস্থা, যন্ত্রীকরণ নয়। যুক্তরাষ্ট্রে দুধ দোয়ার জন্য বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা (রটোল্যাক্টার) দেখেছি। অথচ হল্যান্ডে দেখলাম এক কৃষকের আঠারটি গরু দৈনিক ৩৫০ লিটার বা প্রায় দশ মণ দুধ দেয় কিন্তু সবটাই দোয়ান হয় হাতে। গ্রীষ্মকালে গরুকে দিনরাত খোলা জায়গাতেই রাখা হয়। তাতে গরুর অসুখ কম হয়। আমাদের দেশের মত আমেরিকায়ও যেসব গরুর দুধ অধিক তারা বেশী পরিমাণে ওলান ও বাঁটের রোগে (Mastitis) ভোগে। অবশ্য এ রোগ আমেরিকায় অনেক পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়েছে। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিনচারের সৌজন্যে দেখতে পেয়েছিলাম কিভাবে তাঁরা এ রোগের প্রতিষেধক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। খাদ্য সম্বন্ধেও দেখেছি অধ্যাপক ভিরতানেনের ফার্মে গরুকে কোন কলাই, ভুষি জাতীয় নাইট্রোজেন সমন্বিত জিনিস খাওয়ানো হয় না, শুধু লুস্যার্ণ ও ক্লোভার খাওয়ান হয়। তা সত্ত্বেও ঐ ফার্মে একটি গরু সর্বোচ্চ পরিমাণ দুধ দিয়েছে বছরে ৫৭০০ কিলোগ্রাম (প্রায় ১৫৩ মণ।) ঐ দুধে মাখনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৭০ কিলোগ্রাম—প্রায় ৫৯৪ পাউন্ড এবং চর্বির পরিমাণ শতকরা ৪·৭ ভাগ। ইংল্যান্ডের সাধারণ গরুর যে দুধ তাতে চর্বির অংশ শতকরা ৩·৬ ভাগ, আর চ্যানেল দ্বীপের (জার্সি গারনসি) গরুর দুধে চর্বির অংশ ৪·৪ ভাগ। দুধ উৎপাদনের ব্যাপারে গরুর চেয়েও উন্নত ষাঁড়ের স্থান উচ্চে। তাই কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা ক্রমেই বেশী করা হচ্ছে, যেন পরীক্ষিত ষাঁড়ের প্রয়োগ সর্বাধিক হতে পারে। পশ্চিমের যে সব দেশ দেখেছি সর্বত্রই প্রচুর দুধ পাওয়া যায়। সাধারণত উত্তাপের সাহায্যে বীজাণুমুক্ত দুধ সরবরাহ করা হয়। অবশ্য এমন লোকও সেখানে আছেন যাঁরা দুধকে না ফুটিয়ে বা উত্তাপের সাহায্যে বীজানুমুক্ত না করেই পান করেন। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই ঠাণ্ডা দুধ খায়। ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম,—

"যে ঠাণ্ডা দুধ খায় সে মূর্খ—।" শুধু বাংলাদেশ কেন, সারা ভারতের বেলায়ই তা খাটে। কিন্তু ইউরোপে বীজানুমুক্ত দুধ সরবরাহ করা হয় বলে একথা প্রযোজ্য নয়। পশ্চিমে সূর্যকিরণ আমাদের দেশের মত প্রচুর নয়, তাই সে সব দেশে গরুর দুধের মারফতে যক্ষ্মাবিস্তারের সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু এরোগও একপ্রকার নির্মূল করা হয়েছে। লণ্ডনে 'ইউনাইটেড ডেইরী' দেখে খুশী হয়েছিলাম। শহরের দৈনিক সরবরাহ ষাট হাজার মণের মধ্যে এই ডেইরী যোগান দেয় পঁচিশ হাজার মণ দুধ। বোম্বে সরকার 'আরে কলোনী' হতে বীজানুমুক্ত দুধ সরবরাহের চেষ্টা করছেন। দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজার মণ সরবরাহ হয়। কিন্তু সবটাই মহিষের দুধ। মহিষের দুধ শিশুদের উপযোগী নয়, অধিকন্তু এখানে দুধের দামও বেশী। ইংল্যাণ্ডে এক সের দুধের দাম প্রায় সাড়ে এগারো আনা, পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় আট আনা, কিন্তু বোম্বেতে চৌদ্দ আনা। 'আরে কলোনী' দেখার সময় গরুর দুধ সরবরাহ করা সম্ভবপর কিনা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। বোম্বে সরকারের মিল্ক কমিশনার বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভবপর নয় এবং যখন হবে তখনও দাম আরো বেশী হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের জীবনীশক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ভাল গরুর দুধ সরবরাহের উপর। কাজেই যতদিন পর্যন্ত সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার হিসেবে স্বল্পমূল্যে তা না হয়, ততদিন কোন সরকারই আত্ম-তুষ্টি লাভ করে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

এই আমার প্রথম পশ্চিম ভ্রমণ। বাইরের নানা পার্থক্য সত্ত্বেও মানব-প্রকৃতি যে মূলগতভাবে এক, এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। ভারতীয় কৃষ্টির আসল কথা পরিবর্তনধর্মী রক্ষণশীলতা। ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিমের আরো কয়েকটি দেশের বেলায়ও সে কথা খাটে। ইউরোপে অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা গভীর ঘৃণার ভাব বর্তমান। উপনিবেশ অধিকারে রাখার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত নানা জাতকে শোষণের প্রতিযোগিতা, জাতিবিদ্বেষ এবং গত যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা এর কারণ। হল্যাণ্ডে প্রবেশ করবার পূর্বে জার্মান ভাষায় কথা না বলার জন্য আমাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল।

ইউরোপের ছোটবড় কোন দেশই অন্য কারো প্রভুত্ব পছন্দ করে না। কিন্তু তারা পৃথিবীর অন্য দেশকে অনগ্রসর এই অজুহাতে পদানত রাখতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি, উপনিবেশ পরিত্যাগ করার কথা শুনলে ক্ষুব্ধ হয়। তাদের আচরণের নিয়মকানুন দুই প্রকারের। এক,—নিজেদের জন্য; আর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কানুন এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীদের জন্য। এঁদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাবিদ্ তাঁরা উপলব্ধি করছেন অবশ্য এই অসংগতি। একজন ইংরেজ বন্ধুর সংগে কথাপ্রসংগে নিম্নোক্ত মন্তব্য করি। উপস্থিত সকলেই এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। আমি বলি,—"ইংরেজ চরিত্রের দুটো দিক আছে। নিজের দেশে স্বাধীনতার মর্যাদা তারা

যথেষ্ট দেয়। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী ও কসুথের মত বিপ্লবী দেশপ্রেমিককে তারা আশ্রয় দিয়েছিল। দেশ হতে পলাতক অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে বাস করার সময়ই কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত "মূলধন" (Das Kapital) পুস্তক লেখেন। কিন্তু সেই ইংরেজরাই আবার উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এমন কি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণও জানে না তাদের শাসনকর্তারা কি রকম অত্যাচার চালায় ঐ সব উপনিবেশে। স্বাধীনতা-প্রেমী ইংল্যাণ্ডকেই আমি ভালবাসি, কিন্তু যে ইংল্যাণ্ড কোন না কোন ভাবে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব চায় আমি তার বিরোধী। ইংরেজ চরিত্রের শেষোক্ত দিকের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের সংগ্রাম।"

যুক্তরাষ্ট্রে, একটা জিনিস লক্ষ্য করে আনন্দ পেয়েছি। ইউরোপের নানাদেশ হতে আগত লোক মিলেমিশে এক জাতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরও খুশী হতাম যদি এদেশের নিগ্রোদের সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারতাম। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে যা দেখেছি উত্তর অঞ্চলে তা দেখা যায় না। ভার্জিনিয়ার অরেঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। একটি শ্বেতজাতির ও অন্যটি নিগ্রোদের জন্য। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো আছে। অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে অবস্থিত আমেরিকাবাসী উপলব্ধি করেছেন যে, জাতিগত বৈষম্য গণতন্ত্রবিরোধী। আমার মনে হয় অনেকের যা ধারণা তার চেয়েও অনেক কম সময়ে যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে।

খুব গভীরভাবে না দেখলেও যে কোন ইউরোপ ভ্রমণকারীই বুঝতে পারে যে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের অবস্থা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের চেয়ে ভাল। অথচ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ রয়েছে। ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের সে সব কিছুই নেই। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবে যদি উপনিবেশসমূহের উপর অধিকার ছেড়ে দেয়। হল্যাণ্ডে এক ওলন্দাজ বন্ধু খোলা-খুলি ভাবেই বলেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব দেশের নৈতিক অধঃপতন ঘটায় এবং উপনিবেশ লোপ পেলে হল্যাণ্ডের কল্যাণই হবে। দুঃখের বিষয় যে, ফ্রান্স একদিন সারা ইউরোপের বিশাল এক কৃষ্টিকেন্দ্র ছিল, আমার ধারণায় তা আজ অবনত ও ধ্বংসোন্মুখ।

সমগ্র ইউরোপের কোন দেশকেই পশ্চিম জার্মানীর মত এরূপ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। জার্মানীকে এমন কি বার্লিন শহরকেও পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত করা, যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংস,—সারা জার্মানীকেই সমস্যা-সংকুল করেছে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে—যে ভাবে অসংখ্য শরণার্থীর আগমন হয়েছে,—অভূতপূর্ব তা। চারকোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এক কোটি শরণার্থী এসেছে। অথচ পশ্চিম জার্মানী হতে প্রায় চলে যায়নি কেউই। এর পরিণতির স্বরূপ বোঝা কঠিন নয়। কারণ শরণার্থী সমস্যার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। ভারতে

পঁয়ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় একাশী লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তান থেকে এসেছে। ভারত হতে পাকিস্তানে গিয়েছে ছয়ষট্টি লক্ষ। বাড়তিসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র পনর লক্ষ। তবুও ভারতবর্ষের শরণার্থীসমস্যা সমাধান তো দূরের কথা, প্রায় সারাক্ষণই "কাঁদুনি গাওয়া" চলেছে এ সমস্যার ব্যাপকতার! পশ্চিম জার্মানীর নিকট হতে আমাদের শাসকবর্গের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বহুসংখ্যক শরণার্থী আগমণ সত্ত্বেও সমস্ত পশ্চিম জার্মানীতে—বেকারসংখ্যা মাত্র পনর লক্ষ। বার্লিনের উপকণ্ঠে "জি বাড মারিয়েন ডর্ফ" নামক স্থানে এক শরণার্থী-শিবির দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে শরণার্থীদের যে খাবার দেওয়া হয় আমার মনে হয় শতকরা একটি বাঙ্গালী পরিবারও সেরূপ পায় না। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশু দৈনিক ¾ লিটার বা সাড়ে তের ছটাক দুধ পায়। ছয় হতে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সবাই পায় নয় ছটাক, চৌদ্দ বছরের উপরে সবাই পায় সাড়ে চার ছটাক। পাঁউরুটি যে যতটা খেতে পারে। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সবাইকে দেওয়া হয় শুধু মাখন। তার চেয়ে বেশী বয়সের সবাই অর্ধেক মাখন ও অর্ধেক মার্গারিন (দাল্‌দা জাতীয় জিনিস) পায়। ডিম দেওয়া হয় প্রতিদিনই। টাটকা সব্জী, ফল, মাংস প্রভৃতিও আছে।

পশ্চিম জার্মানীতে কোন খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ নেই। বিভিন্ন রকমের দ্রব্যসামগ্রীতে খাবারের দোকানগুলি ভর্তি। দুধ পাওয়া যায় প্রচুর।

পশ্চিম জার্মানীর শতকরা প্রায় চল্লিশটি বাড়ী বোমায় ধ্বংস হয়েছিল। বাসঘরের অভাব এখনও বেশ। তবু বহু বিধ্বস্ত—হামবুর্গ শহরে দেখলাম বাড়ীভাড়া কোলকাতার বা বোম্বের চেয়ে অনেক কম। নূতন তৈরী যে ফ্ল্যাটের ভাড়া দেখলাম সত্তর জার্মান মার্ক বা প্রায় ঊনাশি টাকা, তা কলকাতায় কোনক্রমেই ২০০ টাকার কমে পাওয়া যায় না, বরং বেশীই হবে।

হামবুর্গে একটি নূতন তৈরী বিদ্যাভবন দেখলাম। অতি সুন্দর ও মনোরম। সামনে নয়নমনোমুগ্ধকর ফুলের বাগান। এমনটি সারা ইউরোপ ও আমেরিকার কোথাও দেখিনি।

নূতন তৈরী কারখানাগুলি পুরাতনের চেয়ে অনেক ভাল—তুলনাই হয় না। এখনও পশ্চিম বার্লিন নিউইয়র্ক সহরের চেয়ে পরিষ্কার। নিউইয়র্ক অবশ্য লণ্ডনের চেয়ে পরিচ্ছন্ন। মিউনিকে অধ্যাপক হুইচ্‌গেন যে কথা বলেছেন তা সত্যই জার্মান মনের প্রতিবিম্ব। যে বিখ্যাত বিজ্ঞানাগারে লিবিগ, বায়ার, ভিলষ্ট্যাটার ও ভিলাণ্ডের ন্যায় খ্যাতনামা রসায়নী কাজ করেছেন তা আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। অধ্যাপক হুইচ্‌গেন সেখানে একটি নূতন বিজ্ঞানাগার তৈরীর পরিকল্পনা করছেন। তিনি বললেন—"অনেক খ্যাতনামা লোক এই বিজ্ঞানাগারে কাজ করে গিয়েছেন। তাহলেও একে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানাগার বলা চলে না। যদি বোমায় ধ্বংস না হোত তা'হলে সম্ভবতঃ আমরা এখানে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানাগার

তৈরীর সুযোগ কখনও পেতাম না।" জার্মানজাতি অতীতের জন্য বৃথা অশ্রু-পাত করে না, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তারা। আমার কোন সন্দেহ নেই যে এক অধিকতর উন্নত জার্মানী গড়ে উঠছে। আমার মনে হয় যারা জীবন দিয়েছে তাদের চিতাভস্মের উপর নূতন জার্মানী আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমেরিকার একজন নামী বিজ্ঞানী আমার চিঠির জবাবে লিখেছেন—"আপনি ইউরোপ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক। এবার গ্রীষ্মকালে আমরা ইটালী থেকে জার্মানীর ভেতর দিয়ে, ফিরে আসি। ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় জার্মানী যেরূপ তাড়াতাড়ি পুনর্গঠন করতে পেরেছে তা সত্যিই মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। শুধু তাই নয় অন্য দেশের পক্ষে তা একটু ভীতিপ্রদও। আমেরিকাবাসী ইউ-রোপের নানা জাতির মিশ্রণে গঠিত। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির ভেতরকার সীমাহীন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মনোভাব আমাদের মনে খানিকটা নৈরাশ্য এনে দেয়।" হাইডেলবার্গ হতে স্টুটগার্ট যাওয়ার পথে একজন ইংরেজ সহযাত্রী পশ্চিম জার্মানীর অসাধারণ পুনর্গঠন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছিলেন,—"ইংলণ্ড যেন জার্মানীর জন্যই যুদ্ধ জয় করেছে।"

জার্মানীকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে ভাগ করায় জার্মান জাতি অতি ক্ষুব্ধ। তাদের হাতে ছেড়ে দিলে এই মুহূর্তেই তারা এক হয়ে যাবে। জার্মানীর এ কৃত্রিম বিভাগ এক মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পেছনে মহামতি লিঙ্কনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কি করে তিনি এতে সম্মতি দিলেন, আমি বুঝতে পারি না। এই পশ্চিম ভ্রমণের ফলে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে যে, লিঙ্কনের প্রতিভা আমেরিকাকে রক্ষা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি উত্তর ও দক্ষিণ—এ দু-ভাগে বিভক্ত হোত, তবে দুই অংশই ইউরোপের যুদ্ধকামী জাতিসমূহের চক্রান্তের কেন্দ্র হোত, এবং একদিকে উত্তর ও অন্যদিকে দক্ষিণ এমনিভাবে খুব সম্ভবতঃ আমেরিকার দুয়ারে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। ফলে যুগ যুগ ধরে আমেরিকার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হোত।

পূর্ব-বার্লিন দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব-জার্মানী দেখতে পারিনি। খুব তাড়াতাড়ি দেখলেও পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের পার্থক্য বুঝে নেওয়া শক্ত নয়। পূর্ব-বার্লিনে প্রচারের প্রাচুর্য কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের স্বল্পতা চোখে পড়ল। সেখানে দেখলাম জনসাধারণ খাবারের দোকানের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান,—দোকানগুলোতে খাদ্যদ্রব্যও যথেষ্ট নয়। এরূপ দৃশ্য পশ্চিম জার্মানীর কোথাও দেখিনি। পোশাক-পরিচ্ছদ এমন কি লোকজনের চেহারাতেও পূর্বাংশে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের চিহ্ন বর্তমান। অবশ্য পূর্ব-বার্লিনের দুইটি কৃতিত্বও রয়েছে ঃ—(১) ষ্ট্যালিন আলির (এভেন্যু) সুন্দর বিরাট প্রাসাদ ও (২) ট্রেপটো নামক মনোরম পার্ক। শেষোক্তটি স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা তৈরী বলে কথিত। পার্কের ভেতরে রাশিয়ান ও জার্মাণ ভাষায় ষ্ট্যালিনের বাণী প্রস্তর-স্তম্ভে লিপিবদ্ধ

করে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস, নীচুদরের প্রচার বলেই মনে হোল।

কিছুদিন ধরে, বিশেষ করে চীনের নবজাগরণের পর আমাদের দেশে অবিরাম জোর প্রচার চলছে যে সাম্যবাদ মানেই দ্রুত উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। যাদের সততা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, এরূপ কয়েকজন বন্ধু রাশিয়া ও চীনদেশ ঘুরে এসে প্রকাশ্যভাবে সেখানকার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও দ্রুত উন্নতির কথা বলেছেন। আমি তাদের মতামত মেনে নিচ্ছি। সে সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানীর অসাধারণ উন্নতির কথাই বা কি করে ভুলতে পারি। সেটি তো অ-সাম্যবাদী দেশ। গত পাঁচ বছরে কি অভূতপূর্ব উন্নতিই না সে করেছে। আর একটি অ-সাম্যবাদী দেশ হলো ফিনল্যান্ড। সেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ত্রিশ কোটি ডলার রাশিয়াকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সে দিয়ে দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দেনা সম্পূর্ণ শোধ করে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দেনার বৃহত্তর অংশও শোধ করতে সমর্থ হয়েছে। বলেছি আগেই, দুধ ও প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে ফিনল্যান্ডেই সবচেয়ে বেশী। এসব দেশে যা দেখেছি তা থেকে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দ্রুত উন্নতি কোন ইজম বা মতবাদের একচেটিয়া নয়। বরং এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ফিরেছি যে, মতবাদের স্থান গৌণ। মুখ্য জিনিস হোল শাসন ব্যবস্থার সততা এবং পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারবে—এই ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট জনগণের পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

আমাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন,—"ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি ব্যক্তি হিসাবে মানুষ কত বড় হতে পারে, আর একটা জাতি কত নীচে নেমে যেতে পারে।" প্রায় সব ক্ষেত্রেই এরূপ দুঃখজনক বৈষম্য। অগণিত বুভুক্ষু লোকের পাশে মুষ্টিমেয় অতিভোজী! জীর্ণ মলিন বস্তির পাশে প্রাসাদ। পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিমের আরও কয়েকটি দেশে নিম্নতম ও উচ্চতম আয়ের মধ্যে আমাদের দেশের মত এত পার্থক্য নেই। একজন সাধারণ শ্রমিক পান মাসে ২০০-২৫০ মার্ক। আর একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক পান মাসে ১৩০০-১৪০০ মার্ক। খাদ্য পরিচ্ছদ, চিকিৎসা এবং ছেলেমেয়ের শিক্ষা বিষয়ে ধনী-দরিদ্রের তফাৎ সামান্য মাত্র। প্রত্যেকেই অনুভব করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীতে তার নিজেরও পূর্ণ অংশ আছে। সব জিনিসের সার কথা হোল এটিই।

শাসন বিভাগের অসততার কথা তুললেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের অসাধুতা। চিয়াং কাইশেকের রাজত্বকালে সমস্ত চীনদেশকেই অসাধু নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরিবর্তনের ফলে প্রতিষ্ঠিত হোল নূতন সরকার। সততা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকারের আহ্বানে জনগণও সাড়া দিল। প্রত্যেক দেশেই জনতার বৃহত্তম অংশ সৎ বা অসৎ হয় অবস্থার চাপে। সকল অবস্থাতেই সৎ থাকে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আবার সকল অবস্থাতেই

কোন দেশকেই আজ পর্যন্ত বলতে শুনিনি যে, তারা আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রসজ্জা করছে। তথাকথিত আত্মরক্ষা বা ডিফেন্সের বিরাট প্রস্তুতির পেছনে যে আসল ফাঁকি রয়েছে, খুব কম লোকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। শান্তির জন্য সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক। তা সত্ত্বেও যদি শাসক সম্প্রদায় যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাদেরও জড়িয়ে পড়তে হবে সে যুদ্ধে। ডাঃ ওপেনহাইমার আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা আমেরিকাবাসীর প্রাণের কথা বলে মনে করি। "আণবিক বোমা পৃথিবীতে শান্তি আনবে একথা বিশ্বাস করেন কি?"—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে—"আণবিক বোমার ধ্বংসশক্তিই যুদ্ধ শুরু করার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে।"

সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়া সম্বন্ধে প্রবল ভীতি রয়েছে। "আমরা রাশিয়ার অতি নিকটে"—একথা অনেকেরই মুখে। অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ রাশিয়ার উক্তির সততায় বিশ্বাস করে না। এই সব দেশে কম্যুনিজম-এর প্রসার হয়নি বললেই চলে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীরভাবে জানবার আগ্রহ জার্মানী, আমেরিকা ও ফিনল্যাণ্ডের মত অন্য কোথাও দেখিনি। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের চেয়ে জার্মানী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখে। গ্যাটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ভালড্স্মিডট্ ও হামবুর্গের অধ্যাপক আলস্ডর্ফ—দু'জনেই ভারতীয় ভাবধারায় সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত। অধ্যাপক ভালড্স্মিডট্ সত্যিকারের বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ়। মহাত্মা গান্ধীর পাশে থেকে যাঁরা কাজ করেছেন, এমন অনেকের চেয়েও অধ্যাপক আলস্ডর্ফ মহাত্মাজীকে বুঝতে পেরেছেন অনেক বেশী। তাঁর 'ইণ্ডিন' (ভারতবর্ষ) নামক পুস্তকে মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে কয়েক পৃষ্ঠা সত্যিই পড়ে দেখবার মত এবং তা চিন্তার খোরাক জোগায়।

একমাত্র আমেরিকাতেই ভূদান ও বিনোবাজী সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কিভাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এ বিষয়ে আমাকে প্রথম নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন "রকফেলার ইনষ্টিটিউটের" একজন অধ্যাপক। তারপরে হয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও সহানুভূতিশীল আমেরিকাবাসীদের মধ্যেও অপরিসীম অজ্ঞতা রয়েছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। প্রিন্সটন শহরের মহানুভব এক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল,—সমস্ত ভারতবর্ষে একজন মুসলমানও নেই। কিন্তু যখন আমি বলি যে, ভারতবর্ষে সাড়ে তিন কোটি হতে চার কোটি মুসলমান রয়েছে তখন তিনি একটু বিব্রতই হলেন।

বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ শাসন করেছে ব্রিটেন। কাজেই ওদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি গভীর জ্ঞান থাকবে, এ আশা করা স্বাভাবিক। নিঃসংকোচে স্বীকার

করেছি যে, সে রকম কোন লক্ষণ আমি সেখানে দেখিনি। এমন কি ভারতবর্ষকে গভীরভাবে জানবার আগ্রহও দেখিনি।

ইউরোপে জাতিগত, রাষ্ট্রিক ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতা অতি মাত্রায় বর্তমান—পূর্বেই একথা বলেছি। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড যুক্ত হওয়ার কয়েক শতাব্দী পরেও তারা নিজ নিজ পৃথক সত্ত্বা সম্বন্ধে অতি সচেতন। কথা প্রসঙ্গে এডিনবরা রয়েল সোসাইটির একজন ভূতপূর্ব সভাপতির কাছে বলেছিলাম,—"একমাস হল ইংল্যাণ্ডে এসেছি।" তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন,—"স্কটল্যাণ্ডের লোক বড় বেশী আত্মসচেতন। আপনি ইংল্যাণ্ড না বলে ব্রিটেন বলবেন।" কিন্তু দৃষ্টি আরও প্রসারিত করে দিল কেম্ব্রিজ। সেখানে একজন স্কচ ভদ্রলোক বলেছিলেন,—"আমিও আপনারই মত বিদেশী এখানে।" ভগবানের অনুগ্রহে ব্রিটেনে দেশ ভাগ চায় এমন কোন বিদেশী শাসন ছিল না। তাহলে আজ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডকে দু'টি পৃথক দেশ হিসাবেই দেখতে পেতাম। তাতে অবশ্য অকল্যাণ হতো উভয়েরই।

ভালই হয়েছিল, আমি গ্রীষ্মকালে ইউরোপে ছিলাম। কারণ সে সময়েই ইউরোপের অন্তরাত্মাকে অনুভব করা ও দেখার সুযোগ হয়। আমোদ-আহ্লাদে সকলেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বহু বিচিত্র উৎসব এবং নানাবিধ সংগীত উৎসব হয় তখনই। এই সব সংগীত উৎসব, কোপেনহাগেনের 'টিভোলী' এবং সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা উৎসব সত্যিকারের উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদও বটে। জেনেভা উৎসব অনেকটা যেন ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল এবং সারা ভারতের হোলি ও দশহারা উৎসবেরই মিলিত সংস্করণ। সে উৎসবের দিনে ভুলে গিয়েছিলাম আমি বিদেশী। সেখানকার জনসাধারণের সংগে এক হয়ে মিশে গিয়েছিলাম। যেন আমার নিজেরই দেশ। সুইসরাও আমাকে তাদের আপন করে নিয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্রই মানব-মনের একই সুষমা পরিব্যাপ্ত—পূর্ব বা পশ্চিম বলে কোন পার্থক্য নেই। হৃদয় থাকলেই সে স্বাদ পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীদের সংগে আলাপ আলোচনা ইত্যাদি জার্মানীর অন্তরকে বুঝতে যেরূপ সাহায্য করেছে, রাইন নদীর উপরে জাহাজে ভ্রমণের সময় সাধারণ লোকের সংগে যোগাযোগ তার চেয়ে কম সহায়ক হয়নি। পরিচয় করিয়ে দেবার সেখানে কেউ ছিল না, সকলেরই মধ্যে আমিও একজন ছিলাম মাত্র। অথচ ছোট বড় সকল জার্মানই আমাদের সংগে আত্মীয়ভাবে মিশেছে। সাহায্য করার জন্যও সব সময়েই তাদের উন্মুখ থাকতে দেখেছি। সেই একই রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে কোবলেনটসে, রাইন ও মোজেল নদীর সংগমস্থলে অবস্থিত শহরে। দৈব-ক্রমে আমাদের দু'ঘণ্টার উপর থাকতে হয়েছিল ঐ শহরে। টিউটন জাতির রুক্ষ বহিপ্রকৃতির ভেতরে ফল্গুধারার মত কোমলতা অনুভব করতে পেরেছি। চারিপাশে ধ্বংসস্তূপ। তারই মধ্য দিয়ে রাস্তায় হেঁটে চলেছিলাম। যুবক, বৃদ্ধ বা বালক-বালিকা সকলেই সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিল আমাদের সংগে। অপ্রু-

বিসর্জন না করে এ ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও নিজেদের আনন্দে রাখবার প্রচেষ্টা,—একটা মহান জাতির লক্ষণ, এ কথাই মনে হয়েছিল।

আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অংশে অনেক পরিবারে থেকে আমেরিকাকে বুঝবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু জাহাজে ও ইউরোপে ভ্রমণকারী আমেরিকাবাসী-দের সংস্পর্শে এসে সে সুযোগ কোন অংশে কম পাইনি। ঠিক তেমনি ওলন্দাজ জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি হল্যান্ড-আমেরিকা লাইনের জাহাজে বহু ক্যানাডা-যাত্রী ওলন্দাজের সংস্পর্শে এসে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় নিজেদের জীবনদর্শন সম্বন্ধে এক উদগ্র প্রীতি আছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রকারের অসহিষ্ণুতা। অতীতের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাই প্রতিনিয়ত রূপ নিচ্ছে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে। তাদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অবশ্য বুঝতে পেরেছেন যে, একমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনাই বিশ্বের সমস্যার সমাধান করতে পারে। সকল রকমের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মানবজাতির ভেতরকার মহান ঐক্যকে যদি মেনে না নেওয়া হয় তবে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পূর্ব বা পশ্চিম, এশিয়া বা ইউরোপ. আফ্রিকা বা আমেরিকা সর্বত্রই "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" উপলব্ধি মানুষের উন্নতির নিশ্চিত ভিত্তি। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট অবদানের দিকে পশ্চিমের অনেকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে তা সম্ভবপর যদি সে আত্মস্থ হয় এবং শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা না দেখিয়ে গান্ধীজী প্রদর্শিত সত্যিকার সত্য ও অহিংসার পথ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। অহিংসা বাহ্যতঃ একটি নেতিবাচক শব্দ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এর অর্থ সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেম। হিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তির শক্তি ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমানবহর প্রভৃতি। কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তির শক্তির উৎস ভগবানে বিশ্বাস। গান্ধীজী রাজ-নীতিকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা মুখ্যতঃ একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি—এ জিনিস একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভবপর। তবু আমার ধারণা এবার আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের ঢেউ আসবে পশ্চিম হতে ঃ—সম্ভবতঃ আমেরিকা হতে। কারণ বর্তমানে পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রায় সর্বোচ্চ স্তরে এসে পৌঁচেছে আমেরিকা এবং তার জিজ্ঞাসা জেগেছে—"এর পর কি?" আমেরিকার আর একটি সুবিধা, সে একটি নূতন রাষ্ট্র। এমন কি, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তাকে শিশু বলা যেতে পারে। শিশু ভুল অনেক করে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রমবিকাশও হয়। অবশ্য আমি ভারতের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি সম্বন্ধেও সচেতন। এই দেশেই আধুনিক কালেও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত সাধুপুরুষ, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাহিত্যিক প্রতিভা এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় রাষ্ট্রনায়কের জন্ম হয়েছে।

ইউরোপে একটা ভুল ধারণা আছে যে, সকল আমেরিকাবাসীই ধনী। যেমন বাংলা দেশে ধারণা আছে—সকল মাড়োয়ারীই ধনী। বেশ উঁচুদরের কৃষ্টিসম্পন্ন

আমেরিকাবাসীদেরও আমি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে দেখেছি। শুধু তাই নয়। স্বল্প পরিমাণ সঞ্চিত অর্থে অনেকে দেশ ভ্রমণ করবার জন্য নানা প্রকারের অসুবিধাও সহ্য করেছেন তাও দেখেছি। আমেরিকাবাসীদের সম্বন্ধে এই ধারণার জন্য ইউরোপের কোন কোন দেশে তাদের কাছ থেকে বেশী টাকা আদায়ের চেষ্টা হয়। সুইজারল্যান্ড দেখে আমার মনে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বহুসংখ্যক বিদেশী ভ্রমণকারীর দল ও সহজলভ্য অর্থ একটা জাতির দুর্বলতার কারণ।

নানাশ্রেণীর লোকের মুখেই শ্রীজওহরলাল নেহরুর বিশেষ কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত-না-হওয়া-নীতির প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু ব্রিটেনের বাইরে প্রায় সর্বত্রই ভারতবর্ষ কমনওয়েলথ্-এর অন্তর্ভুক্ত থাকুক—এটা কেউ পছন্দ করে না। স্বাধীন ভারত সকলের সংগে সমভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবে—তারা এ আশা রাখে। অন্য যুক্তি ছেড়ে দিলেও, শুধু জগতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার জন্যই ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর বাইরে আসা প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় বা হওয়া উচিতও নয় যে, ব্রিটেনের সংগে আমাদের শত্রুতা করতে হবে।

ঠিক এমনিভাবে ইউরোপের অনেকেই আমাদের "পাশপোর্ট" হিন্দীভাষায় লিখতে দেখলে খুশী হতেন। কারণ হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য হয়েছে। শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে অবিলম্বে হিন্দী ভাষার ব্যবহারে অসুবিধা থাকতে পারে কিন্তু "পাশপোর্ট" হিন্দীতে লেখার কোন অসুবিধা হতে পারে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার একদেশের অধিবাসী অন্যদেশে বিনা পাশপোর্টে যেতে পারে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার মধ্যে কোন পাশপোর্টের ব্যবস্থা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের পাশপোর্ট থাকলে ফিনল্যান্ড বাদে ইউরোপের সকল অ-কম্যুনিষ্ট দেশে যেতে ভিসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভারতীয় পাশপোর্ট থাকলে সব দেশের জন্যই ভিসা নিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেতে হলে "আমি কম্যুনিষ্ট নই"—এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে হবে। তার অর্থ এই, কোন কম্যুনিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে না। এই বাধা-নিষেধের মর্ম আমি উপলব্ধি করতে পারি না। যদি গণতান্ত্রিক জীবনধারা কম্যুনিষ্ট জীবনধারার চেয়ে ভাল হয় তবে কম্যুনিষ্টদের আসবার সুযোগ দেওয়া উচিত; যেন দেখে তারা শ্রেয়কে গ্রহণ করতে পারে। কম্যুনিষ্ট কখনো শ্রেয়কে গ্রহণ করতে পারবে না, একথা বলার অর্থ মানব চরিত্রের মূলগত শুভ বুদ্ধির উপর অবিশ্বাস।

লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষ, পথে পথে ভিক্ষুকের ভিড়, শাসন-ব্যবস্থায় অসত্যতা, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, শিক্ষার নিম্নহার এই সব কারণে পশ্চিমের দৃষ্টিতে ভারতের মর্যাদা খুবই কম। বৈদেশিক কূট ও রাজনীতিবিদ্‌দের প্রশংসাপত্র, শাসক-শ্রেণীর আত্মতৃপ্তি যেন আমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে; পশ্চিমবাসীর মুখ হতে সত্য কথা বেরিয়ে আসে, বিশেষ করে অসতর্ক মুহূর্তে। তবু সামান্য যেটুকু শ্রদ্ধা

ভারতবর্ষের প্রতি বিদেশীর আছে তা প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীর জন্য। তাঁর বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি, অকৃত্রিম মানবপ্রেম, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পন্থা ভারতকে পশ্চিমের দুয়ারে উচ্চ আসন দিয়েছে। ঠিক একই কারণে যে কয়েকজন আফ্রিকা-বাসীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে আমার দেখা হয়েছে তাদের কাছেও ভারতের স্থান অতি উচ্চে।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভারতীয় দর্শনকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা ভারত এমন একটি দেশ, যেখানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দুর্জ্ঞেয় মানুষ রয়েছে। কেউ কেউ ভারতবর্ষের সাপের কথা এমনভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন যেন ভারতবর্ষ সাপেরই দেশ। অর্থাৎ সেখানে বাস করা অতি বিপজ্জনক। তাদের শান্ত করার জন্য আমাকে একথাও বলতে হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের সাপ তাদের দেশের এমন কি জগতের মানুষের তুলনায় অর্ধেক হিংস্রও নয়।

কিন্তু একটি প্রশ্ন প্রায় সর্বত্রই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। সে হল গো-জাতির পবিত্রতা সম্বন্ধে। ও-সব দেশে গরুর মাংস খাদ্যবিশেষ। তাদের পক্ষে গরু সম্বন্ধে হিন্দু জাতির দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা শক্ত। ভারতের কোন কোন অংশে গরু অতি সামান্য পরিমাণ দুধ দেয়। এ প্রসঙ্গে সে সব স্থানের গরুকে হত্যা না করা গো-জাতির উন্নতির অন্তরায় কিনা এই প্রশ্ন করা হত। এ অতি সংগত প্রশ্ন, বিস্তৃতভাবে তাদের বুঝিয়ে যে কথা বলি তার সার মর্ম হলো এই—প্রাচীন ভারতে হিন্দুধর্মে গো-হত্যা করা ও গো মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আজ সারা ভারতের হিন্দু প্রথা হিসাবে নিষেধ-নীতি পালন করে। প্রত্যেক পরিবারেই বছরের পর বছর গরু দুধ দিত। বস্তুতঃ গরু পরিবারেরই একজন হয়ে দাঁড়াত। তাই দুধ দেওয়া যখন বন্ধ করত তখন তাকে আর হত্যা করা সম্ভব হত না। এ রকম উচ্চস্তরের ভাবাবেগ থেকেই এ প্রথা গড়ে উঠেছে। বলদ-গরু চাষ করে, গাড়ী টানে। প্রয়োজনের তাগিদে সে-ও হয়ে ওঠে পরিবারের একজন। আমার কথা শুনে ফিনল্যান্ডের ভূতপূর্ব দেশরক্ষামন্ত্রী মিঃ ক্যালিনেন বললেন, কেন তিনি ডিম দেওয়া বন্ধ করলেও তাঁর মুরগীগুলি কাটতে পারতেন না। তারা তাঁর পরিবারেরই হয়ে গিয়েছিল। যে গরু দুধ কম দেয় তাদের হত্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় গরুর রোগ হয় কম। এমনকি ভারতের অন্য অংশ হতে আমদানী করা বেশী দুধের গরুও রোগাক্রান্ত হয় বেশী। আর ভারতে বেশী দুধ দেয় এমন গরুর সংখ্যাও কম। অপর দিকে স্থানীয় কম দুধের গরুকেও ভাল খাবার ও প্রজননের ব্যবস্থা করে উন্নত করা যেতে পারে। ওয়ার্ধার "গো-সেবা সঙ্ঘ" স্থানীয় গরুর উন্নতি করে একথা সপ্রমাণ করেছে। একথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার পর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ বলেছিলেন,—"আমরা এক দেশের লোক অন্য দেশ সম্বন্ধে এত কম জানি!"

বহু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র পশ্চিমের দেশগুলিতে আছে। ব্রিটেনে প্রায় তিন

হাজার ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দেড় হাজার। এদের মধ্যে কেউ কেউ যে কোন জাতির পক্ষে গৌরবের পাত্র। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তারা বিদেশে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে। তথাপি আমার মনে হয়, এদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জনেরই বিদেশে আসা ঠিক হয়নি। ভারতের বহু অর্থসম্পদ বিদেশে এ জন্য ব্যয় করা হয়। তা সত্ত্বেও ভারত বহু বিদেশী বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ ও কারিগরকে নিযুক্ত করছে। অন্যদিকে অনেক উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানীও কাজ পাচ্ছে না। এর কারণ, সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার অভাব। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিদেশে ছাত্র পাঠান উচিত যেন ফিরে এসে তাদের বেকার হয়ে বসে থাকতে না হয়, তারা যেন সমাজের অত্যাবশ্যক অংগ হতে পারে।

সারা পশ্চিম ভ্রমণের ফলে আমার এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে, শুধু জাগতিক সুখ মানুষের জীবনে আনন্দ দিতে পারে না। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক—এই দুইয়ের পরিপূর্ণ মিলন দরকার। আজকের পশ্চিম অজ্ঞাতসারে সে পথেই গতি ফিরিয়েছে। আরও বদ্ধমূল হয়েছে এই ধারণা যে, ভারতকে তার নিজের রাস্তায় চলতে হবে তার নিজস্ব প্রতিভার উপর নির্ভর করে।

এই ভ্রমণের সময় বিভিন্ন দেশের স্ত্রী-পুরুষের কাছ থেকে শুধু যে সহায়তা পেয়েছি তা নয়, তাদের ভালবাসা ও প্রীতি পেয়েছি প্রচুর। তাদের অনেককেই আগে জানতাম না, হয়তো কখনো আর দেখাও হবে না। মানুষের সংগে মানুষের যে সাধারণ একটা প্রীতির বন্ধন আছে তাই এর কারণ। অনেক ঘটনার মধুর স্মৃতি জীবনের মূল্যবান সম্পদ হয়ে রয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে আজ সে সব লোকের কথা স্মরণ করছি।

ব্রিটিশ কাউন্সিল আমার ব্রিটেন সফরের ব্যবস্থা করেছিল, আর্থিক দায়িত্ব তাদের কিছুই ছিল না। তবু তাদের সাহায্য ভিন্ন এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জিনিস দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। বিদেশী পর্যটকদের সুবিধা ও পরামর্শ দানের জন্য ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশেও স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু কর্মদক্ষতা নয়, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সহৃদয় ও আন্তরিক ব্যবহার আমার ব্রিটেনের দিনগুলোকে মধুর করে রেখেছিল।

সোদরপ্রতিম বন্ধু স্বামী নিখিলানন্দ আমার আমেরিকা-ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সহায়তা ও প্রভাবে অনেক আমেরিকান পরিবারে থাকার সুযোগ পেয়েছি। তাই গভীরভাবে দেখতে পেরেছি তাদের জীবনযাত্রা। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই সমস্ত পরিবারকে। আরো কিছুদিন থেকে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলেও যেতে পারলে সুখী হতাম।

ভারতীয় দূতাবাসের মধ্যে অনেক দূতাবাস আমাকে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছে। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই জার্মাণীর ভারতীয় রাজদূত শ্রীসুবিমল দত্তকে। সমস্ত পশ্চিম জার্মাণী ভ্রমণের ব্যবস্থা তিনি আমার মনের

মত করেই করেছিলেন।

মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখ করলে এক অবাঞ্ছিত পার্থক্য দেখান হয় বটে, তথাপি নেহাৎ অকৃতজ্ঞতাই হবে যদি কয়েকজনের নাম না করি। ব্রুয়েমেনডালের (হল্যান্ড) মিঃ ব্রুয়েনসভাঁ, হামবুর্গের (পশ্চিম জার্মানী) হের কুর্ট ফ্রিডরিশ, গ্যটিংগেনের (পঃ জার্মানী) অধ্যাপক ভালডস্মিডট্, হাইডেলবার্গের (পঃ জার্মানী) অধ্যাপক আইক্‌হোলটস্‌, ষ্টুটগার্টের শ্রী ও শ্রীমতী হানস্ ইউব্‌ষ্ট ডিংকেল, ন্যুরেনবার্গের এম এ এন কারখানার হের কার্ণ্টনইয়েন, বাজেলের (সুইট্‌জারল্যান্ড) ডাঃ ভেরনার কেলারহাল্‌স্, ষ্টকহলম-এর শ্রীমতী য়্যাষ্ট্রিড ওংষ্ট্রোম, উপসালার (সুইডেন) মিঃ জন লুন্ডবার্গ, হেলসিঙ্কির (ফিনল্যান্ড) ওয়াম্পুলো পরিবার এবং ফিনল্যান্ডের ভূতপূর্ব দেশরক্ষা-সচিব মিঃ ইরিয়ো ক্যালিনেনকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বেসরকারী সুপরিচিত ভারতীয়গণ এবং ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছে পেয়েছি অপরিমিত স্নেহ ও প্রীতি। এ কথা যখন লিখছি তখন আমি তাদের কাছ থেকে বহুদূরে তবু যেন তাদের কাছেই আছি এরূপ অনুভব করছি। আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা জানাই তাদের সকলকেই।

ভূমিকা শেষ করবার পূর্বে ব্যক্তিগত একটি কথা উল্লেখ না করলে ভুল হবে। আমার দত্তক কন্যা শ্রীমতী সাধনা বিশ্বাসকে এই বই লেখার কাজে আমার সহকর্মী হতে রাজী করাতে পেরে আমি আনন্দিত। লন্ডনে তার পাঠ্য বিষয় ছিল—"ইংলন্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা, চিন্তায় ও কর্মে"। সে সূত্রে তাকে ব্রিটেনের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখতে হয়েছিল। ব্রিটেনের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রগাঢ়। ব্রিটেনে থাকাকালীন এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমি যখন হল্যান্ডে তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ ছিল। কিন্তু লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণব্যবস্থা হয়, সেই সংগে সেও গিয়েছিল হল্যান্ডে। হল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তার কাছে যে সমস্ত কাগজপত্র ও তথ্য ছিল সে সবই আমাকে দিয়ে সাহায্য করে। ইউরোপের সকল দেশেই সে আমার সংগে ছিল এবং রোজনামচা সে অনেক বিস্তারিত ভাবে রেখেছিল। এই বইয়ের প্রায় সব ফটোই তার নিজের তোলা। বই লেখার ব্যাপারেও তার সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। সুতরাং সব দিক দিয়েই এই বই দুজনের মিলিত প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু সে আমেরিকা যায়নি। কাজেই আমেরিকা সম্বন্ধে এই বইতে যা লেখা হয়েছে তাতে তার কোন দায়িত্ব নেই।

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটেন

ব্রিটেনই আমি সর্বপ্রথম দেখি। এদেশে ছিলামও সবচেয়ে বেশীদিন অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের ২১শে মার্চ থেকে ৫ই মে পর্যন্ত।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দেখি লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, গ্লাসগো ও এডিনবরা। এছাড়া কয়েকটি কলেজ, প্রাথমিক, সেকেণ্ডারী মডার্ণ, কারিগরী ও গ্রামার স্কুল, শিক্ষকদের ট্রেনিং স্কুল, বিজ্ঞানাগার, রাসায়নিক কারখানা, লণ্ডন টাঁকশাল, রথামস্টেড কৃষি পরীক্ষাকেন্দ্র, ইউনাইটেড ডেইরী এবং নানা ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানসমূহ দেখি। শিক্ষাদপ্তর ও লণ্ডন কাউন্টি-কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগও হয়েছিল। দুর্ভাগ্য, কার্ডিফ বা ওয়েলস-এর অন্য কোন স্থানে যেতে পারিনি। বাজেট আলোচনার দিন (১৪।৪।৫৩) বৃটিশ পার্লামেণ্টেও উপস্থিত ছিলাম।

আমার মেয়ে কল্যাণীয়া সাধনা ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছিল আমার চেয়েও বেশী। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনে তার শিক্ষনীয় বিষয় ছিল "ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা,—চিন্তায় ও কর্মে"। লণ্ডন ছাড়াও শিক্ষনীয় বিষয়ের অংশ হিসাবে সে আরও আটটি বিশ্ববিদ্যালয়—অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ডারহাম, রেডিং, গ্লাসগো, এডিনবরা, এবারডিন ও কার্ডিফ, কয়েকটি প্রাথমিক, সেকেণ্ডারী মডার্ণ, গ্রামার ও কারিগরী স্কুল, ইটন, উইনচেষ্টার ও চেলটেনহাম মহিলা বিদ্যায়তনের ন্যায় পাবলিক স্কুল দেখার সুযোগ পেয়েছিল। "ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার ধারণা"—এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ তাকে লিখতে হয়েছিল এবং সে রচনা তার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (টিউটর)-এর মতে উঁচুদরের বলে গণ্য হয়। সেই রচনা নামমাত্র পরিবর্তিত আকারে (সে নিজেই তা করেছে) এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল। কারণ এই প্রবন্ধে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, আর যে মত এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে আমিও তা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

সামান্য জাতিগত পার্থক্য বাদ দিলে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস শিক্ষার অগ্রগতির জন্য মূলতঃ একই নীতি অনুসরণ করে চলে। অতএব এ প্রবন্ধ ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দিতে পারবে। স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষার জন্য কর্মকর্তা অবশ্য পৃথক। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর শিক্ষা, শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের কর্তৃত্বাধীন। তার মধ্যে ওয়েলস-এর জন্য একটি পৃথক বিভাগ আছে। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সেক্রেটারী অব ষ্টেটস স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত। এ ব্যবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে স্বীকার করা। ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বিশেষত্ব তা-ই।

ব্রিটেনের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ স্কটল্যান্ড ও পঁচিশ লক্ষ ওয়েলস-এর অধিবাসী। সুতরাং ইংরেজই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বাস্তববাদী ইংরেজ, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস-মনোভাবকে সম্মান করে। ওয়েলস-এর কোন কোন অংশে মাতৃভাষা ওয়েলস। তাই সেখানে সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা পায় ওয়েলস ভাষাতেই। ইংরেজী অবশ্য শেখান হয়। স্কটল্যান্ডের কোন কোন অংশে ছেলেমেয়েরা গেইলিক এবং ইংরেজী দুই ভাষাই শিখে।

ব্রিটিশ জাতির কাছে তার শিক্ষাব্যবস্থার মূল্য খুবই বেশী। ১৯৪৪ সালে যখন তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখনও সুদূরপ্রসারী শিক্ষা আইন পাশ করে তারা সে কথাই প্রমাণ করেছে।

ইংল্যান্ডের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার ধারণা

ইংল্যান্ড একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। তার যথার্থ পরিচয় তার শিক্ষাব্যবস্থায়। অতি অল্পবয়স থেকেই শিশুর যত্ন নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য তাদের সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি। সরকারের ভাষায় বলতে গেলে তা হল,—"শিশুদের জন্য আরও আনন্দময় শৈশব এবং আরও সুন্দরভাবে জীবন শুরুর ব্যবস্থা করা, ছোটদের জন্য অধিকতর পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, সকলেরই নিজ প্রতিভা বিকাশের সুবিধা দেওয়া, যেন তারা নিজদেশের ঐতিহ্যকে আরও শ্রীসম্পন্ন করতে পারে।"

সকল মেধাবী ছেলেমেয়েই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা ভাবতে পারে। কারণ যত গরীবের ঘরেই তাদের জন্ম হোক না কেন, জনসাধারণের অর্থে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

পাঁচ হতে পনর বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। অনেকে 'অবৈতনিক' কথাটিতে আপত্তি করেন। বাস্তবিকপক্ষে সকলের নিকট হতেই ক্ষমতানুযায়ী ট্যাক্স আদায় হয় কিন্তু ধনী বা দরিদ্র সকলের ছেলেমেয়ে শিক্ষার সমান সুযোগ পায়। এই হল আসল কথা। কাজেই ঠিকভাবে দেখলে 'অবৈতনিক' কথাটি অপপ্রয়োগ। দুই বৎসর বয়স হতে অনেক সংখ্যক ছেলেমেয়ের যত্ন নেওয়া হচ্ছে নার্সারী স্কুলের মাধ্যমে। এরূপ স্কুলের সংখ্যাও ক্রমে বাড়ছে। যে সব অঞ্চলে মায়েরা কাজের জন্য বাইরে যায় বেশী সেখানেই অধিকাংশ নূতন নার্সারী স্কুল গড়ে উঠেছে। কারণ সেখানে প্রয়োজন বেশী।

স্কুলের সকল ছেলেমেয়েকে ⅓ পাইন্ট (তিন ছটাকের একটু বেশী) দুধ বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। ডাক্তার পরামর্শ দিলে আরও ⅓ পাইন্ট দেওয়া হয়। শুধু জিনিসের দাম কষে সেই দামে স্কুলে দুপুরের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজন মত আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মূল্যে রেহাই দেওয়া হয়। পয়সার অভাবে স্কুলে খাবার পায় না, এমন কোন ছেলেমেয়ে নেই। স্কুল-খাবারের পুষ্টির মান উঁচু, শিশুর সারাদিনের মধ্যে সেটাই প্রধান ভোজন এই হিসাবে তার পরিকল্পনা

হয়। শুধু জিনিসের দাম নিয়ে সকালের খাবার ও চা সরবরাহের ব্যবস্থাও আছে। স্কুলে খাবার দেওয়ার এই ব্যবস্থা একটি মস্ত বড় শিক্ষা সংস্কার; স্কুলে সাহিত্য বা গণিত শিক্ষারই মত প্রয়োজনীয়।

জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও স্কুলের জন্য পৃথকভাবে স্বাস্থ্য-বিভাগ রাখার আবশ্যকতা রাষ্ট্র স্বীকার করে নিয়েছে। বর্তমান শিশুদের যাতে রোগ না হতে পারে, হলেও উপযুক্ত চিকিৎসা হতে পারে সেইজন্যই এ ব্যবস্থা ও সতর্কতা। জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত প্রতিটি স্কুলেই প্রত্যেক শিশুর নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দাঁত পরীক্ষা হয়। স্কুলে স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্ন, খাবার ও দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা সবটাই শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গণ্য। কাজেই এর দায়িত্বও শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের। ১৯৫০-৫১ সালে স্কুল খাবার ও দুধ সরবরাহের জন্য ব্রিটেনে রাষ্ট্রের খরচ হয়েছে ৩·৬ কোটি পাউন্ড।

পর্যাপ্ত পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য যে সব ছেলেমেয়ের শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ সম্ভবপর নয় তাদের ঐ সব জিনিস দেওয়ার বা সেজন্য সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্কুল এবং ছাত্রদের বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য 'শিশুরক্ষা সমিতি' রয়েছে। স্কুলের বাইরে শিশুদের উন্নতির সকল ব্যাপারে এই সমিতিগুলি কাজ করে। এমন কি, শিক্ষকরাও শিশুর পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে সকল খবর রাখে। বাপ-মার মধ্যে অপ্রীতির জন্য যে সমস্ত পরিবারের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত সেই সব পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কখনো কখনো তাদের খুব আদর্শ পরিবারে রেখে দেওয়া হয়। অন্ধ, কালা, বা বোবা, শিক্ষার মাপকাঠিতে সাধারণের চেয়ে নিম্নস্তরের শিশুদের শিক্ষার জন্যও পৃথক ব্যবস্থা আছে। এদের জন্য পৃথক স্কুল আছে। সম্প্রতি এরূপ ধরণের স্কুলের সংখ্যা খুব বেড়েছে। শতকরা পঞ্চাশটি স্কুলেই বেতার-বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শিক্ষার পরিপূরক হিসাবেই এর আয়োজন। বিশেষজ্ঞ ও পর্যটকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ছাত্রদের কাছে বেতার বক্তৃতার মারফৎ পৌঁছে দেন। ফিল্মষ্ট্রিপ ও ফিল্মপ্রোজেক্টর মারফৎ সমস্ত জগৎকে শিশুর কল্পনার মধ্যে এনে দেওয়া হয়। আমি লন্ডন কাউন্টি-কাউন্সিলের ফিল্ম তৈরী বিভাগ দেখেছি। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামত নেওয়া হয় এবং তাঁরা এ সমস্ত ফিল্ম স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ধার হিসাবে নিতে পারেন অথবা কিনতে পারেন।

অপরাধপ্রবণ শিশুদের জন্য 'শিশুউপদেশক চিকিৎসা কেন্দ্র' আছে সেখানে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক কারণ ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে সম্পর্কের খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। এই ভাবে তারা এরূপ শিশুদেরও আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কখনো কখনো এসব শিশু চিকিৎসাগারে তাদের অভিভাবক বা পরিবারকে চিকিৎসা করা হয় প্রথমে। কারণ একটা সুশৃঙ্খল পরিবারে স্বাভাবিক

ভাবেই আদর্শ নাগরিকের অধিকাংশ গুণাবলী শিশুরা অর্জন করে—বর্তমান ইংল্যাণ্ড এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

সংক্ষেপে একথা বলা যেতে পারে যে, শিশুর আগমনকে সমাজ সানন্দে বরণ করে নেয়। প্রতি পদেই শিশু পায় নিজের বিকাশ ও গড়ে উঠবার সুযোগ। তবু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাদি আরো উন্নত হতে পারে।

বাধ্যতামূলক সময় পেরোলে রাষ্ট্র নানাভাবে তাদের শিক্ষায় উৎসাহ দেয়। যুবসেবাসঙ্ঘ, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ সেবা কেন্দ্র প্রভৃতির মারফতে তা হয়।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে প্রত্যেক জিলায় জনসংখ্যা এবং তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজসেবাকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ আছে। সমাজসেবা কেন্দ্র বিষয়ক পুস্তিকায় আছে,—"অনেক অঞ্চলে বেশ বড় রকমের কেন্দ্র করার ব্যবস্থা হবে, যেখানে বহু জনসমাবেশের বন্দোবস্ত, রোমাঞ্চ, কন্সার্ট, প্রদর্শনী, বক্তৃতা; নানা-প্রকারের প্রামাণিক ফিল্ম, টিউটোরিয়াল কোর্স এবং কারখানা-ঘরে হাতে কলমে কাজের ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকবে।

শিক্ষিত সমাজের সহযোগিতায় সরকার বুঝতে পেরেছে যে শিক্ষায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রসারকে সংযত করার জন্য দরকার জনগণের সাহায্য। তাই যেমন সমাজ-সেবা কেন্দ্রের জন্য সরকার বহুল পরিমাণে স্বায়ত্ত শাসন দিতে চায় ঠিক তেমনি বিদ্যালয়সমূহের জন্যও গভর্নিং বডি বা পরিচালকমণ্ডলী রাখবার পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমমন্ত্রী মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন বলেছিলেন যে, খরচে কার্পণ্য করে ইংল্যাণ্ড দুই যুদ্ধের মধ্যকার সময়ে যেভাবে যুবশক্তির প্রচণ্ড সম্ভাবনাকে অবহেলা করেছে সে উপলব্ধির চেয়ে বেশী জাগরূক তাঁর স্মৃতিপটে আর কিছু নেই। তিনি আরও বললেন—'জাতির একটা মস্ত বড় সম্পদকে আমরা অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি। আবার তা ঘটুক, এ আমরা হতে দিতে পারি না'—(ব্রিটেনে শিক্ষা—লেষ্টার স্মিথ)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর শিক্ষা বিভাগের কর্তারা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ যুব কল্যাণের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ-ভাবে হাতে নেওয়া স্থির করেন। পনর হতে কুড়ি বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবসর সময়ে কল্যাণমূলক কাজের ব্যবস্থা করে যুব সেবা সঙ্ঘ। ১৯৩৯ সালের পূর্বে এই কাজ ছিল বয়স্কাউটস, গার্লস গাইড প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে। কিন্তু এখন রাষ্ট্র, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলি পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে কাজ করে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলি এখন সরকারী সাহায্য পায় বটে কিন্তু তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ।

বহু সংখ্যক কর্মীকে নির্দিষ্ট কাজের ঘণ্টার মধ্যে মালিকেরা ছুটি দেয়—কিছু সময়ের জন্য শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। এ শুধু কার্যকরী শিক্ষার জন্য নয়, ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, শিল্প, নাটক, গান প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষার জন্যও।

ইংল্যাণ্ডে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলি করে—স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও কর্মী শিক্ষা সঙ্ঘের সহযোগিতায়। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত কোন কোন বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন চমৎকার কাজ হচ্ছে। লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল পরিচালিত—হোবর্ণ এলাকার 'নগর সাহিত্য প্রতিষ্ঠান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বল্পকালীন আবাসিক কলেজ যুদ্ধের পর গড়ে উঠেছে। এক বা দুই সপ্তাহ, বড় জোর তিন মাস এই সব কলেজে ক্লাস হয়। কতকগুলি কলেজ গ্রামাঞ্চলের বড় বড় বাড়িতে অবস্থিত। বার্কসায়ারের ডেনমান কলেজ গ্রাম্য মেয়েদের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেই পরিচালিত। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধান অনুসারে যে সময় হতে শিক্ষা পনর বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তার তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৮ এপ্রিলের মধ্যে কাউণ্টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনা পুরাপুরি কার্যকরী হলে সকল ছাত্রই এক সুষ্ঠু বয়স্ক জীবন লাভের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ পাবে।

জনগণের শিক্ষায় লাইব্রেরী বা পাঠাগার এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। প্রত্যেক অঞ্চলে, প্রতি শিক্ষায়তনে এবং গ্রামাঞ্চলেও পাঠাগারের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের বসে পড়বার ঘর আকর্ষণীয় ও মনোরম করে রাখা হয়। যাদুঘর, শিল্পপ্রদর্শনী ও পাঠাগারসমূহ জনসাধারণের জীবনের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করছে। পাঠাগারগুলি হতে বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি বই পড়বার জন্য দেওয়া হয়।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছা-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কি ভাবে জনকল্যাণের কাজ করেছে সংক্ষেপে তার একটা রূপরেখা দিতে চেষ্টা করেছি।

রাষ্ট্র ছেলেমেয়েদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা ব্যাপারে যদিও এতটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তথাপি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা রাষ্ট্রের নির্দেশে এক ছাঁচে ঢালা নয়। উপর হতে কোন কিছু চাপান হয়নি। ঠিকই বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচালনায় শিশু ও শিক্ষক ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থার অংশীদার। পরিচালন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি নির্বাচনে শিক্ষকগণ সরকারী নির্দেশের অধীন নন। যদিও সরকারী তহবিল হতেই অধিকাংশ টাকা দেওয়া হয় তথাপি প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। শিক্ষাদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষভাবেই বেশী। রাজকীয় পরিদর্শকদের মারফতে প্রধানতঃ তা হয়। শিক্ষাদপ্তর সাধারণভাবে আদর্শ ও নীতির নির্দেশ দেয়। কিন্তু স্কুলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে না। কাউণ্টি কাউন্সিল প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে, কিন্তু এই শিক্ষকদের প্রচুর

স্বাধীনতা আছে। এক প্রাথমিক স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলেছিলেন,—'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভাল ফল দেখাতে পারি ততক্ষণ আমিই সর্বেসর্বা'। ইহাই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে কাজে প্রেরণা জোগায়। এখানে স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়েছে মনে হল। যদি কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে স্বাধীনতা অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। আবার অতিরিক্ত যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রণ শিক্ষকদের প্রেরণাহীন করে তোলে এবং শিক্ষার মাধুর্য নষ্ট হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৪ সালের আইনে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে তিনি তা প্রয়োগ করেন না। ১৯৫১-৫২ সালে শিক্ষায় সরকারী ব্যয় ছিল ২৫·৭ কোটি পাউন্ড এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সমূহ ব্যয় করে ১২·৬ কোটি পাউন্ড।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ তাদের নিজের হাতে। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন অধিকার নেই। ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস কমিটির পরামর্শ-ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরাসরি সরকারী সাহায্য পায়। শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরের মারফতে তাদের যেতে হয় না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যস্থায় শিক্ষকের স্থান অতি উচ্চে। তাদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং যোগ্য নারী ও পুরুষদের শিক্ষক নিযুক্ত করা অতি আবশ্যক। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাববশত এখানে কিছু সংখ্যক ট্রেনিং না-পাওয়া শিক্ষক আছে। কিন্তু তাদের ট্রেনিং দেওয়া অথবা ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকদের তাদের স্থানে নিয়োগ করার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা চলছে।

শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা সত্যিই বড় সুষ্ঠু। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি আমাদের দেশের চেয়ে মান অনেক উঁচুদরের। পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অভিজ্ঞতা ও দেখে শেখার উপর বেশী নজর দেওয়া হয়। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লাভের সুযোগ রয়েছে। কোন রকমে মুখস্থ করে পাশ করার চেয়ে স্বাধীন চিন্তার স্থান বেশী। শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু শিক্ষকদের সমান কাজ করেও তারা বেতন পায় কম। ইংল্যান্ডে ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বার্ষিক ৩৭৫ পাউন্ড হতে সুরু হয় এবং প্রতি বৎসর আঠার পাউন্ড বেড়ে ৬৩০ পাউন্ড পর্যন্ত হয়। অথচ ঐ কাজে নিযুক্ত একজন শিক্ষয়িত্রীর বেতন বার্ষিক ৩৩৮ পাউন্ড হতে সুরু হয় এবং প্রতি বৎসর পনর পাউন্ড বেড়ে ৫০৪ পাউন্ড পর্যন্ত হয়। এজন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করেছি। এই অসন্তোষ দূর করা কর্তব্য নতুবা শিক্ষার কাজ ব্যাহত হতে বাধ্য। শিশুদের সংখ্যা স্কুলে বেড়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষয়িত্রীদের প্রয়োজন সর্বাধিক হয়ে পড়েছে। তাই বেতনের প্রশ্নের সমাধান জরুরী। আমার মতে এই বৈষম্য বর্তমান থাকলে অধিক সংখ্যক শিক্ষয়িত্রীকে একাজে আকৃষ্ট করা শক্ত হবে।

এখন আমরা প্রকৃত স্কুল শিক্ষার আলোচনা করব। স্কুল-শিক্ষার নিম্ন-লিখিত কয়েকটি স্তর আছে ঃ—(১) নার্সারী স্কুল (দুই-পাঁচ বৎসর পর্যন্ত), (২) প্রাইমারী স্কুল (পাঁচ-এগার)। প্রাইমারী স্কুলের আবার দুই স্তর ঃ—(ক) শিশু স্কুল (পাঁচ-সাত) ও (খ) জুনিয়ার স্কুল (সাত-এগার) এবং (৩) সেকেণ্ডারী বা মাধ্যমিক স্কুল (এগার-পনর, কোন কোন স্কুলে তার চেয়েও বেশী)। মাধ্যমিক স্কুলও মোটামুটি তিন প্রকারের—সেকেণ্ডারী গ্রামার স্কুল ও পাবলিক স্কুল, সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুল এবং সেকেণ্ডারী টেকনিক্যাল স্কুল।

নার্সারী স্কুল ঃ—নার্সারী স্কুল ও তার ছাত্র-সংখ্যা বর্তমানে খুব বেশী বলা চলে না। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে নার্সারী স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩৪ আর ছাত্র-সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার। এই ধরণের স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিও সন্তোষজনক হয়নি। যাদের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক তাদের ব্যবস্থার জন্য প্রথম দৃষ্টি দেওয়াই এর কারণ। কিন্তু আমি মনে করি, নার্সারী স্কুল খোলা শিশু স্কুল বা জুনিয়ার স্কুলের মতই দরকারী। কয়েকটি নার্সারী স্কুল দেখার পর আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। নার্সারী স্কুলের কাজ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। দুপুরে খাওয়ার এবং তারপরে বিশ্রামের বন্দোবস্ত আছে। সত্যিই আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম দেখে, কেমন করে তিন বছর বয়সের ছেলে 'লেডিজ ফার্ষ্ট' (আগে মেয়েরা) এ উপদেশ মত মেয়েদের আগে খাবার নিতে দিচ্ছে। শিশুরা গঠনমূলক কাজের উপযোগী খেলা-ধূলো শিক্ষা পায়। এ ছাড়া শোভন আচার-ব্যবহার, সু-অভ্যাস ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি স্কুলে দেখেছিলাম ছোট্ট ছেলে একটি কাজ করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। 'অথচ যখন আমি জিজ্ঞেস করি—তোমাকে সাহায্য করতে পারি কি?' উত্তরে বলেছিল—'না ধন্যবাদ।' অল্প বয়সে শিশুদের গড়ে তোলা সহজ। সে সময়ে যদি তাদের যত্ন না নেওয়া হয় এবং তারা বদভ্যাস আয়ত্ত করে তবে পরে তাদের শোধরান এক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে নার্সারী স্কুলকেও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ করে নেওয়া সঙ্গত।

শিশু ও জুনিয়ার স্কুলে শিশুরা পড়া, লেখা ও গণিত শিখে। সঙ্গে সঙ্গে গান, খেলাধুলা এবং হাতের কাজেরও ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুর জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা এভাবে চলে এগার বৎসর পর্যন্ত। তারপর ইংরেজী, অঙ্ক ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এর ফলাফলের উপর নির্ভর করে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন। যারা সবচেয়ে পারদর্শী তাদের গ্রামার স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। যে সমস্ত ছেলেমেয়ের পুঁথিগত বিদ্যার দিকে ঝোঁক বেশী এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আশা রাখে, তাদের জন্যই গ্রামার স্কুল। বাকীরা সব যায় সেকেণ্ডারী মডার্ন স্কুলে, সেখান হতে কেউ কেউ তের

বৎসর বয়সে টেকনিক্যাল স্কুলে যায়। এই ব্যবস্থার আসল কথা হল, প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যেক ছাত্রই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করুক, এটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু এগার বৎসর বয়সে এই বাছাই করার ব্যবস্থাও আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয় না। অতি অল্প বয়সেই একদল ছেলেমেয়েকে নিম্নস্তরের বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয় এবং তারা সারা জীবন একটা আত্মবিশ্বাসের অভাবে কষ্ট পায়। একটি সেকেণ্ডারী মডার্ন স্কুলের ডেপুটি প্রিন্সিপাল আমাকে বলেছিলেন যে, সেখানে ছাত্রদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই এবং পনর বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলেই অধিকাংশ ছাত্র স্কুলে আছে। এইজন্য তের বৎসর বয়সে আবার ছাত্রের যোগ্যতা পরীক্ষা করে তার শিক্ষা ধারা স্থির করার কথা হচ্ছে। গ্রামার স্কুলের ছেলেদের পুঁথিগত বিদ্যার দিকে বেশী ঝোঁক, তারা নিজেদের অন্যদের চেয়ে উঁচুদরের ছাত্র বলে মনে করে। ইংরেজ মা-বাবার মনেও কারিগরী বিদ্যার চেয়ে পুঁথিগত বিদ্যার মর্যাদা অধিক। ভারতবর্ষে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা অসুবিধা ভোগ করি আরও বেশী। সব দিক দিয়েই এ মনোবৃত্তি অস্বাস্থ্যকর। একজন দক্ষ কারিগরকে বুদ্ধির মাপকাঠিতে একজন শিক্ষকের চেয়ে নীচুস্তরের ভাবা উচিত নয়। ইংল্যাণ্ডে আমি একথা বলতেও শুনেছি, নিজেরা হাতে কলমে করেন না, অথচ কি ভাবে কাজ করতে হবে এরূপ উপদেশ দেওয়ার লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী সংখ্যক। একথা সত্যিই বুদ্ধির অগম্য, কেন ভাল ছেলেরা কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার স্কুলে যাবে না। গ্রামার স্কুলে পাঁচ বৎসর পড়ার পর ছাত্রেরা শিক্ষার সাধারণ সার্টিফিকেট পাওয়ার পরীক্ষা দেয়। এমনকি যারা স্কুলের নিয়মিত ছাত্র নয় তারাও এ পরীক্ষা দিতে পারে। অবশ্য এ জন্য 'মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষা পরিষদ'-এর সুপারিশ দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই পরিষদের কাজ পরামর্শ দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করে। ত্রিশ-চল্লিশ বিষয়ের মধ্য থেকে ছাত্ররা নিজ নিজ বিষয় বেছে নিতে পারে। সাধারণ পাঠ্য বিষয় ছাড়া শিল্প, সঙ্গীত, কারিগরী বিদ্যা বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদিও পরীক্ষার বিষয় হিসাবে নিতে পারা যায়। বিজ্ঞান বা সাহিত্য যে বিষয়ে যে ছাত্রের বিশেষ ঝোঁক আছে তাকে পৃথকভাবে সেই বিষয় শিখাবার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ গ্রামার স্কুলে ছাত্ররা ইংরেজী বাদে অন্ততঃ আর একটি ভাষা শিখে। ডলণ্টন কাউণ্টি সেকেণ্ডারী স্কুল দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেখানে আমাকে বলা হয় যে, ছাত্ররা একটি অথবা আটটি বিষয় পরীক্ষার জন্য বাছাই করে নিতে পারে। সমস্ত শিক্ষকই ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট। বৎসরে দুইবার পরীক্ষা হয়,—ফেব্রুয়ারী ও জুন মাসে। তবে ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের পরীক্ষা বৎসরে মোটে একবার হয়; ইংরেজী ও গণিতের পরীক্ষা হয় দুইবার। এই পরীক্ষার পরই অধিকাংশ মেয়েরা স্কুল ত্যাগ করে। মাত্র কয়েকজন 'ষষ্ঠ ফর্ম'-এ যায়। ষষ্ঠ-

ফর্মে বহু বিষয় ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। কেউ কেউ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি, কেউ কেউ আবার বিজ্ঞান পড়ে। এক বৎসরের জন্য কেউ আবার অফিস পরিচালন-বিদ্যা, হিসাব রাখা, টাইপ করা ও সর্টহ্যান্ড প্রভৃতি শিখে। গ্রামার স্কুলে অধিকাংশ ছাত্রই ষোল বৎসর পর্যন্ত থাকে। কিছু মাত্র সতের, আঠার এমন কি উনিশ পর্যন্তও থাকে। ষোল বৎসরের পর যত ছাত্র স্কুলে থাকে তাদের সংখ্যার উপর প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত বেতন পান। এতে প্রমাণিত হয় যে কর্তৃপক্ষ ষোল বৎসরের পরও ছাত্রদের গ্রামার স্কুলে রাখার পক্ষপাতী।

শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা নয়, ইংল্যান্ডে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থারই একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। ইংল্যান্ডের জনসাধারণ শিক্ষায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না, তাই সেখানে বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রণালী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রকার লোকের স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা ছিল এর পেছনে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। সেই সমস্ত স্কুলই বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামার এবং পাবলিক স্কুলও রয়েছে। গ্রামার শব্দটি বলতে গোড়ায় ল্যাটিন গ্রামার বুঝাত। এই গ্রামার স্কুলগুলি ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষা দিত যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়ে মুখ্যতঃ ধর্মযাজক ও আইনজীবি হতে পারে। ল্যাটিন ও পরে গ্রীক ছিল অবশ্য পাঠ্য বিষয়। প্রাচীন ভারতেও গ্রামার বা ব্যাকরণ (অবশ্য সংস্কৃত পাঠ্য) পড়ানর উপর খুব জোর দেওয়া হত। ছাত্ররা বহু বৎসর ধরে ব্যাকরণ পড়ত। কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (টোল) ছিল যেখানে শুধু ব্যাকরণই পড়ান হত। এখনও সেরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। নাম যদিও গ্রামার স্কুলই রয়েছে তথাপি ইংল্যান্ডের বর্তমান সে-সব স্কুলকে সর্বতোভাবে আধুনিক বলা চলে।

বহু বৎসর ধরে পাবলিক স্কুলগুলি ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় এক উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু পাবলিক স্কুল ও অন্যান্য সেকেন্ডারী স্কুলের মধ্যে কোন বাঁধাধরা পার্থক্য নেই। পাবলিক স্কুলে সাধারণতঃ ছাত্র ভর্তি হয় তের বৎসর বয়সে। ব্যক্তিগত লাভের জন্য পরিচালিত হয় না বলেই এসব স্কুলের নাম পাবলিক স্কুল। এদের মধ্যে কোন কোন স্কুল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত। কতকগুলি সরকারী সাহায্য পায়। তবে প্রায় অর্ধেকই আবাসিক। স্বাধীন স্কুলগুলি পরিচালনা করে তাদের নিজ নিজ বোর্ড অব্ গভর্ণরস। ছাত্র বেতন নেওয়া হয়।

'প্রিফেক্ট' ও 'হাউজ'—এই দুই প্রথা পাবলিক স্কুলের বৈশিষ্ট্য। এখন তা প্রায় সব সেকেন্ডারী স্কুলেই প্রবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেক ক্লাশে একজন ছাত্রকে 'প্রিফেক্ট' বা প্রধান ছাত্ররূপে নিযুক্ত করাই হল 'প্রিফেক্ট' প্রথা। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভবনের পরস্পরের মধ্যে কাজের প্রতিযোগিতার ভাব গড়ে তোলাকেই বলে 'হাউজ' প্রথা। বাছাই করা ছাত্রদের 'প্রিফেক্ট' নিযুক্ত করায় শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ প্রধানতঃ ছাত্রদের নিজেদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। রাগবী, হ্যারো, ইটন প্রভৃতি পাবলিক

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

গ্র্যাসমিয়ারে কবি ওঅর্ডস্‌ওয়ার্থের কুটির

চেলটেনহাম
মহিলা মহাবিদ্যালয়
—যুক্তরাজ্য

স্কুলের একটা নিজস্ব খ্যাতি আছে। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের অবদান প্রচুর। তাঁদের মধ্যে রাগবীর টমাস আরনল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 'প্রিফেক্টদের' উপর দায়িত্ব দিয়ে এবং খেলাধূলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের সুযোগ দেন। পাবলিক স্কুলের অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণ এই রীতি। তিনিই ধর্মমন্দিরকে শিক্ষার কেন্দ্র করার প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, একটি গ্রামার স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর স্কুলে মাত্র দুটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় ঃ—(১) ধর্ম শিক্ষা ও (২) শারীর শিক্ষা। যদি ছাত্রের অভিভাবক আপত্তি করে তবে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু কদাচিৎ এরূপ আপত্তি হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডের সকল স্কুলেই সাধারণ ভাবে ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া হয়। অভিভাবকের আপত্তি থাকলে ছাত্রকে বাধ্য করা হয় না। মোটের উপর শতকরা ৯৫ জনের বেশী ছাত্র ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করে। আমার মতে এ ব্যবস্থা অতি বাঞ্ছনীয়। আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের ভেতরকার মহৎ প্রবৃত্তির উন্মেষ করে। প্রাচীন ভারতে ধর্মই ছিল সকল শিক্ষার ভিত্তি, কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, আজ ভারতবর্ষে স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। আমার মতে ধর্মশিক্ষার পুনঃ প্রবর্তন আবশ্যক। পাবলিক স্কুলে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা যায়। এই সব স্কুলে ভর্তি হবার আগে প্রস্তুতির জন্য স্কুল (প্রেপ স্কুল) আছে। সেগুলি সাধারণতঃ আবাসিক। পরে যারা পাবলিক স্কুলে ভর্তি হতে চায় সেরূপ আট-তের বৎসরের ছাত্রদের প্রেপ স্কুলে নেওয়া হয়।

মেয়েদের পাবলিক স্কুলের মধ্যে 'চেলটেনহাম লেডিজ কলেজ' উল্লেখযোগ্য। স্বনামধন্যা প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ডরোথিয়া বিল-এর পরিচালনায় এই কলেজ খ্যাতি অর্জন করে। বর্তমানে অধ্যক্ষ আর একজন বিখ্যাত মহিলা শ্রীমতী পপহাম। এ প্রতিষ্ঠান দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রত্যেক ছাত্রী ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের সুযোগ পায়। সৌন্দর্য ও রুচিবোধ বিকাশের ও শারীর শিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। খেলার মাঠগুলি প্রকান্ড, কোথাও বিশৃঙখলার চিহ্নমাত্র নেই। মোট ছাত্রী সংখ্যা ৭৫০, এবং তার মধ্যে ৭০০ আবাসিক। স্কুলটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে। আবাসিক ছাত্রীরা এর ভেতরই থাকে সারা দিনরাত। ফলে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা করে বসে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা চুরাশি অর্থাৎ প্রতি নয় জন ছাত্রী পিছু একজন। ইংল্যাণ্ডের জুনিয়ার বা শিশু স্কুলে গড়ে একত্রিশ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক। সুতরাং এই কলেজ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অল্প কয়েকজনের জন্য পরিচালিত। ছাত্রীরা এখানে অনেকটা যেন কাঁচের ঘরে গরম রাখা সব্জী বা ফলের চারার মত বেড়ে উঠে। আধুনিক জগতের সঙ্গে বেসুরো এবং ইংল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিরোধী তা। বহু আধুনিক শিক্ষাবিদেরও এই মত।

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুলের উচ্চস্থান সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত

ধারণা আছে। 'ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় হয়েছিল ইটন ও রাগবীর খেলার মাঠে—' এ হল সেই ধারণার নাটকীয় অভিব্যক্তি। এর চেয়ে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। প্রথমতঃ—প্রতিভাবান ব্যক্তি কোন প্রথার দৌলতে গড়ে উঠেছে একথা বলা চলে না, আর অবস্থা যাই হোক না কেন, কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তি শুধু তাদের চেষ্টায় একটা জাতিকে বড় করতে পারে না। একটা জাতি বড় হয় যখন তার অধিকাংশ লোক জগতের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে। কালিদাস, শেকস্পীয়ার, গ্যেটে অথবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাহিত্যিক প্রতিভাকে সাধারণ মাপকাঠিতে মাপা যায় না। বিশেষ কোন পদ্ধতিকে সমর্থন করার জন্য এদের নাম ব্যবহার করা চলে না। কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বশালী লোকের নাম করে কোন পদ্ধতিকে সমর্থন করা বড়ই অসঙ্গত নজির। পদ্ধতির সঙ্গে সংগ্রাম করেও তাঁরা বড় হয়ে থাকতে পারেন। যতদূর আমার জানা আছে,—জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ। কিন্তু একজন জার্মান উঠে বলতে পারে—'বেঠোফেন ও ভাগনারের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ, গ্যেটের ন্যায় সাহিত্যিক প্রতিভা, কাণ্ট ও হেগেলের ন্যায় দার্শনিক, বায়ার ও ফিশারের ন্যায় রসায়নী, রণ্টগেন ও আইনস্টাইনের ন্যায় পদার্থবিজ্ঞানী, বেরিং ও এরলিসের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ হয়েছেন জার্মানীতে, কাজেই জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোত্তম।' এরূপ অপযুক্তি যে কোন পদ্ধতির সমর্থনে দেওয়া যেতে পারে। এরূপ মনোবৃত্তি উন্নতির অন্তরায়। সৌভাগ্যের কথা, বহু ইংরেজ নরনারীকে এ বিষয়ে সজাগ দেখেছি।

একটা প্রগতিশীল জাতির চাহিদা মিটাবার জন্য স্কুলগুলির সংস্কার সাধন করা হচ্ছে। সর্বার্থসাধক স্কুলের ব্যবস্থা হচ্ছে। যেখানে সকল প্রকারের মাধ্যমিক শিক্ষাধারার একীকরণ করা হয়েছে। একপ্রকারের কোর্স হতে অন্যপ্রকারে যাতে স্বচ্ছন্দে বদল করা যায় তারই জন্য এই ব্যবস্থা। এগার বৎসর বয়সে ছাত্র যে কোর্স নেয় তের বৎসর, এমন কি তারপরেও সে বিষয়ে পুনর্বিবেচনা হতে পারে।

আগে বলা হয়েছে,—শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার প্রথম কাজে হাত দেয়নি। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল একাজে অগ্রণী। মাত্র ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাকার্যে ব্রতী সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার বার্ষিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করে। তখন অনেক পাবলিক ও গ্রামার স্কুল সুখ্যাতি অর্জন করেছে। একথা সরকারকে স্মরণ রাখতে হয়েছিল। আমি যতদূর বুঝি ইংরেজ জাতি হঠাৎ কোন বিরাট পরিবর্তন চায় না। তারা চায় সংস্কার ও সামঞ্জস্য বিধান করে ধীরে ধীরে পরিবর্তন। শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিকাশ তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। ১৮৭০ সালে শিক্ষা-আইন নীতি হিসাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করে, কিন্তু তা কার্যকরী হয় ক্রমে ক্রমে। ১৯০২ সালের আইনকে ইংল্যাণ্ডে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে। এই আইনে কাউণ্টি কাউন্সিল, কাউণ্টি বরো কাউন্সিল, কতিপয় বরো ও জিলা কাউন্সিলকে 'স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' হিসাবে স্বীকার করা হল। ফলে হয়

সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির দ্রুত উন্নতি। এর পর ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইন। এ আইন বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত স্থির করে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপক আইন পাশ হয় ১৯৪৪ সালে। প্রতি স্তরে শিক্ষার সুযোগ বাড়াবার ও শিক্ষার উন্নতি সাধনের বিধান আছে এই আইনে। পাঁচ হতে পনর বৎসর পর্যন্ত শিশুদের নিজ নিজ বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী সারা সময়ের জন্য শিক্ষা দেওয়া আজ অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য। বর্তমানে এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের শতকরা নব্বুই জন 'স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক পরিচালিত বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে পড়ে। অপেক্ষাকৃত বেশী আয় যাদের, তাদের ছেলে-মেয়েরাও ক্রমে অধিক সংখ্যায় এই সব স্কুলে যাচ্ছে। অল্প সংখ্যক স্বাধীন স্কুলের অন্যায্য প্রভাবও কমে আসছে। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ১৯৫১ সালে প্রথমোক্ত স্কুল-সমূহে ছাত্রসংখ্যা ছিল আটান্ন লক্ষ, স্বাধীন স্কুলসমূহে সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ।

শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করার দিকে ঝুঁকেছিল। এখন যদিও শহর-জীবন যাপনের দিকেই তাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী, তথাপি জাতি হিসাবে ইংরেজদের গ্রামাঞ্চলের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের গ্রামে থাকার জন্য যেভাবে তারা উৎসাহিত করছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শহরের স্কুলের মত গ্রামের স্কুলেও বিনা পয়সায় দুগ্ধ এবং দুপুরবেলাকার খাবার দেবার ব্যবস্থা আছে। দূর দূরান্তরের গ্রাম হতে ছেলেমেয়ে-দের নিয়ে আসার জন্য 'বাস' আছে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে ভবিষ্যতে কৃষিফার্মে কাজ করতে চায়, তারা মাঠে কাজ করে ঐ অঞ্চলের তথা নিজেদের জমি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করছে। গৃহপালিত পশুর যত্ন নিতেও শিখছে। কৃষি পরিবারের প্রয়োজনীয় শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি গ্রাম্য স্কুলের শিল্প ও আসবাবপত্র তৈরীর ঘর দেখেছিলাম। রুচিসম্পন্ন ও প্রচুর সরঞ্জামপূর্ণ এমন স্কুল গ্রামে এর আগে দেখিনি। প্রধান শিক্ষক গ্রাম্য বলে অবহেলার পাত্র নন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও তাঁর পরামর্শ নেন। শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করে। এ আমি বড় পছন্দ করি।

উপরে যা বলেছি, তা হতে একথা পরিষ্কার যে, ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় যথেষ্ট নমনীয়তা রয়েছে। এমন কি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ আছে। উন্নতিমূলক নূতন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে রাষ্ট্র সব সময়েই তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য আগ্রহশীল। নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ইংরেজ জাতি খুব গর্ব অনুভব করে, তবুও পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য অবিরাম চেষ্টার ত্রুটি নেই। ইংরেজ-মনের এই প্রগতিশীল দিক আমাকে আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে বেশী।

এ পর্যন্ত আমরা শুধু স্কুল-শিক্ষার কথা আলোচনা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যালোচনা না করলে শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইংল্যাণ্ডে বারটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার, ডারহাম,

বার্মিংহাম, লিভারপ‍ুল, লিড্স্, ব্রিস্টল, নটিংহাম, শেফিল্ড এবং রেডিং। ১৯৫১ সালে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট লক্ষ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১৯৫০—৫১ সালে ছিল মাত্র চৌষট্টি হাজার। (পঞ্চাশ হাজার ছাত্র ও চৌদ্দ হাজার ছাত্রী)। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় স্কুল ছাত্র-সংখ্যার শতকরা ১½ ভাগেরও কম। এক হিসাবে এ ব্যবস্থা ভাল। অতি-মেধাবী ছাত্র-দেরই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া সঙ্গত। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা সর্বাধিক (১৮·৪ হাজার) তারপরে কেম্ব্রিজ (৭·৮ হাজার) ও অক্সফোর্ড (৭·২ হাজার)। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র পড়ে, তার অর্ধেকেরও বেশী পড়ে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। শতকরা প্রায় ৬২ জন ছাত্র বিজ্ঞান পড়ে অথচ শতকরা ৬২·৬ জন ছাত্রী আর্টস বিষয় পড়ে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ এই দ‍ুই বিশ্ববিদ্যালয়েই বহ‍ু কলেজ আছে। অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং ম‍ুখ্যতঃ আবাসিক এই দ‍ুই বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাধি পাওয়ার জন্য সাধারণতঃ তিন হতে চার বৎসর পড়তে হয়। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রে ডিগ্রী পেতে হলে পাঁচ ছয় বৎসর পড়া দরকার। অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে বি. এ. উপাধি দেওয়া হয়, ছাত্রের পাঠ্য বিষয় সাহিত্য বা বিজ্ঞান যাই হোক না কেন। কিন্তু লণ্ডনে উপাধি বি-এস-সি।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম উপাধি সাধারণ ডিগ্রী বা অনার্স সমেত নিতে পারা যায়। এই অনার্স পরীক্ষাকে কেম্ব্রিজে 'ট্রাইপোজ' বলা হয়। সাধারণতঃ দ‍ুই বৎসরব্যাপী গবেষণা ও উন্নত ধরণের অধ্যয়নের পর যে কোন অন‍ুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের (ব্রিটিশ অথবা অন্যদেশীয়) গ্র্যাজ‍ুয়েটদের 'ডক্টর অব ফিলসফি' এই উপাধি দেওয়া হয়। অক্সফোর্ডে এই উপাধিকেই বলা হয় পি· এইচ· ডি অথবা ডি· ফিল। বিজ্ঞানের প্রসার অথবা সাধারণভাবে জ্ঞানের প্রসারের উপযোগী প্রবন্ধ লিখে যে সকল ছাত্র যশস্বী হয়েছেন, তাঁদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি (লিট ডি, ডি লিট্, এস সি ডি, ডি এস সি) দেওয়া হয়। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের কোন কোন বিষয়ের উপর গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে! এ সমস্ত গবেষণা ব্রিটিশ শিল্পের প্রসারে সাহায্য করেছে। কিন্তু দ‍ুর্ভাগ্যের কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে পর্যন্ত এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার দ্বার ছাত্রীদের জন্য খোলা ছিল না। ১৮৮১ খ‍ৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের 'ট্রাইপোজ' পরীক্ষায় যোগদানের স‍ুযোগ দেওয়া হয় ছাত্রীদের। কিন্তু মাত্র ১৯২০ খ‍ৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে ছাত্রীদের সদস্যভুক্তির প‍ূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

১৮৭৮ খ‍ৃষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণে ছাত্রীদের অধিকার স্বীকার করা হয় এবং সভ্য শ্রেণীভুক্ত হবার স‍ুযোগ প‍ূর্ণভাবে দেওয়া হয় ১৮৮০ খ‍ৃষ্টাব্দে। বলা হয়ে গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর শিক্ষা বিভাগের কোন অধিকারই নেই। স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গ‍ুলি সরকারের

নিকট হতে অর্থ সাহায্য পায়। 'বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিটি'র পরামর্শ অনুসারে সোজাসুজিভাবেই খাজাঞ্চিখানা থেকে এ সাহায্য আসে। প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির স্ব স্ব অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারাই এ কমিটি গঠিত। যুদ্ধের পর গ্রেট-ব্রিটেনের বিদ্যালয়গুলি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে বৎসরে বিশ লক্ষ পাউণ্ডের সামান্য কিছু বেশী অর্থ সাহায্য হিসাবে পেয়েছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে সংখ্যাকে দ্বিগুণ করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে হয় দুই কোটি সাড়ে বত্রিশ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক, রিডার এবং সহকারী লেকচারার প্রভৃতি নিযুক্ত রয়েছেন। ১৯৫০-৫১ সালে ইংল্যাণ্ডে চৌষট্টি হাজার ছাত্রের জন্য পুরা সময় কাজে নিযুক্ত আছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৬৩৭৩ জন। পৃথকভাবে ছাত্রদের বিশেষ যত্ন নেবার জন্যও যথেষ্ট শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ছাত্রদের একটি বৃহত্তম অংশই সরকারী বা বে-সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। ১৯৪৯-৫০ সালে ইংল্যাণ্ডের শতকরা প্রায় ছিয়াত্তর জন ছাত্র এরকম সাহায্য পেয়ে লেখাপড়া করছিল। সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলি নিজ নিজ সংগৃহীত অর্থ থেকে অসংখ্য বৃত্তি ছাত্রদের দেয়। এ ব্যাপারে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত দানও অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বৃত্তি ও পুরস্কার দানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে যেখানে এরকম বৃত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬০ ও ৭৫০ ছিল, ১৯৫১ সালে সেখানে বৃত্তি দেওয়া হল ১৮৫০টি। অনার্স ক্লাসের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি দেয় শিক্ষা-মন্ত্রী দপ্তর। ১৯৩৮-৩৯ থেকে ১৯৪৮-৪৯ সালে অর্থাৎ দশ বৎসরে, সমস্তক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পড়তে পারে (আগে অনেক ছাত্র শুধু আংশিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত—অর্থনৈতিক কারণে), এমন্ ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ⅓ ভাগ। কোন ছাত্র টাকার অভাবে পড়াশুনা বন্ধ করতে বাধ্য হবে, সরকার তা চায় না।

সকলের শেষে বলবো,—শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে মধুর সম্পর্কের স্বাদ পেয়েছি, আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে তা। অতি সহজভাবে ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছে যেতে পারে এবং নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। অতি সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ রচনা করতে পেরেছেন শিক্ষকরা। ফলে ছাত্ররা তাঁদের বন্ধু মনে করতে পারে অথচ সে সঙ্গে শ্রদ্ধাও করতে শিখে। সহযাত্রী যেন তাঁরা। একথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ উপনিষদের বাণী, যেখানে গুরু শিষ্যকে বলছেন একসঙ্গে জ্ঞান লাভের কথা।

উপসংহারে আবার বলি—"কর্তৃপক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচালনায় শিশু ও শিক্ষক ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থার অংশীদার। আজ আমার একমাত্র চিন্তা ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে যদি কখনো কোন পুনর্গঠনের কাজ করি তখন এই আদর্শই যেন আমার মনে সর্বোচ্চ স্থান পায়।"

উপরের প্রবন্ধ ব্রিটেনের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেয়। তবুও স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা বোধ হয় সংগত হবে। স্কটল্যাণ্ডে ইটন, রাগ্‌বী বা হ্যারোর মত কোন পাবলিক স্কুল নেই। একজন বা দু'জন শিক্ষকের স্কুল আছে। একজন শিক্ষক একই ঘরে চার পাঁচ শ্রেণীর ছাত্রকে একসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় পড়ান। দু'জন শিক্ষকের স্কুলে শিশুদের দুটি ঘরে ভাগ করে পড়ান হয়। ইংল্যাণ্ডে ১১ বৎসর বয়সের সময়ে ছাত্রদের বাছাই করার পদ্ধতি আছে কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে তা করা হয় সাড়ে এগার হতে সাড়ে বার বৎসরের মধ্যে।

ব্রিটেনের অধিবাসীদের শতকরা দশ ভাগ বাস করে স্কটল্যাণ্ডে কিন্তু স্কুলে ছাত্র-সংখ্যার শতকরা ১১.২ ভাগ (৮ লক্ষের কিছু উপরে) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রসংখ্যার ১৮·৮ ভাগ (ষোল হাজার) রয়েছে সেখানে। শতকরা পঁচিশ ভাগ ছাত্রী আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তুলনায় স্কটল্যাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেশী, মোট চারটি—এডিনবরা, গ্লাসগো, এবারডিন ও সেণ্ট এণ্ড্রুজ। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইংল্যাণ্ডের ছাত্র সমাজের বৃহত্তম অংশ সরকারী বা বে-সরকারী বৃত্তি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ১৯৪৯-৫০ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের হার ছিল ইংল্যাণ্ডে শতকরা ছিয়াত্তর জন, স্কটল্যাণ্ডে সাতান্ন এবং ওয়েলস-এ চুরাশি জন। ওয়েলস-এ একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে—কার্ডিফ। ছাত্রসংখ্যা পাঁচ হাজারের সামান্য কিছু বেশী।

ব্রিটেনের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বিজ্ঞান কলেজের মধ্যে প্রথম দেখি লণ্ডনের স্যার জন কাস কলেজ। এ কলেজে ছাত্রদের লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এস-সি উপাধির জন্য পড়ান হয়। সেখানকার শিক্ষাদানের উচ্চ মান আমাকে আকৃষ্ট করেছে। বিশেষ যত্নসহকারে আমি রসায়নাগারগুলি দেখি। বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী এমন সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ কোন রসায়নাগার ভারতে দেখি নি। খুব অল্প জিনিস নিয়ে কাজ করার প্রণালী (মাইক্রো টেকনিক) বাস্তবিকই উন্নত ধরণের। ছাত্র ভর্তি করার সময় অতি সাবধানতার সহিত বাছাই করা হয়। বাছাই করার এই পদ্ধতির কথা ব্রিটেনের প্রায় সর্বত্রই আমাকে বলা হয়েছে। লণ্ডনের 'ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়ান্স'-এর অধ্যাপক আর. পি. লিনষ্টেড বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন এই বাছাই ও তারপর নিয়মিত তদারক করার উপর। কেম্ব্রিজে প্রাণ-রসায়ন বিভাগের একজন রীডার এই বলে অভিযোগ করছিলেন যে, ছাত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হাত নেই অথচ ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব আছে। বিভিন্ন কলেজই ছাত্র বাছাই করে। তিনি আরও বলেন যে, এমন ছাত্র নির্বাচিত হয়েছে যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা মোটেই সংগত হয় নি।

ভারতবর্ষে সাবধানতার সহিত বাছাই করা আরও বেশী দরকার। কারণ এ দেশে বিজ্ঞানাগারে ছাত্রের কাজ করার স্থান আরও কম। যে সকল ছাত্র গণিতে পারদর্শী আমার মতে কেবলমাত্র তাদেরই বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করা উচিত।

আমাদের বিজ্ঞানাগারগুলিকে আরও ভালভাবে সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ করা দরকার। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কোন না কোন বিষয়ে অনার্স নেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। বি-এস-সি পর্যন্ত পড়ান হয় এমন সব কলেজেই শিক্ষকদের জন্য গবেষণার সুযোগ থাকা দরকার। ছাত্রদিগকে পরিচালিত ও সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক থাকা দরকার। এ সব ব্যবস্থা হলে আমাদের দেশের ছাত্ররা পৃথিবীর অন্য দেশের ছাত্রদের পেছনে পড়ে থাকবে না। ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার মান যদি উঁচু করা না হয় তাহলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনদিনই আমরা পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারব না।

জৈব ও প্রাণ-রসায়নের অনেক গবেষণাগার দেখবার এবং ব্রিটেনের অনেক যশস্বী রসায়নবিদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও হয়েছিল। সকলের কাছেই সৌজন্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। এডিনবরার অধ্যাপক কেন্ডাল অতি সুরসিক লোক। তিনি বললেন,—"আজকাল প্রাণ-রসায়ন বলতে বোঝায় জৈব-রসায়ন, জৈব-রসায়ন হচ্ছে ভৌত-রসায়ন, ভৌত-রসায়ন পদার্থবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা গণিত, গণিত দর্শন শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্র যে এখন কি তা জানি না।" কিন্তু আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন এডিনবরার অধ্যাপক মেরিয়ান। তাঁর প্রাণখোলা আচরণ, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ভারতবর্ষের বিজ্ঞানাগার বিষয়ে আলোচনার প্রেরণা জোগায়। এ বিষয়ে আমার আগ্রহও ছিল। এই আলোচনার সারাংশ ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ছয়) দেওয়া হয়েছে। সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি শুনে তিনি বললেন—"বাজেলে অধ্যাপক রাইসন্টাইনের সঙ্গে অবশ্য দেখা করবেন। আমার মতে পৃথিবীর জীবিত জৈব-রসায়নীদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একজন নিখুঁত ভদ্রলোক।" দুঃখের বিষয় যখন আমি বাজেলে যাই তখন অধ্যাপক রাইসন্টাইন সেখানে ছিলেন না। কাজেই একজন সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। অবশ্য অধ্যাপক মেরিয়ানের সঙ্গে আলাপের সময় লেশমাত্র সন্দেহও আমার মনে ছিল না যে, আমি একজন নিখুঁত ভদ্রলোকের সান্নিধ্যে রয়েছি। আর একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের সঙ্গে এডিনবরাতেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি অধ্যাপক হার্স্ট। ভাইটামিন সি' সংশ্লেষণ করার জন্য তিনি বিখ্যাত।

ব্রিটেনের গবেষণাগারগুলি দেখে এই নিশ্চিন্ত ধারণায় পৌঁছেছি যে, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি তৈরী ব্যাপারে মিতব্যয়িতা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞানাগারের সাজ-সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি) আজকাল খুবই মহার্ঘ। ব্রিটেন ১৯৩০ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যেমন ধনী ছিল বর্তমানে তেমনটি নেই। তথাপি ভারতের তুলনায় অনেক বেশী ধনী। সেই ব্রিটেনও বিজ্ঞানাগারের জন্য জাঁক-জমকশীল প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরীর কথা ভাবে না। অথচ ভারতবর্ষে সেটা যেন এক বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্সফোর্ডে অধ্যাপক রুডলফ পিটার্স আমাকে একটি সাধারণ চালাঘরে বিজ্ঞানাগার দেখিয়েছিলেন।

একজন জৈব-রসায়নবিদের কাজে লাগতে পারে এমন সব যন্ত্রপাতি কোন বিজ্ঞানাগারেই রাখা সম্ভবপর নয়। কারণ তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনাবশ্যক। কাজেই যে যে বিষয়ে গবেষণা চলে তার জন্য প্রয়োজন মত যন্ত্রপাতি প্রত্যেক বিজ্ঞানাগারে রাখা হয়। গবেষণাগার গড়ে উঠে অধ্যাপককে কেন্দ্র করে এবং প্রত্যেক গবেষণাগারেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একটি গবেষণাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রয়োজন অধ্যাপককে গড়বার পূর্ণ সুযোগ ও প্রচুর অর্থ দেওয়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক কিছুটা উঁচুদরের গবেষণা করেছেন। ব্রিটেনে তাঁর প্রশংসাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর কাছে শুনে আশ্চর্য হলাম যে, গবেষণার জন্য তিনি বার্ষিক সাহায্য পান মাত্র দু' হাজার টাকা (প্রায় দেড়শো পাউন্ড)।

আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারগুলিকে আরও সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ করা দরকার এবং যে সকল অধ্যাপক গবেষণাক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য ও সর্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নন, এমন বৃদ্ধ অধ্যাপকদের এদেশে না এনে আমাদের মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কর্তব্য। বিদেশী বিজ্ঞানীদের এদেশে আনবার বিরোধী আমি নই। কিন্তু শুধু প্রথম শ্রেণীর অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বিদেশী বিজ্ঞানীদের আনবার কথাই আমাদের ভাবা উচিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারসমূহের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিপুল অর্থব্যয়ে বিরাট গবেষণাগার তৈরি করে সারা পৃথিবীব্যাপী তার অধ্যক্ষের জন্য খোঁজ করার পূর্বে এর উপরই বেশী জোর দেওয়া উচিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমন হওয়া উচিত যেন তারাই নূতন তৈরী বিজ্ঞানাগারসমূহের জন্য যোগ্য লোক সরবরাহ করতে পারে। যতই দিন যাবে অন্য কোন দেশ হতেই প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী পাওয়া যাবে না। আমাদের শাসকদের একথা মনে রাখতে হবে।

ব্রিটেন মুখ্যতঃ শিল্পপ্রধান দেশ। শতকরা পাঁচজন মাত্র কর্মী কৃষিকাজ করে। অথচ কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের চেয়ে ব্রিটেনে কৃষিকাজের দিকে নজর বেশী। ইংল্যাণ্ডের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওয়েলসের বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিভাগ আছে। স্কটল্যাণ্ডে তিনটি কৃষি কলেজ আছে। সাধারণ কৃষিকাজ শিক্ষার জন্য কতকগুলি ফার্ম-বিদ্যালয় আছে। সেখানে এক বৎসরের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও সরকার কৃষির উন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ঃ

(১) ভাল বীজ সরবরাহ—আইন অনুযায়ী পূর্বে পরীক্ষা না করে প্রধান প্রধান শস্য ও সব্জীর বীজ বিক্রীর জন্য বাজারে ছাড়া হয় না বা বিক্রী করা হয় না। বীজের বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার প্রভৃতি তথ্য খরিদ্দারকে জানান হয়।

(২) সার সরবরাহে সরকারী সাহায্য—জমির উর্বরা শক্তি বাড়াবার জন্য চূণ

দেওয়ার খরচের অর্ধেক পরিমাণ কৃষকরা পায়। নাইট্রোজেন সমন্বিত সার দেওয়ার খরচের শতকরা পনের ভাগ এবং ফসফেট সারের ত্রিশ ভাগের কিছু বেশী বর্তমানে সরকার দেন।

(৩) জল সরবরাহ—কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য সাহায্য দেওয়া হয়। জল যদি কৃষকের নিজের হয় তবে সরবরাহ খরচের শতকরা চল্লিশ ভাগ আর জল যদি সরকারী বিভাগের হয় তবে খরচের শতকরা পঁচিশ ভাগ কৃষককে দেওয়া হয়।

(৪) দামের গ্যারাণ্টি ও বিক্রির নিশ্চয়তা—দুধ, ডিম, মাংস, যব, আলু প্রভৃতির দাম কৃষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হয়। ফসল কাটার আঠার মাস পূর্বে কৃষক ফসলের দাম এবং কি পরিমাণ শস্য সরকার খরিদ করবেন, তা জানতে পারে, আর গৃহপালিত পশুজাত খাদ্যের মূল্য বার মাস পূর্বে জানতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের আসল উদ্দেশ্য—"জাতির স্বার্থে যতটা খাদ্যদ্রব্য ব্রিটেনে উৎপন্ন করা যুক্তিযুক্ত ততটা যাতে উৎপন্ন হতে পারে চাষ ব্যবস্থাকে তার উপযোগী করা এবং উৎপাদনকারী কৃষকদের উপযুক্ত মজুরী, জীবন ধারণের মানের ও নিযুক্ত মূলধনের প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব কম মূল্যে জিনিস উৎপন্ন করা।"

ব্রিটিশ-কৃষকদের উৎপন্ন জিনিসের অধিকাংশই সরকার খরিদ করে। সাধারণতঃ খরিদ দরের চেয়ে কম দামে বিক্রী করে। এই লোকসান ক্রেতাদের জন্য সরকারী সাহায্য হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এতে উৎপাদকদের সাহায্য হয়।

(৫) কর্মীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক—কৃষিকর্মীরা সপ্তাহে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড মজুরী পায়। কারখানা-শ্রমিকদের বেতনের সঙ্গে তুলনায় ইহা সন্তোষজনকই।

শুধু এই নয়, সমস্ত জাতির সুষম খাদ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই কৃষি পরিকল্পনা করা হয়। তাই শুধু গম, যব জাতীয় খাদ্যই নয়, সব্জী, দুধ, ডিম, মাছ প্রভৃতি খাদ্যও কি পরিমাণ উৎপন্ন করতে হবে তা নির্ধারিত হয়।

যদিও ব্রিটেন খাদ্য আমদানীর পরিমাণ কমিয়েছে তথাপি এই সব ব্যাপক কর্মপন্থা গ্রহণ করে জনসাধারণের পুষ্টির মান উঁচু করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে খাদ্যদ্রব্যের তাপাঙ্ক বা ক্যালোরির পরিমাণ যুদ্ধপূর্বকার সময়ের সমান ছিল (গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু তিন হাজার ক্যালোরি), কিন্তু প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ শতকরা প্রায় দশভাগ বেড়ে গিয়েছে (আগে ছিল ৭৯·৯ গ্রাম, এখন ৮৮·১ গ্রাম, এর মধ্যে ৪২·৭ গ্রাম জৈব প্রোটিন)। ক্যালসিয়াম খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে বিশেষভাবে (আগে ছিল ৬৯৩ মিলিগ্রাম, এখন হয়েছে ১২১৬ মিলিগ্রাম)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনে গম, যব ইত্যাদি তৈরীর চেয়ে দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি জান্তব খাদ্য ও সব্জী তৈরীর উপরই বেশী জোর দেওয়া হত। কিন্তু গম, যব ইত্যাদি আমদানী করতে হলে জাহাজে স্থানের প্রয়োজন হয় বেশী। যুদ্ধের সময় তার হল অভাব। কাজেই পরিবর্তিত হল ব্রিটিশ কৃষিনীতি।

ব্রিটেনে কৃষি উৎপাদনের মধ্যে দুধ একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যাদের

আয় কম, ব্রিটেনেও তাদের খাদ্যে গম, যব ইত্যাদির স্থান মুখ্য। তাদের খাদ্য পুষ্টিকর করার জন্য অধিকতর দুধ উৎপাদন ও পানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মিঃ সি. এইচ. চামারস স্কটল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রধান দুধ-পরিদর্শক। সাক্ষাৎকালে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন (সে গর্ব অতি সঙ্গত) যে, দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা এখন ১৯৩৫ সালের চারগুণ পরিমাণ দুধ খায়। এ সত্ত্বেও অবশ্য ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য রয়েছে। ধনিক শ্রেণীর লোকেরা মাথাপিছু সপ্তাহে ছয় পাইন্ট দুধ খায় আর দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা খায় সাড়ে চার পাইন্ট। এ বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এরই নাম কার্যতঃ সমাজতন্ত্র। ১৯৩৯ সালে স্কটল্যাণ্ডে দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩·৪ কোটি গ্যালন (১ গ্যালন বা ৫ সের) আর ১৯৫৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি গ্যালন অর্থাৎ বৎসরে মাথা-পিছু ৪০ গ্যালন বা ৪০০ পাউন্ড। প্রতি গরুর গড়ে দুধ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ছে। অধিকতর ভাল খাদ্য দেওয়া, উন্নত প্রজনন এবং রোগ প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রভৃতি উপায়ই এর কারণ। ব্রিটেনে লোকেরা বৎসরে ১৮০ কোটি গ্যালন দুধ খায়।

১৯৫১-৫২ সালে বৃটেনে ৮০০ কোটির কিছু বেশী মুরগীর ডিম উৎপন্ন হয়েছিল।

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ মাত্র ৪৩ গ্রাম—তার মধ্যে জান্তব প্রোটিন দশ গ্রামেরও কম। কাজেই রথামষ্টেডে যখন মিঃ এন. ডব্লিউ. পিরির সঙ্গে দেখা হয় তখন জিজ্ঞাসা করি—"মানুষের খাদ্যে সর্বনিম্ন কি পরিমাণ জান্তব প্রোটিন থাকা অবশ্য দরকার?" তিনি বললেন,—"আসল কথা জান্তব প্রোটিনের পরিমাণ নয়, অত্যাবশ্যক 'য়্যামিনো য়্যাসিডে'র পরিমাণ। ঘাসের প্রোটিনেও সব রকমের অত্যাবশ্যক 'য়্যামিনো য়্যাসিড' আছে।" তারপর মিঃ পিরি কিভাবে ঘাস থেকে প্রোটিন বের করা যায় তার ব্যাপক পরীক্ষামূলক কার্য দেখালেন। ব্রিটেনে প্রচুর ঘাস ও ঘাসের জমি আছে। তথাপি ঘাস থেকে প্রোটিন বের করে নিলে সে ঘাস পশুর পক্ষে পুষ্টিকর থাকবে কিনা সে প্রশ্ন মনে আসে। আমরা অবশ্য সাধারণতঃ যে সমস্ত শাক-পাতা ভারতের লোকেরা খায় তাদের মধ্যে কোন্ প্রকারের কতটা 'য়্যামিনো য়্যাসিড' আছে তা নির্ধারণ করতে পারি। তা হলে বুঝতে পারা যাবে, এই শাক-পাতা হতে আমাদের প্রয়োজনীয় 'য়্যামিনো য়্যাসিডে'র কতটা আমরা পেতে পারি।

যে প্রশ্ন আমি মিঃ পিরিকে করি, ঠিক সেই প্রশ্নই অক্সফোর্ডের মনুষ্যপুষ্টি বিজ্ঞানাগারের ডাঃ সিনক্লেয়ারকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন,—"নিশ্চিতরূপে কি প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্যে জান্তব প্রোটিন অবশ্য প্রয়োজনীয়?"

যুদ্ধের পর ব্রিটেনের কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার অধিক পরিমাণে হয়েছে। এর কারণ কর্মীর অভাব। যন্ত্রীকরণের সঙ্গে অধিক উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই।

একথা আমাদের দেশের পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত।

পূর্বেই বলেছি, ভারতীয় কৃষ্টির মত ব্রিটিশ কৃষ্টিরও মূল কথা পরিবর্তনধর্মী রক্ষণশীলতা। ব্রিটিশ জাতি সংস্কার এমন কি আমূল পরিবর্তন সাধনও করে, কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে না। রাণী এলিজাবেথের অভিষেকের মাত্র কিছুদিন পূর্বে আমি সেখানে ছিলাম, তাই সে কথা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের একজন মহিলা কর্মী আমাকে লণ্ডনের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান দেখাবার সময় প্রায় সারাক্ষণই রাণী এলিজাবেথের সম্বন্ধে গল্প করেন। আমি খুব বিনীতভাবে তাঁকে বলি,—"আসল কথা ত এই যে, তিনি মাত্র নিয়মতান্ত্রিক রাণী। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে যা বলতে বলেন তিনি শুধু তাই বলেন।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে একটা বিষাদের চিহ্ন দেখা গেল। পরক্ষণেই তাঁকে বললাম,—"আমি যা বলেছি তা যুক্তির কথা, কিন্তু মানুষের জীবনে যুক্তির স্থান মুখ্য নয়, গৌণ। মানুষের জীবনে সাধারণতঃ হৃদয়ই নির্দেশ দেয় যুক্তি তাকে অনুসরণ করে।" অমনি তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল মুখখানা। আমি একজন ভারতীয়। তাই তাঁর মনের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। ধর্ম বিষয়েও ভারতবর্ষে আমরা যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেছি। প্রাচীন ভারতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা সুপ্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ হিন্দুদের মধ্যে এই সব দেবপূজা প্রচলিত নয় বললেও চলে। হিন্দুরা বর্তমানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে। তথাপি নিজেদের সেই সনাতন বৈদিক ধর্মাবলম্বীই মনে করে। ব্রিটিশ জাতি এখন আর রাজা বা রাণীর ভগবদ্দত্ত অধিকারের কথা স্বীকার করে না। বস্তুতঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক লোকের মধ্যে ব্রিটিশ অন্যতম। তা সত্ত্বেও প্রাচীন যুগের মতই রাজা বা রাণীর প্রতি তাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বর্তমান। রাজ্যাভিষেকের প্রাচীন সমস্ত অনুষ্ঠান আজও চলে আসছে। রাণী এলিজাবেথের অভিষেকের সময় যে উচ্ছ্বাস তারা দেখিয়েছে অনেকের মতে তা নেহাৎ শিশুসুলভ।

রাজ্যাভিষেকের ঠিক আগে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভিষেকের পর রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ নামে পরিচিত হবেন এরূপ স্থির হয়। এরূপ নামকরণে স্কটল্যাণ্ডে ক্ষোভ দেখা দেয়। কারণ প্রথম এলিজাবেথ স্কটল্যাণ্ডের রাণী ছিলেন না। স্কচ জাতি নিজেদের কৃষ্টি সম্বন্ধে খুব একটা গর্বের ভাব পোষণ করে এবং তারা সেই কৃষ্টিকে রক্ষা করতে চায়। স্কট, বার্ণস অথবা ব্রুসের প্রতিমূর্তি স্কটল্যাণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না সেক্সপীয়র, মিলটন বা টেনিসনের কোন প্রতিমূর্তি। এডিনবরা দুর্গ দেখলেই বোঝা যায়, তারা কিভাবে স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসকে তাদের মনে জাগরূক রাখবার চেষ্টা করছে। বিশ্বযুদ্ধে যে সমস্ত সৈন্য জীবন দিয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্যে যে যুদ্ধস্মারক নির্মিত হয়েছে পৃথিবীতে তা' অদ্বিতীয়। ইংল্যাণ্ডের চেয়েও

স্কটল্যাণ্ডকে আমার অনেক বেশী সুন্দর মনে হয়েছে। আমি নিঃসঙ্কোচেই বলছি যে, লণ্ডনে কিছুদিন থাকার পর এডিনবরা গিয়ে যেন স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু গ্লাসগোর নিকটে ক্লাইড নদীর জলকে যেভাবে তারা নোংরা করেছে তা দেখে দুঃখ হল। স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে গ্লাসগোর বস্তি অঞ্চল নিতান্ত বেমানান মনে হল। মানুষের বুদ্ধিচাতুর্য ও শিল্পবিপ্লব এর জন্য দায়ী।

ব্রিটিশ জাতি পুরাণো জিনিসকে অতি যত্নে রক্ষা করতে ভালবাসে। লণ্ডন টাওয়ার, হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস ও ষ্ট্রাটফোর্ড অন য়্যাভন দেখে সে কথার সত্যতা উপলব্ধি করলাম। এ সমস্ত জায়গা দেখতে দেখতে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি যে, লর্ড কার্জন (এক সময় ভারতের বড়লাট) কর্তৃক প্রত্নবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন মনুমেণ্ট রক্ষা বিল পাশ ব্রিটিশ জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লণ্ডন টাওয়ারে রক্ষিত রাজ-অলংকার, মণিমুক্তাদি যখন দেখি তখনকার একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কোহিনুর হীরকটি সেখানে ছিল। সামনে গিয়ে বেশ মনোযোগের সঙ্গে যখন সেটি দেখছিলাম তখন একজন ইংরেজ মন্তব্য করলেন,—"দেখুন এ কোহিনুর দেওয়া হয়েছিল উপহার হিসাবে। কাজেই ফেরৎ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।" আমি শুধু ধীর শান্তভাবে বলি,—"চাপে পড়ে উপহার দিয়েছিল কি?"

ব্রিটিশ জাতির ঐতিহাসিক জ্ঞাননিষ্ঠার প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কিন্তু লণ্ডন টাওয়ারে রক্ষিত রাজ-অলংকার, মণিমুক্তাদি যখন দেখি নিষ্ঠুরতার সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার প্রশংসা করতে পারি না। আমার মতে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন ছেলেমেয়েকে সেখানে যাবার অনুমতি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লণ্ডন টাওয়ার যাবার পথে লণ্ডনের বিখ্যাত মাছের বাজার বিলিংসগেটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি প্রতিদিন মাছ খেতে ভালবাসি, কিন্তু সেই আমিও সেখানকার গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল দেই। বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী আমার গাইডকে চুপি চুপি নাকে রুমাল দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। যখন শুনলে যে, মাছের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল দিয়েছি, তখন হেসে তারা কুটিপাটি হল। জিনিসের সৌন্দর্য যেমন দ্রষ্টার চক্ষু ও মনের উপর নির্ভর করে, তেমনি গন্ধও মানুষের মন ও নাকের উপর নির্ভরশীল।

ষ্ট্রাটফোর্ড অন য়্যাভন সেক্সপীয়ারের জন্মস্থান। সে স্থান দেখে যে আনন্দ পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। এ যেন একটি তীর্থস্থান। ছোট্ট মনোরম শহরটি। কারখানানিঃসৃত ময়লা জল এসে ছোট নদী য়্যাভনের জলকে নোংরা করেনি। "সেক্সপীয়ার স্মৃতি থিয়েটার কমিটি" একটা সত্যিকারের সুকাজ করেছে। কবির নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করে শুধু তারা ব্রিটেনের নয়, সমস্ত জগতের কৃষ্টির সেবা করছে। আমরা "তৃতীয় রিচার্ড" নাটক অভিনয় দেখি। দেখতে দেখতে যেন

ফিরে গিয়েছিলাম তৃতীয় রিচার্ডের যুগে। কলাকুশল অভিনব। দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ফিরে এসে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন যান, তখন আমার এক বন্ধু তাঁকে শান্তিনিকেতন কেমন লাগল এ প্রশ্ন করেন। মহাত্মাজী জবাব দিয়েছিলেন—"যেখানে শিল্পকলা সেখানেই জীবন।" সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখে ঐ কথা কয়টি বার বার আমার মনে জেগে উঠেছিল।

ব্রিটেনের ফুলে সৌন্দর্য আছে কিন্তু সুষমা নেই—সেখানকার প্রথম শ্রেণীর বোটানিক্যাল গার্ডেন—"কিউ গার্ডেন" দেখে আমার সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রিটেনের কোন অধিবাসীই এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে রাজী নন। অবশ্য এখানকার নানা প্রকারের "রডোডেনড্রন" ফুল আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মনে মনে তাদের সঙ্গে তুলনা করলাম হিমালয়ের বার হাজার ফুট উঁচুতে তুঙ্গনাথে দেখা রডোডেনড্রন গুচ্ছের সঙ্গে। সহজভাবেই মনে এলো কবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের একটি সুন্দর পদ—"দূরীকৃতা উদ্যানলতা বনলতাভিঃ"—সহজাত বনলতা সযত্নপুষ্ট উদ্যানলতাকে হার মানিয়েছে। ব্রিটেন-বাসী বুনো ফুলকেও অতি যত্নে রাখে। সারা দেশেই আমি বুনো ফুল দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। কিউ গার্ডেন অতি পরিপাটি করে রাখা হয়েছে। কোন প্রকারের অসুবিধা বোধ না করে দর্শকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাটাতে পারে। কেউ কিন্তু একটি ফুল বা পাতাও ছেঁড়ে না।

আমাদের পুরান বন্ধু শ্রী বি. জি. খের তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার ১৪-৪-৫৩ তারিখে বাজেট দিবসে হাউস অব কমন্সে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। সেখানে প্রথমই আমার নজরে পড়ে সভ্যদের মধ্যে টাকবিশিষ্ট লোকের সংখ্যাধিক্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জীবনে টাকবিশিষ্ট এত লোককে এক জায়গায় কখনো দেখিনি। "হাউস অব কমন্স"-এর ব্যবস্থাদি ভারতীয় লোকসভা প্রভৃতির ব্যবস্থার চেয়ে অনেক সুষ্ঠু। আমাদের দেশে দর্শকদের গ্যালারী এত সুন্দর নয়। বেঞ্চের প্রত্যেক বসবার জায়গায় পেছনে লাউড-স্পীকারের ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্নোত্তরকালে মনে হল দেশরক্ষাসচিব একজন বুদ্ধিমান লোক। অর্থসচিব মিঃ বাটলার ৪২৫.৮ কোটি পাউন্ডের বাজেট উপস্থিত করলেন। বাজেটে সামান্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত ছিল। তিনি সুবক্তা, খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাতে এমন কি বক্তৃতা কিছুটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলেও মনে হতে পারে। তিনি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে এবং মজুরী বৃদ্ধির বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল প্রশ্নোত্তরকালে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু বাজেট বক্তৃতার সময় সমস্তক্ষণই স্থির হয়ে বসেছিলেন। বিরোধীদলের নেতা মিঃ এটলী শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত মিঃ হার্বার্ট মরিসন মিঃ বাটলারের বক্তৃতার পর খুব অল্প কিছু বললেন। স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য বলার জন্য

মিঃ বাটলারকে অভিনন্দন জানালেন এবং বাজেটে অনেক কিছু বিবেচনা করার আছে—একথা বলেই শেষ করলেন। বাজেটের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। তা স্বাভাবিকই। আমি অবশ্য ভাবতেও পারিনি যে ঠিক এর পর মুহূর্তেই বাজেট আলোচনা সুরু হবে। কারণ ভারতে সেরূপ হয় না। দু'জন শ্রমিক দলের সদস্য বাজেট আক্রমণ করে বক্তৃতা দিলেন। তার মধ্যে নটিংহাম হতে নির্বাচিত সদস্য বাজেটকে ধনতান্ত্রিক আখ্যা দিলেন এবং মিঃ বাটলারের অর্থনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ভিক্টোরিয়া যুগের মধ্যভাগের পরিত্যক্ত মতবাদ বলে অভিহিত করলেন। অতি কঠোর ভাষায় তিনি পারিশ্রমিকের হার না বাড়ানো নীতির সমালোচনা করেন। তিনি এমন কথাও বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে, মিঃ বাটলার অযোগ্যধনিকগোষ্ঠীর মুখপাত্র। তিনি বললেন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অনেক উচ্চহারে মজুরী দেয় অথচ অনেক জিনিস সস্তাদামে বিক্রী করে। প্রায় ৪৫ মিনিটকাল এই সদস্য বক্তৃতা করেন। আমার মনে হয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিলেন তিনি। সম্ভবতঃ সেদিন বিরোধীদলের কোন প্রধান বক্তা বক্তৃতা করবেন না বলেই স্পীকার সময় সম্বন্ধে কড়াকড়ি করেননি। বাজেট বক্তৃতার ঠিক পরেই আলোচনা সুরু হয়েছে, তাও হয়ত এর অন্য কারণ। এ সব বক্তৃতার সময় অধিকাংশ সভ্যই সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। বাজেট বক্তৃতার পর মুহূর্তেই এসব বক্তৃতা হয়—একথা বিবেচনা করে আমাকে বলতেই হবে যে, বক্তৃতার মান বেশ উঁচুদরের।

ভারতীয় পোশাক, ভারতীয়ই বা বলি কেন, শীতকালীন বাঙ্গালী পোশাক পরেই আমি হাউস অব কমন্সে গিয়েছিলাম। একথা সানন্দে বলছি যে, এই পোশাকের জন্য আমাকে কোন প্রকারের অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। তবে এখানে যে মজার ঘটনাটি ঘটে তার উল্লেখ করতে চাই। একজন দর্শক (শ্বেতকায়) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মিঃ নেহেরু?" আমি অবশ্য জবাব দিলাম—"না।" মনে মনে ভাবছিলাম, ব্রিটেনের পত্রিকাগুলিতে কি শ্রীনেহেরুর ফটোগ্রাফ ছাপানো হয় না? কিন্তু এ সম্পর্কে আরও মজার ঘটনা ঘটে এডিনবরার এক হোটেলে। আমি সেই হোটেলেই ছিলাম এবং এক ইংরেজ ভদ্রলোকও ছিলেন সেখানে। গত লড়াইয়ের সময় সৈন্য বিভাগে অফিসার হিসাবে তিনি কাজ করেন ভারতে। অতি ভাল মানুষ এবং আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি যথাসাধ্য করেছেন। হাউস অব কমন্স-এর উপরোক্ত ঘটনার কথা শুনে তিনি বললেন,—"এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন, মিঃ নেহরুর সঙ্গে যে আপনার সাদৃশ্য আছে!" তখন বুঝলাম, ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে আমাদেরও যেমন দৃষ্টিবিভ্রম আছে, অর্থাৎ সকল ইউরোপীয়কেই প্রায় এক-রকম দেখি; ইউরোপীয়দেরও তেমনি দৃষ্টিবিভ্রম আছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে। কাজেই তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যুক্তিযুক্ত মনে না করে চুপ হয়ে গেলাম।

ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল দেখবার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। লণ্ডনে পৌঁছাবার দিন কয়েক পরে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র আমার কাছে আসে এবং চিগওয়েলে তাদের

বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা করতে ও তার পরের দিন তাদের সঙ্গে ভ্রমণে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সানন্দে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। কারণ এতে ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার ও ভারতীয় ছাত্রদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হবে। কেনিয়াবাসী একজন আফ্রিকান নেতাকে নিমন্ত্রণ করে ভারতীয় ছাত্ররা ভালই করেছিল। আফ্রিকার প্রাণের কথা তিনি খুব সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করলেন। তাঁর ইংরেজী নির্ভুল না হতে পারে, কিন্তু একজন কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ছাপ ছিল তাঁর বক্তৃতায়। অনগ্রসরতার দোহাই দিয়ে যদি এ রকম লোককে অধীন করে রাখা হয়, তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে, বর্তমান সভ্যতা মুখোসধারী বর্বরতা মাত্র। এমন কি অনগ্রসর হলেও একজাতির অন্যজাতিকে পদানত রাখার কোন ন্যায্য অধিকার নেই। কেনিয়া নেতার বক্তৃতা শুনতে শুনতে কেবলই মনে হতে লাগল যে, যতশীঘ্র ব্রিটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি উপলব্ধি করে যে, আফ্রিকা, এশিয়া ও পৃথিবীর অন্য স্থানের উপনিবেশ ত্যাগ করাই তাদের ও জগতের পক্ষে কল্যাণকর, ততই ভাল। আজ যখন এসব কথা লিখছি, তখন হিংসাত্মক কার্য দমনের নামে কেনিয়ায় সিংহ-বিক্রমে হিংসার তান্ডব চলছে! বর্তমান সভ্যতার চরম কলঙ্কস্বরূপ এ নিষ্ঠুরতা।

হিংসা সম্বন্ধে উল্লেখ করে আমার বক্তৃতায় বলি,—"হিংসা হিংসারই সৃষ্টি করে। কাউকে পদানত রাখা অথবা অর্থনৈতিক শোষণ হিংসার নামান্তর মাত্র। যতদিন পর্যন্ত এসব চলতে থাকবে ততদিন সমাজ হতে হিংসা দূর করা সম্ভব নয়। সুতরাং যারা অহিংসার পূজারী এবং বলপ্রয়োগের বিরোধী, তাদের দেখতে হবে যেন সর্বপ্রকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটে। নতুবা অহিংসা অহিংসা করে চীৎকার দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারকে বজায় রাখার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।" আমার বক্তৃতা ছিল ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে। আমি পরিষ্কার করেই বলি যে, ভারতবর্ষ বিদেশী সাহায্য (আর্থিক বা অন্যপ্রকারের) না নিয়েই নিজের চেষ্টাতেই খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারে। ভারতীয় সমস্যার সমাধান হতেই পারে না যতদিন পর্যন্ত না বর্তমানের অন্তরাত্মাপেষণকারী অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিশ্রমের ফলভোগ করতে পারে।

পরদিন ভ্রমণে যাওয়ার সময় ষাটজন ভারতীয় ছাত্র ছিল। আমরা চেমস্‌ফোর্ড, এপিংফরেস্ট ও কনটওয়াটার্স‌এ যাই। এ ভ্রমণের সময় বাঙালী পোশাকে ছিলাম। পোশাক বা গায়ের রংয়ের জন্য গ্রামাঞ্চলেও কেউ আমাকে অসৌজন্য দেখায় নি। শুধু গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য উপভোগ করিনি, ভারতীয় তরুণ ছাত্রদের সাহচর্য উপভোগ করেছি সমান ভাবেই। ছাত্ররা যথাসাধ্য আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে-ছিল। ঠিক এমনিভাবে তিনজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে এডিনবরা হতে ফার্থ অব ফোর্থ, লিনলিথগো, বেরউইক ও ডানবার ভ্রমণ বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

কেউ কেউ আমাকে বলেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডে বর্ণবিদ্বেষ আছে এবং আমি যদি ভারতীয় পোশাকে গ্রামাঞ্চলে যাই তাহলে সব সময় সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার না

পেতেও পারি। এসব শুনে আমার মনে এ বিশ্বাস হয়েছিল যে ভারতীয় পোশাক যদি গ্রামাঞ্চলের কোন অজানা ইংরেজকে "গুডমর্ণিং" বলি, তা হলে তার প্রত্যুত্তর পাব না। সুতরাং চিগওয়েলে ভোর ৬টা সাড়ে ৬টায় যখন প্রাতঃভ্রমণে যাই তখন পাছে অপমানিত হই, এ ভয়ে কোন অজানা ইংরেজকেই "গুডমর্ণিং" না বলা ঠিক করে নিলাম। কিন্তু ভুলই করেছিলাম। আমার ভ্রান্তি দূর হতে বেশী দেরী হল না। পর পর দু'জন অজানা ইংরেজ আমাকে লজ্জা দিলেন। সামনে যাওয়া মাত্রই আমাকে "গুডমর্ণিং" বলে সম্বোধন করলেন। এর পর থেকে অবশ্য প্রথম আমিই "গুডমর্ণিং" বলেছি এবং প্রত্যুত্তরও পেয়েছি সব সময়। অন্যদের অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, আমি ব্রিটেনের কোথাও বর্ণবিদ্বেষের পরিচয় পাই নি।

লণ্ডনে থাকাকালীন কুমারী আগাথা হ্যারিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনার অবসর পেয়েছি। ইনি একজন নামকরা কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধু। আন্তর্জাতিক ও সাম্প্রদায়িক শান্তি ও মৈত্রীর কাজে ছিল তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। ভারতবর্ষেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ জানাশোনা ছিল। ব্রিটেনে পেঁাছবার চার দিনের মধ্যেই আমাকে লাঞ্চে (মধ্যাহ্ন ভোজনে) নিমন্ত্রণ করেন। লাঞ্চে তাঁর কয়েকজন কোয়েকার বন্ধু (স্ত্রী-পুরুষ)ও ছিলেন। খেতে খেতে শ্রীমতী হ্যারিসন জিজ্ঞেস করেন,—"কত বৎসর আপনি ব্রিটিশের কারাগারে ছিলেন।" "প্রায় সাত বৎসর"—জবাব দিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন,— "ব্রিটিশের প্রতি আপনার কোন ঘৃণা আছে কি?" "মোটেই না"—আমি বললাম। তখন তিনি বলেন,—"কি ভাবে তা হয় একটু বুঝিয়ে বলুন।" আমি বলি "ইংরেজ চরিত্রের দুটো দিক আছে। নিজের দেশে স্বাধীনতার মর্যাদা তারা যথেষ্ট দেয়। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কসুথকে আশ্রয় দিয়েছিল। দেশ হতে পলাতক অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে বাস করার সময় কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "মূলধন" (Das Capital) লিখেন। কিন্তু সেই ইংরেজরা আবার অন্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এমন কি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ জানেও না তাদের শাসনকর্তারা কি রকম অত্যাচার চালায় ঐ সব উপনিবেশে। স্বাধীনতাপ্রেমী ইংল্যাণ্ডকেই আমি ভালবাসি কিন্তু যে ইংল্যাণ্ড কোন না কোন ভাবে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব চায় আমি তার বিরোধী। ইংরেজ চরিত্রের এই শেষোক্ত দিকের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের সংগ্রাম।" সুখী হলাম দেখে যে উপস্থিত সকলেই আমার মন্তব্য যথোচিতভাবে গ্রহণ করেছেন।

লণ্ডনে "রয়্যাল মিণ্ট" দেখার সময় দুটি জিনিস আমি শিখি। আগে জানতাম না যে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন বিশ বৎসরেরও উপর 'মিণ্ট মাষ্টার' (টাঁকশালের অধ্যক্ষ) ছিলেন। তাঁর লেখা চিঠিপত্র ও নির্দেশনামা ইত্যাদি বাঁধানো অবস্থায় অতি যত্নে রাখা হয়েছে! ডেপুটি মিণ্ট মাষ্টার মিঃ লিওনেল টম্পসনের সৌজন্যে সে সমস্ত দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

নিউটনের হাতের লেখা ভারী সুন্দর ছিল। ব্রিটিশ নিয়মতন্ত্রানুযায়ী আজকাল অর্থমন্ত্রী (চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার) হলেন "মিণ্ট মাষ্টার"। ডেপুটি মিণ্ট মাষ্টারই প্রধান কর্মকর্তা। মিঃ টম্পসনের সাথে কথা বলে সত্যিই আনন্দ আছে।

এই টাঁকশালেই মিঃ টম্পসন আমাকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি কয়েক নিযুত শিলিং মুদ্রা তৈরী করে দিয়েছেন তথাপি লোকজন গ্যাস পাওয়ার জন্য ম্যাসিনের গর্তের ভিতরে ফেলবার শিলিং মুদ্রার অভাব অনুভব করছে। তাঁর মতে কারো কারো শিলিং মুদ্রা মজুদ করে রাখাই এর কারণ। ব্রিটেনে অসামাজিক কার্যের কথা শুনেছি কিন্তু এখানে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মতামত জানতে পারলাম।

লণ্ডন টাঁকশালে মোট কর্মীসংখ্যা ৭২৫ এবং সপ্তাহে ১০ লক্ষ হতে এক কোটি মুদ্রা তৈরী হয়। ব্রহ্মদেশ ও আরো কয়েকটি দেশের মুদ্রাও এখানে তৈরী হচ্ছে দেখলাম। ইলেকট্রিক গ্যাস ও তেলের চুল্লী রয়েছে। একপ্রকারের চুলার কাজ কোন কারণে বন্ধ হলে যাতে কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

শ্রমিক-মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী মিঃ গেইটস্কেল ব্রিটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান স্যার রোনাল্ড য়্যাডাম-এর সঙ্গে আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করার জন্য পুনরায় বন্ধুবর শ্রী খেরকে ধন্যবাদ জানাই। দুজনেই মধুর প্রকৃতির লোক। মিঃ গেইটস্কেলের সঙ্গে রাজনীতিও আলোচনা করি। মিঃ এটলীর একটা বিবৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁকে বলি মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা অথবা পরাধীনতা এ দুই অপ্রীতিকর জিনিসের মধ্যে বেছে নেওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কংগ্রেসকে। কংগ্রেস অবশ্য দেশ ভাগ করে স্বাধীনতাকেই বেছে নিয়েছিল। ভারতবর্ষকে ভাগ করার ব্যাপারে শ্রমিক সরকারের কোন দায়িত্ব ছিল না—একথা বলা অন্যায় হবে। অবশ্য এখন আর অতীতকে খুঁড়ে বের করায় কোন লাভ নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করে খুশী হলাম যে, মিঃ গেইটস্কেল অন্যের মতকে সমাদর করতে জানেন। তাঁকে অকপট ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক বলেই মনে হল।

ব্রিটেনে আমেরিকানদের সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব রয়েছে। তাদের "ইয়াংকি" বলা হয় এবং "হঠাৎ বড়" মনে করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন জগতে তার আগের স্থান হারিয়ে ফেলেছে এবং আমেরিকা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এ কারণে একটা ঈর্ষার ভাব রয়েছে ইংরেজদের। তাদের ভেতরে একটা দীনভাবের আভাসও পেলাম।

লণ্ডনে একজন খ্যাতিমান আমেরিকান বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আহারেব সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি ডাঃ র্যালফ ভাইকফ। সাক্ষাতের আগে একজন শুভার্থী বন্ধু লিখেছিলেন,—"মনে রাখবেন বিজ্ঞানীরা বেশ পাগলাটে, সাবধানে কথা বলবেন এ'র সঙ্গে।" বন্ধুটি সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছিলেন যে, এক সময় আমিও বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। সাক্ষাতের পর বন্ধুকে জানাই যে, দুই পাগলাটে লোক

বেশ হৃদ্যতাপূর্ণভাবেই আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিল। ডাঃ ভাইকফ ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই অত্যন্ত সরল ও অমায়িক। আমেরিকায় কি ধরণের লোকের সঙ্গে দেখা-শোনা হবে তার একটা পূর্বাভাস পেলাম। ব্রিটেন থেকেই আমি আমেরিকায় যাচ্ছিলাম। এ অধ্যায় শেষ করার পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারি না। তার মধুর স্মৃতি এখনো সানন্দে হৃদয়ে পোষণ করি। রথামষ্টেডে ডাঃ ওয়াটসন ও শ্রীমতী ডাঃ ওয়াটসন লাঞ্চে নিয়ে যান। এ'রা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিজ্ঞানী, উপরোক্ত ইনষ্টিটিউটে কাজ করেন। খাওয়ার সময় কথাপ্রসঙ্গে বলি যে, ইংল্যাণ্ডের হোটেলের খাদ্যে "ভিটামিন সি"র অভাব। আমার অসুবিধার কথা ভেবে এমন কি কাজের খুব চাপ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমতী ওয়াটসন বাজারে গিয়ে কয়েকটি মোসম্বী নিয়ে এলেন এবং আমাকে তা উপহারস্বরূপ দেন। মেয়েরা সর্বত্রই এক, সে বাংলা বা মহারাষ্ট্রের কোন গ্রামেই হোক অথবা সুদূর ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলেই হোক। সত্যি কথা বলতে কি, ব্রিটেনের লোকজনের কাছ থেকে এত সৌজন্য, স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছি যে, বিদেশে ছিলাম—একথা অনুভবই করতে পারিনি। সুবন্দোবস্ত এবং কয়েকজন কর্মীর বন্ধুত্বপূর্ণ ও দরদী ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ধন্যবাদ দেই। ব্রিটেন-প্রবাসী ভারতীয়রাও প্রচুর স্নেহ ভালবাসায় অভিষিক্ত করেছিলেন আমাকে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম না করে পারছি না। তিনি হলেন লণ্ডনে 'আনন্দবাজার' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার প্রতিনিধি ডাঃ তারাপদ বসু। তাঁর সরলতা, বুদ্ধিমত্তা, নিজের দৃঢ় বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকার সৎসাহস, সর্বোপরি তাঁর প্রীতিপূর্ণ অন্তর তাঁকে আমার প্রিয়জনে পরিণত করেছে। এখন তাঁকে আমি নিজের ছোট ভাই বলেই মনে করি।

৫ই মে, ১৯৫৩ আমি ব্রিটেন ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

ব্রিটেন থেকে হল্যান্ড-আমেরিকা লাইনের এস, এস, ভিন্ডাম জাহাজে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হই। জাহাজে আমিই একমাত্র ভারতীয় যাত্রী ছিলাম। ক্যানাডা-গামী যথেষ্ট সংখ্যক ওলন্দাজ যাত্রী ছিলেন। দেশ ছেড়ে এ'রা ক্যানাডায় বসবাসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এ'দের অধিকাংশই ডাচ ভিন্ন অন্য কোন ভাষা বলতে পারতেন না। সামান্য কয়েকজন মাত্র ইংরেজী জানতেন। জার্মান ও ইংরেজী ভাষার মাঝামাঝি এই ডাচ ভাষা। অবশ্য জার্মান ভাষার সঙ্গেই মিল বেশী। জার্মান ভাষা সম্বন্ধে আমার অল্প জ্ঞানও কাজে লেগেছিল। জাহাজের কর্মচারীরা ইংরেজী বলতে পারতেন এবং তাঁদের ব্যবহার ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। না চাইতেও প্রতিদিন তাঁরা আমার জন্য ভাত রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন। সকল প্রকারের খাদ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হত। ব্রিটেনের খাদ্যের চেয়ে সে সব সুস্বাদুও ছিল অনেক। ব্রিটেনে থাকাকালীন ওলন্দাজদের খাওয়া সম্বন্ধে রসাল গল্প শুনেছি, কিন্তু না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, মানুষ এত খেতে পারে।

ক্যানাডা বসবাসেচ্ছু যাত্রীদের মনে ছিল ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন। তাঁদের মুখে ছিল আনন্দের দীপ্তি। ইউরোপীয়দের বাসের জন্য পশ্চিম গোলার্ধ এবং পৃথিবীর আরও অনেক জায়গা আছে। কিন্তু আমাদের জন্য সে রকম কোন স্থানই নেই। সকল দুয়ারই আমাদের জন্য বন্ধ, আর জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপদেশ শুনতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা! ১৭০০ সালে ব্রিটেনের লোকসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে এখানকার বহুলোক বসতি স্থাপন করা সত্ত্বেও আজ ব্রিটেনের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি। যুক্তরাষ্ট্রের জন-সংখ্যা ১৬ কোটি। এর অধিকাংশই ইউরোপ-আগতদের বংশধর বা ইউরোপ হতে নবাগত। নিগ্রো ও রেড ইন্ডিয়ানরা মাত্র শতকরা দশজন। এশিয়ার খুব কম সংখ্যক অধিবাসীই সেখানে বসবাসের অনুমতি পায়।

ওলন্দাজরা বেশ স্ফূর্তিবাজ। কিন্তু একটি একুশ বৎসর বয়স্ক যুবককে অসাধারণ আমোদপ্রিয় মনে হল। পরিবারের অন্য কেউ তার সঙ্গে ছিল না। তার ক্যানাডা যাওয়ার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করতে সে তার "বিবাহ-অঙ্গীকার"-এর আংটিটি দেখাল এবং বলল, সেখানে যাচ্ছে উপার্জন করে টাকা জমাতে। এক বছর পরে ফিরে এসে সে বিয়ে করবে। হ্যালিফ্যাক্সে নেমে গেল সে এবং স্ফূর্তিতে গান সুরু করে দিলে।

শিশুরা আমার বড় প্রিয়, তারাও আমাকে পছন্দ করে। জাহাজে দশ দিন থাকাকালীনও তা ঘটল। প্রায় পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি ছোট ছেলে আমার এত অনুরক্ত

হয়ে পড়ল যে, যখনই তার মা তাকে কিছু মিষ্টি খেতে দিতেন, সে তার খানিকটা অংশ আমাকে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেত, যেন তাকে ফিরিয়ে দিতে না পারি। তার ছোট্ট বোনটিও আমার অনুরক্ত হয়ে পড়ল। তার মা-বাবা শিশু দুটির সাথে আমার একটি ফটো নিলেন এবং ক্যানাডা হতে তার এক কপি আমাকে পাঠিয়ে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। শিশু দুটি ভারতীয় ও ওলন্দাজের মধ্যে কি প্রভেদ তথা ইউরোপ ও এশিয়াবাসীর মধ্যে পার্থক্যই বা কি, তা জানত না। মানুষের স্বাভাবিক অন্তরের প্রেরণাই ছিল তাদের কাজের উৎস। আমার কাছে তারই মূল্য বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে আমার অবস্থান খুব কম সময়ই হয়েছিল—মাত্র ৫ সপ্তাহ। প্রকাণ্ড এ দেশ, তাই তার কিছু অংশমাত্র দেখতে পেরেছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল-ভাগ দেখতে পারিনি বলে দুঃখিত। বন্ধু স্বামী নিখিলানন্দ আমার আমেরিকার কার্যক্রম স্থির করেছিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আরও তিন মাস ওখানে থেকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে দেশকে দেখি। কিন্তু তা সম্ভবপর না হলেও স্বামীজীর সুব্যবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই দেখতে পেরেছিলাম। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে থাকবার সুবিধাও করে দিয়েছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত আমেরিকাবাসীদের কাছে সেটিই হল আমার যথেষ্ট পরিচিতি। আর একটা সুযোগও হল। পৌঁছানর পরের দিনই সেণ্টারের বিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান হয় এক নামজাদা হোটেলে। সান্ধ্য ভোজনের পর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা হল। বক্তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। প্রায় দেড়শত বিশিষ্ট আমেরিকান ও ভারতীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন আমাদের পুরাতন বন্ধু ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারী লাল মেহতা। বক্তৃতায় তিনি বললেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মহাত্মাজীর অগ্রগামী ছিলেন। একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই মত আমি বহু বৎসর ধরে মনে পোষণ করে আসছি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে প্রথম ছাপার অক্ষরে এই মত এক জার্মান পণ্ডিতের "ইণ্ডিয়েন" নামক পুস্তকে দেখি। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের অনেকেই এ মত পোষণ করেন না। শ্রীমেহতার বক্তৃতায় আমার সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক উক্তি ছিল। স্বামীজীও আমার বক্তৃতা দিতে উঠার পূর্বে একইরূপ প্রশংসাসূচকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। এ সমস্ত উক্তির জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলাম বটে কিন্তু সে সঙ্গে দায়িত্ব আমার বেড়ে গেল। এ দায়িত্ব অনেক বড় এবং কোনক্রমেই সহজসাধ্য নয়। কাজটি হল সর্বকালের সর্বশ্রেণীর একজন শ্রেষ্ঠ মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীকে আমেরিকাবাসীর কাছে ব্যাখ্যা করা। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তাঁর। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি যে, তাঁর প্রেমের ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী আজ পশ্চিমসহ সকল দেশের কানে পৌঁছে দেওয়া দরকার। কিন্তু এমন ভাবে বলতে হবে, যাতে তাদের প্রাণ স্পর্শ করে, কোন আঘাত যেন প্রাণে না লাগে। সেই জন্য প্রত্যেকটি

শব্দ ওজন করে বলছিলাম। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, সে সময়ে আমার বুদ্ধি নয়, হৃদয়ই কথা বলছিল। পরিশেষে আমি বলি যে, নানা দিক দিয়ে আমেরিকা একটি মহান দেশ কিন্তু যদি সে সমগ্র মানব জাতিকে এক বলে গণ্য করে এবং সমস্ত মানব জাতির সাধারণ কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে তা হলে সে অধিকতর মহান হতে পারবে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী।

বক্তৃতার পর অনেক আমেরিকাবাসী ও কিছু ভারতীয়ের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করি। এ কৃতিত্ব অবশ্য আমার নয়। যিনি আমার প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবের আস্বাদ দিয়েছিলেন কৃতিত্ব সেই মহাপুরুষের। তাঁর প্রেরণা যেন আমার জীবনে কখনো নিস্তেজ না হয়—এই প্রার্থনা।

অনুষ্ঠানে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের গান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সেণ্টারের সভাপতি মিঃ এডউইন টি গুড্রিজ সভাপতিত্ব করেন। কয়েকজন আমেরিকান বক্তাও ছিলেন। তাঁদের বক্তৃতা শুনে বেশ বুঝতে পারলাম যে, বুদ্ধিমান আমেরিকা-বাসীদের মধ্যেও ধর্মবিষয়ে উদার ও মহান ভাবসম্পন্ন লোক রয়েছেন। অনুষ্ঠানটি বেশ সফল হয়েছে বলে মনে হল। আমার বন্ধু স্বামী নিখিলানন্দের প্রভাবও উপলব্ধি করলাম।

এই দিন সকালবেলা সেণ্টারের ঘরের জানলা দিয়ে যা দেখলাম তা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। ১৬ই মে, দিনটি "সৈন্য দিবস" হিসাবে প্রতিপালিত হয়। সে উপলক্ষে কুচকাওয়াজ হল। সৈন্যেরা যখন 'মার্চ' করার পূর্বে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একটি ছয় কি সাত বৎসরের ছেলে কাছের এক বাড়ী থেকে একটা ছোট খেলনা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এল এবং সৈন্যদের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, যেন সে তাদেরই একজন। সৈন্যদের সম্বন্ধে বালকটির বিন্দুমাত্র ভয়ও ছিল না। সৈন্যেরাও তাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনপ্রকারে উত্যক্ত করার জন্য কিছু করে নি। কুচকাওয়াজে নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জন-সাধারণ ও সৈন্যদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দেখে খুশী না হয়ে পারলাম না।

পরের দিন পূর্বাহ্নে রামকৃষ্ণ মন্দিরের পুনরুৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠান হল সেণ্টারে। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিকতাই কম্যু-নিজমের জন্মদাতা। শ্রী জি, এল, মেহতা "ভারত ও আমেরিকা" সম্বন্ধে বলেন। নানা তথ্য সমন্বিত সুন্দর ভাষণ দেন।

অপরাহ্নে স্বামীজী, শ্রীমতী এলিজাবেথ ডেভিডসন, কাউণ্টেস ম্যাবেল কলোরেডো ও আমি একটি মোটরে করে অনেক দূরের যাত্রায় রওনা হই। গন্তব্যস্থল ছিল ক্যানাডা সীমান্তে সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে "থাইল্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক"। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান-ধারণা করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্যা-বলীর পরিকল্পনা করেন। হাডসন নদীর তীর ধরে আমরা অগ্রসর হলাম এবং এর ধারে লম্বভাবে পাথর গঠনের কাজ প্রথম দেখি। এমনটি পৃথিবীর আর কোথাও

দেখি নি। সযত্নে রক্ষিত হয়েছে এ সব। নিউইয়র্ক হতে প্রায় একশ মাইল দূরে *"ষ্টোনি রিজ" নামক স্থানে "রিজলী ম্যান"র নামক বাড়ীতে রাত্রি কাটাই।* শ্রীমতী লেগেট আমাদের স্বাগত জানালেন। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক দিন এই পরিবারে বাস করেছিলেন। সমস্ত পরিবারটিই তাঁর স্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত। শ্রীমতী লেগেটের পিতামাতার বিবাহের সাক্ষী ছিলেন স্বামীজী। শ্রীমতী লেগেট যখন জন্মগ্রহণ করেন স্বামীজী লিখেছিলেন যে, গোপাল (ভগবান) এ মূর্তি গ্রহণ করেছেন।

সান্ধ্য ভোজনের পর শ্রীমতী লেগেট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি লুই ফিশারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই কিনা।

"খুব আনন্দের সঙ্গে"—আমি বলি।

"কিন্তু একটা অসুবিধা আছে"—তিনি বললেন। "মিঃ ফিশার কুকুরকে ভয় করেন। আর আমার বাড়ীতে একটি কুকুর আছে। কাজেই তিনি যে বাড়ীতে আছেন আমাদের সেখানে যেতে হবে।" কথাটা শুনে আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। মিঃ ফিশারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ীতেই গেলাম।

ভারতে এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে, মিঃ ফিশার যখন শেষবার ভারতবর্ষে তখন তিনি ভারতের প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মনে এ ধারণা জন্মেছিল যে, ভারত আমেরিকার সদিচ্ছার উপযুক্ত সমাদর করছে না। এ কথা সত্য কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি একটু অপ্রস্তুত হলেন এবং বললেন, "না না ও কিছু নয়।" তারপর আলোচনার মোড় ঘুরে যায়। মহাত্মাজী ও রাজনীতি নিয়ে কথা সুরু হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ, বি, সি, গ্রুপ সমন্বিত "ক্যাবিনেট মিশন" পরিকল্পনা ও ভারত বিভাগ এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিক কাম্য মনে করেন।" আমি বলি যে, "ক্যাবিনেট মিশন" পরিকল্পনাই আমার অধিক মনঃপূত ছিল কিন্তু এখন সে কথা বলে আর কোন লাভ নেই। সে এখন কেতাবী আলোচনার সামিল। এক ঘন্টারও বেশী আমাদের প্রীতিপ্রদ আলোচনা হয়েছিল। শ্রীমতী ফিশারও উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন প্রাতরাশের পর শ্রীমতী লেগেটের নিকট হতে বিদায় নিয়ে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা করি. কর্ণেল (ইথাকা) শহর সেখান হতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে। পথের দৃশ্য মনোরম। পাহাড়, দেলওয়ারে নদী ও আপেল্ গাছের সারি আমাদের যাত্রা মধুর করে তুলেছিল। বিখ্যাত অশোকান বাঁধ দেখি। এখান হতে নিউইয়র্কের পানীয় জল সরবরাহ হয়। যদিও শহর হাডসন নদীর তীরে তবু এই নদী হতে শহরের জল সরবরাহ হয় না। অপরাহ্ন ৪টায় কর্ণেল পৌঁছি। কর্ণেল যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়—অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মত আবাসিক। কিন্তু তাদের চেয়ে অধিক রমণীয়। প্রায় আট হাজার ছাত্র আছে এখানে। বার্ষিক ব্যয় ১৬·১৭ নিযুত ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আট কোটি টাকা)।

স্বামীজী ও আমি 'টেল্যুরাইড হাউসে' অতিথি হিসাবে ছিলাম। এই হাউস ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত ছাত্রদের হোষ্টেল। ট্রাষ্টই সমস্ত খরচ বহন করে। ছাত্ররা খুবই ভদ্র ছিল এবং সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছে। এই হোষ্টেলের খাবার ঘরে স্ব-পরিবেশন ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ছাত্ররা সব সময়ই আমাদের খাবার এনে দিত। প্রথম খাবার ঘরে গিয়ে যখন একজন ছাত্রকে বলি,—"আমি গরু বা শূকরের মাংস খাই না," তখন সে বলে—"তাহলে আপনি বাছুরের মাংস খেতে পারেন।" স্বামীজী তখন তাকে বুঝিয়ে দেন যে গরু বা শূকর—এই দুই প্রাণীর কোন কিছুই চলবে না। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রের ভারত সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতা দেখব বলে ভাবিনি। গ্লাসগোর হোটেলে আমি গরু বা শূকরের মাংস খাই না বলায় পরিচারিকা বলেছিল, "তাহলে বাছুরের যকৃৎ খেতে পারেন।" তার কথা শুনে বিস্মিত হইনি, কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলাম কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটির কথায়।

কর্ণেলে আমরা মাত্র দেড়দিন ছিলাম। এত কম সময়ের মধ্যে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় ভালভাবে দেখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু অধ্যাপক ডাঃ বার্টকে ধন্যবাদ। এমন সুন্দর ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন যে, আমাদের প্রতিটি মিনিটের সদ্ব্যবহার হয়েছে। পৌঁছবার ঠিক পরেই আমাকে ডেইরী বিভাগের অধ্যাপকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

ভারতবর্ষের গরুর উন্নতির নানা দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। রাত্রিবেলা ডাঃ বার্ট আবার তাঁর বাড়ীতে সস্ত্রীক কয়েকজন অধ্যাপককে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করেন ঘরোয়া আলোচনার সুবিধার জন্য। সাধারণ কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য ডাঃ বার্ট আমাকে অনুরোধ করেন। আমি আনন্দের সঙ্গেই তাতে রাজী হই। আমি যা বলেছিলাম তার সার মর্ম হল এই—"মহাত্মা গান্ধী যা কিছু করেছেন বা বলেছেন তার ভিত্তি হল সত্য ও অহিংসা। হিংসা এবং সত্য কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই সত্যের বিনাশ হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক শোষণ হিংসার নামান্তর মাত্র। তাই তিনি সারাজীবন সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তাদের প্রতিও তাঁর কোন ঘৃণার ভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি, বস্তুতঃ ভগবৎভক্ত। রাজনীতিকে অধ্যাত্মময় করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই জন্যই তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামেরও ভিত্তি ছিল আত্মিক শক্তি। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই তাঁর মৌলিক দান। তিনি ভারতবর্ষের অন্তরাত্মাকে জেনেছিলেন এবং তাই হয়েছিলেন দেশের সত্যিকারের নেতা বা পথ প্রদর্শক।"

কর্ণেলে থাকাকালীন অধ্যাপক ফিন্‌চারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। তিনি গরুর বাঁট ও ওলানের ব্যাধি "ম্যাসটাইটিস্" নিয়ে গবেষণা করছেন এবং এই

রোগকে আয়ত্তে রাখার জন্য হাতে-কলমে কাজ করার প্রোগ্রাম নিয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হল অতি উপযুক্ত শিক্ষক এবং কর্মকুশল। আমাকে যথাসম্ভব সমস্ত গবেষণা ব্যাখ্যা করে এবং তিনি যা করেছেন সে সমস্ত দেখিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ের সমস্ত কাগজপত্রও তিনি আমায় দিয়েছিলেন। রোগ-নিরোধক এবং রোগ-বিমুক্ত করার দুই পদ্ধতিই তিনি গ্রহণ করেছেন। গ্রহণযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,—(১) উপযুক্ত পরিমাণে খড় বিছিয়ে গরুর শোবার ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয়। তাতে গরুর বাঁট এবং ওলান কোনরকম ক্ষতি এবং বীজাণু সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। (২) প্রায়ই গোয়ালের মেঝে পরিষ্কার করা এবং শোধন করা দরকার। (৩) প্রত্যেক গরুর জন্য পরিষ্কার তোয়ালে পরিশোধক গরম জলে ধুয়ে ব্যবহার করা দরকার। (৪) দুধ দোয়াবার পর পরিশোধনকারী ওষুধ ও জল দিয়ে গরুর বাঁট ধুয়ে রাখা উচিত। (৫) দুধ দোয়াবার যন্ত্রকে খুব সতর্কতার সহিত পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দুধ দোয়াবার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং যারা এ কাজ করবে তাদের প্রথমে শোধনকারী ওষুধ দিয়ে উষ্ণ জলে হাত ধুয়ে ফেলা দরকার। তারপরে শুরুতেই বীজাণুর সংক্রমণ আবিষ্কার করার জন্য দুধ পরীক্ষা করা দরকার। রোগাক্রান্ত হবার পর 'এ্যাণ্টি-বাইওটিক্স'-এর ইনজেকশান এই রোগ উপশম করার পথে খুব ফলপ্রদ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি অবশ্য রোগ যাতে না হয় তারই জন্য ব্যবস্থা করার উপর জোর দিলেন বেশী। ভারতবর্ষের গ্রামে "এ্যাণ্টি-বাইওটিক্স" পাওয়া দুষ্কর এবং দুর্মূল্যও বটে। সুতরাং রোগ নিরোধ করার উপরই জোর দেওয়া একান্ত দরকার।

আমাকে প্রাণরসায়নাগার ঘুরে দেখান অধ্যাপক মেনার্ড। তিনিই আমাকে জগদ্বিখ্যাত প্রাণরসায়নবিদ অধ্যাপক সুমনারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শেষোক্ত অধ্যাপক "খামির"(Enzyme)-কে প্রথম দানাদার অবস্থায় পৃথক করেন। তাঁর সারল্য এবং ব্যবহার আমাকে মনে করিয়ে দিল আমার গ্রামের স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতের কথা।

এ বিজ্ঞানাগারের মনুষ্যপুষ্টি বিভাগেও মানুষের খাদ্যে জান্তব প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করি। আমাকে তখনও বলা হয় যে, জান্তব প্রোটিনের কথাই বড় নয়। অত্যাবশ্যক য়্যামিনো-য়্যাসিডসমূহই আসল কথা। কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনেও অত্যাবশ্যক সব য়্যামিনো-য়্যাসিড আছে, অবশ্য প্রধানতঃ জান্তব প্রোটিনেই এ সব বর্তমান।

পশুপালন বিভাগের অধ্যাপক টার্ক আমাকে বলেন যে, নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে গাভী পিছু গড়ে বার্ষিক দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৯ সালে ছিল ৫৪৬৫ পাউণ্ড। ১৯৫২ সালে তার পরিমাণ হয়েছে ৬৮৪০ পাউণ্ড এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩৭৯ ও ৫৩২৮ পাউণ্ড। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ তিনি

বললেন,—"উপযুক্ত খাদ্য ও প্রজনন, অধিক যত্ন ও রোগ নিরোধ প্রচেষ্টা।" মুরগী পিছু ডিম উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯১৫ সালে তার সংখ্যা ছিল বার্ষিক ৯০ আর ১৯৫০ সালে হয়েছে ১৬০।

২০শে, সকালবেলা কর্ণেল ছেড়ে আসার আগে আমি বাগান-কৃষিবিভাগের অধ্যাপক ম্যাকডোনিয়ালের কাছে যাই। কিছুকাল লেবাননে তিনি গ্রাম উন্নয়নের কাজ করেছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা তিনি আমায় বলেন। তাঁর মতে, স্থানীয় লোক পূর্ণ উদ্যমে কাজে আত্মনিয়োগ না করলে কোন বহিরাগত সত্যিকারের উন্নতি সাধন করতে পারে না। এমন কি স্থানীয় লোকের উৎসাহ ভিন্ন ভাল কাজও নির্জীব হয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারই আসল কথা। তিনি আরও বললেন যে, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সমস্যার সমাধান একসঙ্গে করতে হবে। কাজে অগ্রসর হওয়ার এই-ই প্রকৃত পথ—আমি সে কথা বলি এবং সে প্রসঙ্গে এ প্রণালীতেই পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জিলার বলরামপুরে কয়েকজন সমাজসেবী যে কাজ করছেন, তার বর্ণনা দেই। আমার বোন কল্যাণীয়া শ্রীযমুনা ঘোষও আছে এ'দের মধ্যে। অতি ধৈর্যসহকারে তিনি বলরামপুরের কাজের কথা শুনলেন এবং কার্যপ্রণালী অনুমোদন করলেন। এ আলোচনা শেষ হওয়ার পরেই কর্ণেল ত্যাগ করি এবং ৩৫ মাইল দূরে লুডলোভিলে নামক একটি গ্রামে রওনা হই। একজন ভদ্রলোক কৃষক মিঃ র্যাঙ্কিনের বাড়ীতে আমরা অতিথি হই। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। আমেরিকার গ্রামগুলি আমাদের গ্রামের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আধুনিক সকল রকমের সুখ-সুবিধা সেখানে আছে। বৈদ্যুতিক আলো, দূরেক্ষণ (টেলিভিশন), মোটর চলার সুন্দর রাস্তা এবং এরূপ আরো আধুনিক আরামপ্রদ ব্যবস্থা আছে। মিঃ র্যাঙ্কিনের ফার্মে ১৫০ একর জমি। সে সময়ে সেখানে ৫০০ লেগহর্ণ মুরগী ছিল। দৈনিক তারা ৩৬০টি করে ডিম দিচ্ছিল! ১০টি গারণসী জাতীয় গরুও ছিল। তারা প্রত্যেকে দৈনিক ৩০ হতে ৪০ পাউন্ড দুধ দেয়। পশু ইত্যাদির দেখাশোনা এবং ফার্মের যাবতীয় কাজকর্মের তদারক করে একজন কর্মীই। দূরেক্ষণ (টেলিভিশন) এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে সাজানো থাকবার বাড়ী, ফার্মে উৎপন্ন দৈনন্দিন খাওয়ার নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যথা—গম, ওট ও যব, সব্জী, দুধ, ডিম ও মাংস ছাড়াও সপ্তাহে তিনি ৪০ ডলার অর্থাৎ ১৯০ টাকা বেতন পান। এখানকার কৃষি সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রচালিত। খুব আগ্রহ সহকারে মিঃ র্যাঙ্কিন আমাদের সব ঘুরে দেখালেন। প্রায় দু'বছর আগে তিনি স্ত্রী হারিয়েছেন। মৃত পত্নীর জন্য অন্তরে যে দুঃখ তিনি পোষণ করছেন তা গোপন রইল না। আমাদের দেশে অনেকের ধারণা,—যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক জীবনে স্নেহ ভালবাসার স্থান খুবই কম, কারণ সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা যথেষ্ট। আমার মতে এ ধারণা ভ্রান্ত। মৃত্যুর দু'বছর পরেও স্ত্রী সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে মিঃ র্যাঙ্কিনের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

অপরাহ্নে ১৭০ মাইল দূরের "থাউজেন্ড আইল্যান্ডপার্ক" রওনা হই। পথের অনেকখানিই কিয়াগো ও অন্টারিয়ো হ্রদের ধারে ছিল। প্রকৃতির শোভা সত্যিই বড় মনোরম। অন্টারিয়ো হ্রদের তীরে অবস্থিত ষ্টেট পার্ক ও বনভোজন করার জায়গা দেখবার জন্য গাড়ী থামালাম। দেখে সমস্ত মন বলে উঠল—"আহা, একটি দিন যদি এখানে থাকতে পারতাম।" থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কের বিবেকানন্দ কুটিরে গিয়ে পৌঁছালাম প্রায় সন্ধ্যা ৬৷৷টার সময়। এ কুটিরে বসেই স্বামীজী ধ্যান করেছেন, ধর্মালোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ছক এঁকেছেন। অতি পবিত্র এ স্থান। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। সান্ধ্যভোজনের পর স্বামী নিখিলানন্দ ও আমি সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে বেড়াতে গেলাম। কুটির থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এ নদী। আমি যেন পূর্ব-বাংলার নদী পদ্মার কূলে দাঁড়িয়ে আছি,—এ অনুভূতি জাগল। শীতের সময় এ নদীর জল কখনো কখনো এমন জমে যায় যে, বরফের উপর দিয়ে মোটর চলে। আবার গ্রীষ্মকালে বড় বড় ষ্টীমার চলে ঐ নদীতে।

দু' রাত ও দেড়দিন থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে কাটিয়েছিলাম। এ অবস্থিতি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। কৃষ্টিগত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় সমস্ত ভারত ইতিহাসের ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠল। জগতের উন্নতিকল্পে অতীত ও বর্তমান ভারতের অবদান কি আর আগামীকালেই বা সে কী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে,—সে কথাই ভাবছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলী, তার গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও চিন্তায় এলো। প্রশ্ন জাগল মনে,—"ভারত ও আমেরিকার এই যোগাযোগের মধ্যে ভগবানের কি কল্যাণময় হস্ত রয়েছে!" একটি বৃক্ষের নীচে বসে স্বামী বিবেকানন্দ এমন ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন যে, ঝড় এবং বজ্রপাতও তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে পারেনি। স্বামী নিখিলানন্দ আমাকে সে স্থানটি দেখালেন।

মিঃ জন মোফিটও আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দ কুটিরে ছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারে সে স্বামীজীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

শ্রীমতী স্মিথ, কাউন্টেস ও শ্রীমতী ডেভিডসন অন্য এক বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীমতী স্মিথের ছেলে জন নায়গারা ফলস্-এর "বেল হাওয়াই জাহাজ"-এর কারখানায় পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করছে। নায়গারা ফলস দেখতে গিয়ে আমি এরই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। শ্রীমতী ডেভিডসনদের আমার খাঁটি বাঙালী মায়ের মতই মনে হল। প্রাতরাশের পর তাঁরা কুটিরে আসতেন এবং আমাদের জন্য রান্না করতেন। দুপুর ও সন্ধ্যায় এক সঙ্গেই আহার করতাম। নিজেদের রাত্রিবাসের স্থানে যাবার আগে সব জিনিস তাঁরা সযত্নে গুছিয়ে রেখে যেতেন যাতে পরদিন প্রাতরাশ তৈরী করতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। আমিও একদিন খাঁটি বাঙালী খাবার—ভাত, ঝাল না দিয়ে সামান্য মশলাযোগে সব্জী ও নদীর মাছ রান্না করি। তরুণ যুবক মোফিটকে ভাল না বেসে পারা যায় না। একদিন আগে সে

এখানে আসে আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করার জন্য। মনও তার সৌন্দর্যপ্রিয়। সেপ্টেম্বর মাসে বেশীদিনের জন্য তারা এখানে এসে থাকবে। সে সময় স্থানটি যাতে ফুলে ভরে থাকে সে উদ্দেশ্যে ঐ স্বল্পকালীন অবস্থিতির মধ্যেও মোফিট জমি তৈরী করে ফুলের চারা ও বীজ লাগাল। আমরা সবাই অবশ্য তাকে একাজে সাহায্য করি। পরে জেনে খুশী হয়েছিলাম যে, সেপ্টেম্বরে চমৎকার সব ফুল হয়েছিল। যেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিবারে বাস করছি—এ রকম অনুভব করে-ছিলাম সে পরিবেশে।

২০শে তারিখ ভিন্ন রাস্তা ধরে আমরা নিউইয়র্কে ফেরবার জন্য রওনা হই। আডিরনডাকের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩০০ মাইল মোটর চালাবার পর আমরা অধ্যাপক ডাঃ বুসনেলের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। উইলিয়ামস টাউন (এখানে একটি কলেজ আছে) থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি গ্রামে তাঁর বাড়ী। পথে আসতে প্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে পড়ল. অপূর্ব তা! এর চেয়ে মনোহর দৃশ্য আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। পর্বতশ্রেণী এবং চারটি বেশ বড় সুন্দর হ্রদ (টুপার, লং, মাউণ্টেন রু ও জর্জ হ্রদ) মিলে নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের গ্রীষ্মাবাস। শ্রীমতী বুসনেল এবং অধ্যাপক দুজনেই সর্বক্ষণ আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। উভয়েই এঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সমস্ত দেশ ব্যাপকভাবে ঘুরে দেখেছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করায় আনন্দ আছে। অজন্তা গুহার অতুলনীয় চিত্র-সম্পদ ও পাহাড় কেটে তৈরী এলোরার মন্দির তাঁরা দেখেছেন। অজন্তা ও এলোরা বর্তমান হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে এলোরা তাঁদের ভাল লেগেছে বেশী। ভ্রমণকারী মাত্রেরই ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণার জন্য এ দুটি স্থান দেখা একান্ত উচিত।

ডাঃ বুসনেল কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি বেরও হয়েছিলেন।

পরদিন সকালবেলা ডাঃ বুসনেল আমাকে বিখ্যাত মাউন্ট হোপ ফার্মে নিয়ে গেলেন। গরুর উন্নতিকল্পে সেখানে নানা প্রকারের গবেষণা ও হাতে-কলমে কাজ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুধের সমস্ত গরুই চিকাগোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মাংসের জন্য ব্যবহার্য গরুই তখন সেখানে ছিল। গো-জাতির উন্নতিতে ষাঁড়ের স্থান গাভীর উচ্চে, এই ফার্মের গবেষণা নিশ্চিতরূপে তা প্রমাণ করেছে।

ফার্মে এখন বহুসংখ্যক সাদা লেগহর্ণ মুরগী আছে। তারা দৈনিক প্রায় তিন হাজার ডিম দিচ্ছে। সাধারণতঃ এক ডজন ডিমের ওজন ২৪ আউন্স থেকে ৩২ আউন্স পর্যন্ত হয়। একটি ডিমের ওজন সাড়ে তিন আউন্স হয়েছে। ওজন হিসাবে ডিম পৃথক করা হয় এবং ওজন হিসাবে দাম স্থির হয়।

ফার্মটি দেখবার পর আমরা নিউইয়র্ক যাত্রা করি। পথে হচকিচ্ স্কুলটি দেখি—যদিও খুঁটিয়ে সব দেখা সম্ভব হয়নি। ইংলিশ পাবলিক স্কুলের আদর্শে

তৈরী এটি আবাসিক স্কুল। বিরাট জায়গা জুড়ে এ স্কুল। সুন্দর গির্জা, লাইব্রেরী ও খেলার মাঠ রয়েছে। মোট ছাত্র সংখ্যা ৩৪০। প্রত্যেক ছাত্রকে বার্ষিক প্রায় দু'হাজার ডলার দিতে হয় খরচ বাবদ। সুতরাং শুধু ধনী ব্যক্তির ছেলেরাই এখানে পড়ার কথা চিন্তা করতে পারে। বিকালে নিউইয়র্ক পেঁাছি।

পরের দু'দিন নিউইয়র্কে থাকি এবং কয়েকজন বিশিষ্ট আমেরিকান ও ভারতীয়ের সাথে দেখাশোনা করি এবং কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখি। ডাঃ ডবলিউ, এইচ, কিলপ্যাট্রিক একজন নামজাদা আমেরিকান শিক্ষাবিদ। তাঁর সংগে দেখা করার জন্য যাই। ভারতে তিনি এসেছিলেন এবং সবরমতীতে মহাত্মা গান্ধীর সংগে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর বয়স বর্তমানে ৮৪, কানে একটু কম শোনেন। কিন্তু মানসিক শক্তি তাঁর এখনো অটুট আছে বলে মনে হল। শ্রীমতী কিলপ্যাট্রিক সব সময়ই (প্রায় ১ ঘণ্টা) উপস্থিত ছিলেন। কানে ভাল শুনতে পান না বলে যখনই আমার কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল শ্রীমতী তাঁকে সাহায্য করছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার পক্ষপাতী তিনি নন। অভিজ্ঞতার সংগে সংগে শিশু বেড়ে উঠুক ও জ্ঞানলাভ করুক এই মত তিনি পোষণ করেন। এর পর ভারতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার কথা উঠে। তাঁর মতে এ পদ্ধতি উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই শিশুর মনে ব্যবসা-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলে। এ যেন বয়স্ক ও পরিণতবুদ্ধি লোকের শিক্ষা। আমি সংক্ষেপে বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করি। সব কথা শুনে তিনি কিছু বললেন না। কিন্তু মনে হল আমার যুক্তি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। ভারতে ফিরে আসার পর বুনিয়াদী শিক্ষা বোর্ডের—(নঈ তালিমী সংঘের) সম্পাদক শ্রী ই, ডবলিউ আর্যনায়কমকে জিজ্ঞেস করি ডাঃ কিলপ্যাট্রিকের অভিমত তিনি জানেন কিনা। কারণ তিনি কলম্বিয়ায় আর্যনায়কমের শিক্ষক ছিলেন। ডাঃ কিলপ্যাট্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে নন—একথা তিনি জানালেন। আমাদের আলোচনা শেষ হল জ্ঞানী শিক্ষাবিদ্দের অপূর্ব উক্তি দিয়ে ঃ—"ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টির কাজ করতে হবে মুখ্যতঃ ভারতীয়দেরই, অন্যেরা গ্রহণযোগ্য ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে মাত্র।" বিদায় নেবার মুহূর্তে তিনি তাঁর দর্শকের খাতায় আমাকে স্বাক্ষর দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। খাতায় নাম লিখছিলাম, ঠিক সে সময় শ্রীমতী কিলপ্যাট্রিক মহাত্মাজীর ছোট একটি প্রতিমূর্তি এনে আমার সামনে রাখলেন।

আর একজন বিশিষ্ট আমেরিকান, তিনি বিজ্ঞানী,—ডাঃ হারমান মার্ক-এর সংগে সাক্ষাৎ করি। ইনি বুকলীন পলিটেকনিকের অধ্যাপক। বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। অতি মিষ্ট স্বভাব তাঁর এবং অমায়িক লোক তিনি। পলিটেকনিকে তাঁর নিজের বিভাগ ছাড়াও আমাকে তিনি রকফেলার ইনষ্টিটিউট দেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এজন্য তাঁকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

ডাঃ তারকনাথ দাস আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এ তাঁর মহানুভবতা।

সারা জীবন ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইনি সংগ্রাম করেছেন। আমেরিকাবাসীদের বর্তমান চিন্তাধারার বিষয়ে তাঁর অভিমত তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করলেন। আর একজন বিশিষ্ট ভারতীয় অধ্যাপক দ্বারিক ঘোষও এসেছিলেন সাক্ষাতের জন্য। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ তিনি। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ়। তিনি যদি ঐ সব দেশ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশ করেন তবে খুবই ভাল হয়। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট। সে বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান ইংগিত তিনি দিলেন। শ্রী জে, জে, সিংহ তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য ভোজনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আরও কয়েকজন ভারতীয়ও সে সংগে নিমন্ত্রিত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অনেকেই তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারী রাষ্ট্রদূত বলে মনে করতেন। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের খানিকটা আভাস দিলেন।

নিউইয়র্কের বিখ্যাত "প্লানেটোরিয়াম" বা গ্রহগণের গতি ও কক্ষ-প্রদর্শক যন্ত্র দেখতে যাই। গ্রহ, নক্ষত্রশোভিত আকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার এ চমৎকার উপায়। জার্মানীর সুবিখ্যাত দর্শনযন্ত্র নির্মাতা "ট্-সাইস্ কোম্পানী" এ যন্ত্রটি নির্মাণ করে। এরূপ সুন্দর যন্ত্র আর কোথাও দেখিনি। ইচ্ছা করলেও ভারতবর্ষে এরূপ যন্ত্রের সাহায্যে লোকশিক্ষা অসম্ভব। যন্ত্রের দারুণ মূল্যই এর কারণ। অবশ্য এর সৌন্দর্য অনুভব করা কিছু পরিমাণে ব্যাহত হল বলা চলে। কারণ প্রদর্শকের আমেরিকান উচ্চারণে অস্পষ্টতার দরুণ সব কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল।

২৬শে তারিখ প্রিন্সটন যাই। নিউইয়র্ক হতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে এ শহর। দুদিন ওখানে ছিলাম মিঃ গুডরিজের অতিথি হয়ে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টারের বার্ষিক উৎসবের দিন মিঃ ও মিসেস গুডরিজের সংগে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল।

কোলাহলবিহীন ছোট্ট এই শহরটি ছবির মত সুন্দর। এখানে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। কোন ছাত্রী এখানে ভর্তি হতে পারে না। উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার জন্য এখানে একটি প্রতিষ্ঠান (ইনষ্টিটিউট ফর এডভান্সড ষ্টাডিজ) আছে। অধ্যাপক আইনষ্টাইন ও ডাঃ ওপেনহাইমার সে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য ব্যক্তি। একজন ধনী ব্যবসায়ীর প্রভূত দানের ফলে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাঁর নাম মিঃ বামবারগার। গণিত শাস্ত্র, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা হয় এখানে। যাঁরা বেশ উঁচুদরের গবেষণা করেছেন শুধু তাঁরাই এ প্রতিষ্ঠানে স্থান পাবার আশা করতে পারেন।

এখানেই আমি সর্বপ্রথম একটি "এ্যাণ্টি বায়োটিক" কারখানা,—"হেডেন কেমিক্যাল করপোরেশন" দেখি। ম্যানেজার ডাঃ হারমান শোকোল প্রবেশ-পথে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কামরায় যাবার পর দুটো কথা তিনি আমায় বলেছিলেন, যা আমি কোন ব্যবসায়ীর কাছে শুনবো আশা করতে পারিনি। প্রথম

বললেন যে, ভারতের স্বাধীনতা তাঁর কাম্য ছিল,—সুতরাং স্বাধীন ভারতের এক নাগরিক হিসাবে আমাকে অভ্যর্থনা করতে পেরে তিনি আনন্দিত। তারপর বললেন, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা। আমি মহাত্মাজীর সংগে কাজ করেছি বলে আমাকে সব কিছু খুব আনন্দের সংগেই দেখাবেন জানালেন। ডাঃ শোকোল প্রথম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন। পরে সমস্ত জিনিসটি এক এক করে আমাকে দেখান। যে প্রশ্ন করি তার যথাযথ উত্তর দেন। প্রোকেন পেনিসিলিন, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন ও ডাই-হাইড্রোষ্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট তৈরীর সব ধাপগুলি দেখি। ক্লোরোফর্ম দ্রাবক দ্বারা ছত্রক হতে পেনিসিলিন নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু ষ্ট্রেপটোমাইসিন কোন দ্রাবকের সাহায্যে নিষ্কাশিত করা যায় না। আয়নিক প্রণালীতে রজন ব্যবহার করে একে পৃথক করা হয়।

ভারতে এক বন্ধু বলেছিলেন যে, ডাই-হাইড্রোষ্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট ব্যবহারে বধিরতা জন্মে। এর সত্যতা সম্বন্ধে ডাঃ শোকোলকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন,—"ষ্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় আর ডাই-হাইড্রো-ষ্ট্রেপটোমাইসিন সালফেট বধিরতা জন্মায়। কিন্তু খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে উপরোক্ত ঔষধ দুটির সম পরিমাণ মিশ্রণ যদি ব্যবহার করা হয় তবে কোন প্রকারের খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না।" তিনি আরো বললেন যে, এই ঔষধ যক্ষ্মারোগে অব্যর্থ নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত যত ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।

এ কারখানার সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণ সপ্তাহে ৬০ ডলার। কাজ করতে হয় মোট ৪০ ঘণ্টা। ব্রিটেনের "বারোজওয়েলকাম" ও "গ্লাকসো লিমিটেড"-এ সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণ এর সিকি হলেও এ কারখানার তৈরী জিনিসের দাম তুলনায় অনেক কম। এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে বললেন যে, অক্লান্ত গবেষণা ও ব্যবসায়ে অধিক যোগ্যতাই এর কারণ।

এখান থেকেই মিঃ গুডরিজের সংগে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের বাড়ী যাই। তাঁর মেয়ে মিস আইনষ্টাইন আমাদের তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রথম সাক্ষাতেই মনে হল একজন ঋষিতুল্য শান্ত মানুষ ইনি। অধ্যাপক এস, এন বোসের সর্বশেষ গবেষণার কথা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম শুনি। অধ্যাপক বসুর সমসাময়িক আমি কিন্তু ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক কাজ করবার জন্য বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দেই—একথা তাঁকে বলি। গান্ধীজীর নাম মুখে আনতেই তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন—"আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তিনি। কোন প্রকারের বল প্রয়োগ না করে একটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অবিশ্বাস্য ছিল; কিন্তু তিনি তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন।" তাঁর ঘরে মহাত্মাজীর একখানি আলোকচিত্র ছিল। পৃথিবীতে শান্তি আসবেই একথা তিনি বললেন। অবশ্য সুস্পষ্টভাবেই কয়েকজন যুদ্ধবাজ আমেরিকাবাসীর মনোভাবের প্রতি তিনি অশ্রদ্ধা জানালেন। এদের মস্তিষ্কে এটম-

বোমা কিলবিল করছে। বিশেষভাবে তিনি একজনের নাম করলেন এবং বললেন,—"ইনি সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবাজ।" এটম বোমা জগতে শান্তি আনতে পারে একথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না। জার্মানীতে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে জোরের সঙ্গে জবাব দিলেন—"মোটেই না। এ সমস্ত লোককে সংশোধন করা আমাদের জীবদ্দশায় হবে না।...যেভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তা কল্পনাতীত।" জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের বিরোধী তিনি এবং এ ভুল মারাত্মক হবে বলেই তাঁর ধারণা। শ্রীজওহরলাল নেহরুর বৈদেশিক নীতি তিনি সমর্থন করেন। প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে তিনি বলেন—"যে কাজ সেখানে করা হয়েছে সত্যিই তা প্রশংসনীয়, কিন্তু করার আরো অনেক আছে। অনেক ভুলচুকও তারা করেছে।"

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় অভিভাষণ করে যখন আমরা ফিরে আসব, তখন তিনিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন। না আসতে তাঁকে অনুরোধ করলাম, তবু একতলায় নামবার সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন।

নিজ মতামত সম্বন্ধে অত্যন্ত সুস্পষ্ট তিনি ও স্থিরসংকল্প। মনে হল আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে তিনি একটু উদ্বিগ্ন! এই পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের সময় অন্য কোন লোকই আমার মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করে নি।

মিঃ গুডরিজের অফিস—"হরাইজন ইনকরপোরেটেড"-এ আসা মাত্রই অধ্যাপক আইনষ্টাইনের লেখা নিগ্রো সমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আমাকে দেখান হল। সেটি বাঁধান অবস্থায় ঝুলান ছিল এক ঘরে। মিঃ গুডরিজ অনুগ্রহ করে সে প্রবন্ধের নকল আমাকে দেন এবং পরে সেটি আমার পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতিও অধ্যাপক আইনষ্টাইনের নিকট হতে নিয়ে দেন। এজন্য আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই মহান অধ্যাপককে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিই নীচে দেওয়া হল :—

"দশ বৎসরের অধিক কাল আমি আমেরিকায় আপনাদের সঙ্গে বাস করেছি। সে অধিকারে এবং আমার গভীর চিন্তা দিয়ে সাবধান বাণী হিসাবে লিখছি। অনেক পাঠক ভাবতে পারেন—ইনি পুরাপুরি আমেরিকান নন। যা শুধু আমাদের নিজস্ব ব্যাপার, তা নিয়ে কথা বলার এঁর কী অধিকার আছে! কোন নবাগতদেরই এ সব নিয়ে মাথা ঘামান উচিত নয়। আমি কিন্তু মনে করি এরূপ মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়। একটা বিশেষ পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এবং তার মধ্যে বাস করেছেন যাঁরা, অভ্যাসের বশেই অনেক জিনিসকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করেন। কাজেই পরিণতবুদ্ধি নিয়ে যিনি এদেশে এসেছেন এবং প্রখর দৃষ্টি শক্তি দিয়ে যিনি সকল প্রকারের বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পাবেন তাঁর উচিত—যা দেখছেন এবং অনুভব করেছেন তা খোলাখুলিভাবে বলা। এর দ্বারা হয়ত তিনি সমাজ সেবার সহায়ক হতে পারেন।

এখানকার জনসাধারণের ভেতরকার গণতান্ত্রিক ভাবধারা এদেশের প্রতি

নবাগতদের অনুরক্ত করে। যত অধিক প্রশংসার যোগ্যই হউক না কেন,—এদেশের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা তত চিন্তা করছি না। প্রধানতঃ চিন্তা করছি জনসাধারণের পরস্পরের সম্পর্কের কথা এবং একের প্রতি অন্যের মনোভাবের কথা। প্রত্যেকের মনেই এ নিশ্চিত ধারণা রয়েছে যে, ব্যক্তি হিসাবে তাঁর ন্যায্য মূল্য স্বীকৃত হবে। কেউ এখানে অন্য কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর কাছে মাথা নীচু করে না। এ সংস্কার জনসাধারণের এতটা মজ্জাগত যে, বিত্তবানদের অর্থনৈতিক চাপ, বিরাট ধনবৈষম্য, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অধিকতর ক্ষমতা—এ সব কিছুই তাদের সুস্থ আত্মপ্রত্যয় এবং মানুষের প্রতি যে স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। কিন্তু আমেরিকাবাসীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা কালিমাময় দিকও আছে। তাদের সমতা জ্ঞান এবং মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা মুখ্যতঃ শ্বেতকায় জাতির লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদের মধ্যেও কারো কারো সম্বন্ধে অযৌক্তিক বিরুদ্ধ-ভাব রয়েছে। একজন ইহুদী হিসাবে আমি তা অনুভব করি। কিন্তু শ্বেত-কায় লোকেরা একজন কৃষ্ণকায় সহ-নাগরিক বিশেষ করে নিগ্রোদের প্রতি যে অমানুষিক ভাব পোষণ করে ও দেখায় সে তুলনায় শ্বেতকায়দের কয়েকজনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব কিছু নয় বললেও চলে। যতই নিজেকে অধিকভাবে আমেরিকা-বাসী বলে মনে করি ততই এ অবস্থা আমাকে বেদনা, এমন কি পীড়া দেয়। এই হীন কার্যের সংগে জড়িত থাকার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারি যদি খোলা-খুলিভাবে নিজের অনুভূতি জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করি।

অনেক সৎ, সরল লোক আমাকে এ জবাব দেবেন—'এদেশে নিগ্রোদের সংগে একত্র বসবাস করে আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তারই পরিণতি নিগ্রোদের সম্বন্ধে আমাদের এমন ধারণা। বুদ্ধিমত্তা, দায়িত্ববোধ ও বিশ্বস্ততায় তারা আমাদের সমকক্ষ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি এরূপ ধারণা পোষণ করেন, তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী। ঐতিহাসিক মূল থেকে এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিচার করে দেখা যাক। আপনাদের পূর্বপুরুষেরা এই কৃষ্ণকায় লোকদের জোর করে নিজের দেশ হতে এখানে টেনে এনেছেন। শ্বেতকায়রা অর্থের অন্বেষণে ও নিজেদের জীবনের আরামের জন্য এ সমস্ত লোকদের নির্মমভাবে শোষণ করেছে ও দাবিয়ে রেখেছে। ক্রীতদাস করে তাদের অন্তরাত্মাকে অবনমিত করা হয়েছে। অবজ্ঞার চোখেই তাদের দেখা হত। এই সম্পত্তি অর্জন ও ভোগসুখের লোভের সামনে খৃষ্ট-ধর্মের মহান বাণীও নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে। নিগ্রোদের সম্বন্ধে আধুনিক অযৌক্তিক বিরুদ্ধভাবের কারণ হচ্ছে এই অনুচিত অবস্থাকে বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা এবং যে কোন অপযুক্তির সাহায্যে তাকে সমর্থন করা।

ইতিহাসের নজির দিয়ে অতি সহজে এ অবস্থা বুঝান যেতে পারে। প্রাচীন গ্রীকদের ক্রীতদাস ছিল, কিন্তু নিগ্রো নয়। তারা ছিল যুদ্ধে বন্দী শ্বেতকায়; অতএব এখানে জাতিগত পার্থক্যের কথা উঠতেই পারে না। তবুও এমন কি একজন

শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল্ ক্রীতদাসদের নিম্নস্তরের লোক আখ্যা দেন এবং তাদের দমন করা ও তাদের স্বাধীনতা হরণ করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলেন। অথচ এ্যারিষ্টটলের সত্যানুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।। একথা সুস্পষ্ট যে, বহুদিনের একটা সংস্কারের বেড়াজালে ইনি আটকে পড়েছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সত্ত্বেও তিনি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অজ্ঞাতসারে ছেলেবেলায় আমরা যে সমস্ত মতামত, সিদ্ধান্ত ও ভাবাবেগকে নিজস্ব করে নেই, তার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে কোন জিনিসের প্রতি আমাদের মনোভাব। অর্থাৎ বহু দিনের সংস্কার, উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া যোগ্যতা ও গুণাবলীই আমাদের গঠন করে। খুব কম সময়েই আমরা অনুধাবন করি যে, আমাদের আচরণ ও বিশ্বাসে সংস্কারের শক্তিশালী প্রভাবের তুলনায় সচেতন চিন্তাধারার প্রভাব কত কম। ছেলেবেলা থেকে অর্জিত এই সব শক্তিশালী সংস্কারের প্রভাব না থাকলে হয়তো আমরা পশুর নৈতিক ও বৌদ্ধিক স্তরের উপরে উঠতে পারতাম না। অতএব সংস্কারকে তাচ্ছিল্য করা নির্বুদ্ধিতা হবে। কিন্তু মানুষের পরস্পরের সম্পর্ককে যদি মধুরতর করতে হয়, তা হলে আমাদের ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সংস্কারকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং সমস্ত জিনিসটিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে। বদ্ধমূল সংস্কারের ভেতরে কোন্ জিনিসটি আমাদের ভাগ্য ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর, তা বুঝতে সচেষ্ট হতে হবে। যত কঠিনই হোক না কেন—সে অনুযায়ী আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি—সৎ চিন্তাশীল ব্যক্তি শীঘ্রই উপলব্ধি করবেন, নিগ্রোদের সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধভাব কতটা অযোগ্য ও মারাত্মক। এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আমেরিকায় শিল্পের মাপকাঠিতে যে উচ্চাঙ্গ সংগীত ঝরণাধারার মত উত্থিত হয়েছিল, তা কোন নিম্নস্তরের মানুষের প্রাণ হতে হওয়া সম্ভব? কিন্তু যিনি নিগ্রোদের সামাজিক গুণাবলী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, তিনি এ কথাও বিবেচনা করতে পারেন, তাদের চরিত্র ও সমস্ত সম্প্রদায়ের ভাবাবেগের উপর যুগ যুগ ধরে অমানুষিক নিপীড়নের কি প্রভাব পড়েছে। নিজের দিক দিয়ে আমি ত আশ্চর্য হয়ে যাই, কী শান্তভাবে ও ধৈর্যসহকারে তাদের এই কঠোর অদৃষ্টকে তারা বহন করে যাচ্ছে।

আমাদের এ কথাও বিবেচনা করতে হবে যে, আমাদের জাতির ভেতরে রাজ-নৈতিক শক্তি এই শোচনীয় সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে চেষ্টা করছে। এই প্রসঙ্গে শুধু আমি এ কথাই বলতে চাই যে, আমার মতে এ সব শক্তি অধিকাংশ লোকের অবস্থার উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এই বদ্ধমূল সংস্কার দূর করার জন্য সদিচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তি কি করতে পারে প্রশ্ন হল তাই। তাকে কার্যে ও আচরণে আদর্শ দেখাতে হবে এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তার

সন্তান-সন্ততি এই জাতিবিদ্বেষের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত না হয়। আমি বিশ্বাস করি না, এই দৃঢ়মূল কুসংস্কার শীঘ্র দূর হতে পারে; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য সফল না হয়, একজন মানবদরদী ন্যায়পরায়ণ লোকের পক্ষে এর চেয়ে বেশী আনন্দের আর কিছু হতে পারে না যে, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি এই সৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছেন।"

"রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকা" দেখে খুবই আনন্দ হল। এর সুন্দর গবেষণাগার দেখে মুগ্ধ হলাম। ডিরেক্টর মিঃ এলমার এন্‌গ্‌স্ট্রোমের সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপের পর তিনি রঙীন দূরেক্ষণ দেখার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাপকভাবে রঙীন দূরেক্ষণ তৈরী এখনো সম্ভব হয় নি। আরো ১৫—১৮ মাসের মধ্যে তা সম্ভবপর হবে।

এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাগারে যাই। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি অধ্যাপক ফুরমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বড় অমায়িক লোক ইনি। জৈব রসায়ন বিভাগের দুইজন অধ্যাপক সব ভাল করে দেখালেন। তারপর অধ্যাপক ফুরমান আমাকে নিয়ে গেলেন ডাঃ কেন্ডালের গবেষণাগারে। ডাঃ কেন্ডাল "কর্টিসোন" সম্বন্ধে গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'কর্টিসোন' গেটে বাতের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ কেন্ডাল অত্যন্ত আমুদে লোক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তিনি করলেন। মনে হল ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারত সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম অজ্ঞতাও রয়েছে। তাঁর ধারণা ছিল ভারতে একজন মুসলমানও নেই। যখন শুনলেন ভারতে সাড়ে তিন থেকে চার কোটি মুসলমান বর্তমান আছে তখন বেশ একটু আশ্চর্য হলেন। নিয়মানুযায়ী ৬৭ বৎসর বয়সে কর্ম হতে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও গবেষণা করার সুযোগ না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই রহাওয়ের মার্ক কোম্পানী যখন তাঁর গবেষণার জন্য একটি রসায়ণাগার সুসজ্জিত করে দিল তখন তিনি খুব খুশী হলেন। তিনি মনে করেন গ্রন্থির ভেতরে কর্টিসোনের চেয়ে ২০০-৩০০ গুণ শক্তিশালী একটি পদার্থ বিদ্যামান রয়েছে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ ভাল লাইব্রেরী ও বড় গির্জা আছে।

"ইনষ্টিটিউট ফর এডভান্সড ষ্টাডিজ" দেখি, কিন্তু একটা ভুল হওয়ায় এই দুইদিনের মধ্যে ডাঃ ওপেনহাইমারের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। ফিলাডেলফিয়া হতে ফেরার পথে অবশ্য সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

প্রিন্সটনে দু'দিনে অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও একটি উচ্চস্তরের এ্যান্টিবায়োটিকের কারখানা দেখা ছাড়াও বেশ আনন্দে কেটেছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে গুডরিজ পরিবার আমাকে তাদের পরিবারেরই একজন করে নিয়েছিল। তাই প্রিন্সটন শহর ছেড়ে আসার সময় মনে হচ্ছিল প্রিয়জনদের ছেড়ে যাচ্ছি এবং

তাদের সংগে হয়তো জীবনে আর কখনো দেখা হবে না।

প্রিন্সটনে একজন ব্যবসায়ী বলছিলেন যে, সম্প্রতি একজন কলকাতার ব্যবসায়ীর সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সে ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি দেখে তিনি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। আরো বললেন তিনি,—"আমার মনে হল, ভদ্রলোক মজুরদের শোষণ করে নিজেকে মোটা করতে চান।" কলকাতার যে ব্যবসায়ীর নাম করলেন তাঁকে আমি জানি। তথাপি আমার নিজেকে ছোট মনে হল যখন আমেরিকার ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কলকাতার ব্যবসায়ী সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করলেন। কারণ আমিও একজন কলকাতাবাসী। এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের বুঝবার সময় এসেছে যে তারা দুনিয়ার সামনে ভারতের মর্যাদাকে হীন করছে।

স্বামী নিখিলানন্দের বন্ধু মিঃ পার নিজের গাড়ীতে করে আমাদের প্রিন্সটন থেকে ফিলাডেলফিয়া নিয়ে গেলেন। জরুরী দু'খানা চিঠি সে সময়ে তাঁকে ডাকে দিতে দেই। খামের উপরের ঠিকানা আমার হাতের লেখা কিনা জানতে চাইলেন। "হাঁ" বলাতে তিনি খুব ভাল করে সে লেখা পরীক্ষা করলেন এবং আমার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। আমাদের প্রথম পরিচয় হয় সেদিনই। প্রথম সাক্ষাতে এরকম ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে কল্পনাও করা যায় না।

আমরা প্রথম ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত টাঁকশাল দেখি। আমার বিবেচনায় লণ্ডন টাঁকশালের চেয়ে এটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। অবশ্য কলকাতায় আলিপুরে তৈরী নূতন টাঁকশালের চেয়ে লণ্ডনের টাঁকশাল অনেক উন্নত। ভারতবর্ষের মত ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায়ও এখন কোন স্বর্ণমুদ্রা তৈরী হয় না। আমেরিকায় যে ডলার, অর্ধ ডলার ও ডাইম (১০ সেণ্ট) প্রভৃতি রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাতে শতকরা ৯০ ভাগ রূপা বর্তমান।

জর্জ ওয়াশিংটন ও লিঙ্কলনের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত ব্রোঞ্জ মেডেল ও এক-প্রকারের খুব চকচকে মুদ্রা ফিলাডেলফিয়া টাঁকশাল জনসাধারণকে বিক্রী করে। এ সবের কিছু কিছু আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য মিঃ পারকে ধন্যবাদ।

আমরা "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স স্কোয়ার" ও যে হলে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় তা দেখি। হলটি বেশ সুরক্ষিত এবং দর্শকের প্রতি ব্যবহারও খুব ভদ্র। যৌবনে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস আমাদের প্রেরণার এক উৎস ছিল। "হলে" প্রবেশ করতেই সেই সমস্ত ভাবাবেগ আবার যেন ফিরে এল,—সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল। সত্যিই এ এক তীর্থস্থান! বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষদের কোন ভৌগোলিক, জাতি বা বর্ণগত সীমাবন্ধন নেই। তারা জগতের সকল জায়গার মানুষকেই অনুপ্রাণিত করে।

ফিলাডেলফিয়া হতে ফেরার পথে স্বামিজী ও আমি ডাঃ ওপেনহাইমারের সংগে সাক্ষাৎ করি। প্রথম এটম বোমা তৈরীর কাজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ইনি। ২৭শে মে যখন প্রথম তাঁর সংগে দেখা করতে 'ইনষ্টিটিউট ফর এডভান্সড ষ্টাডিজ-এ'

যাই, তখন তিনি প্রিন্সটনে ছিলেন না। তাঁর মহিলা সেক্রেটারীর কাছে শুনে আশ্চর্য হলাম যে, আগের দিন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারিখ ও সাক্ষাতের সময় দিয়ে টাইপ করা যে কাগজ আমাকে দেওয়া হয়েছিল, আমি তাঁকে সেখানা দেখাই। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে, এ ভুলের জন্য দায়ী আমি নই। পরদিন অপরাহ্নে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবেন, একথা জানালেন। তিনি তা করেও ছিলেন। এজন্য আমি ডাঃ ওপেনহাইমার ও তাঁর সেক্রেটারীর নিকট কৃতজ্ঞ।

ডাঃ ওপেনহাইমারকে একজন ধর্মযাজক বা পাদ্রীর মত মনে হয়েছিল। না জানলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, প্রথম এটম বোমা তৈরীর কৃতিত্ব এ'রই। এটম বোমা শান্তি আনতে পারবে কিনা—আমার এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"এটম বোমার ধ্বংস-শক্তি যুদ্ধ আরম্ভের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করবে।" তারপর বললেন, "শান্তি আসবে, তবে তা আমাদের জীবিতকালে নাও হতে পারে।" আমেরিকার অদৃষ্টে যে কী দুঃখ আসতে পারে, তা ভেবে তিনি বিশেষ চিন্তিত। রাশিয়ার এটম বোমা আছে এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চিত, কিন্তু অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত নন।

তিনি সংস্কৃত জানেন। ভগবদ্‌গীতা, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও সাংখ্যদর্শন তিনি পড়েছেন এবং সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। চীন, ভারত ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করলেন তিনি। তাঁর মতে কোন দেশই নিজ ঈপ্সিত বস্তু পায় নি,—তাই এমন একটা বিশৃঙ্খলা চারদিকে। আমাদের আলোচনা বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ ও উপভোগ্য হয়েছিল।

নিউইয়র্কে এর পরের তিনটি দিন বেশ ঘটনাবহুল হয়েছিল। 'রকফেলার ইনষ্টিটিউট' দেখতে যাই। অধ্যাপক সেডলভস্কি খুব আন্তরিকতার সহিত আমাকে আদর-আপ্যায়ন করেন। অধ্যাপক হার্মানমার্ক আমাকে এ'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। জগতে কিভাবে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হতে পারে, তা নিয়ে প্রথম আলাপ করেন অধ্যাপক সেডলভস্কি। ভারতবর্ষ জগৎকে পথনির্দেশ করবে এ আশা তিনি রাখেন। প্রত্যেক ভারতবাসীই তাঁর কথা শুনে মনে মনে গর্ব অনুভব করবেন; কিন্তু বর্তমান ভারতের সে শক্তি কত স্বল্প, তা আমি জানি। তাঁকে বলি—ভারত যদি সত্যই গান্ধীজীর পথ অনুসরণ করে চলে, তবেই জগৎকে সে নূতন আলো দেখাতে পারবে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বিশেষ কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে হলে ভারতে আরও অনেক বেশী কাজ হওয়া দরকার। সাধারণভাবে আমার সমস্ত কথাই তিনি অনুমোদন করলেন। শান্তির জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা বুঝতে পারি। তিনি মনে করেন, জগতে শান্তির আবহাওয়া না থাকলে এমন কি নির্বিবাদে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও সম্ভবপর নয়। এর পর তিনি প্রাণ রসায়নাগার ঘুরে দেখালেন। অধ্যাপক গারনিকের ক্লোরোফিল ও হিমিন (গাছের পাতার সবুজ রঙ ও রক্তের লাল রঙ) সম্বন্ধে গবেষণা

ডাঃ ওপেনহাইমার
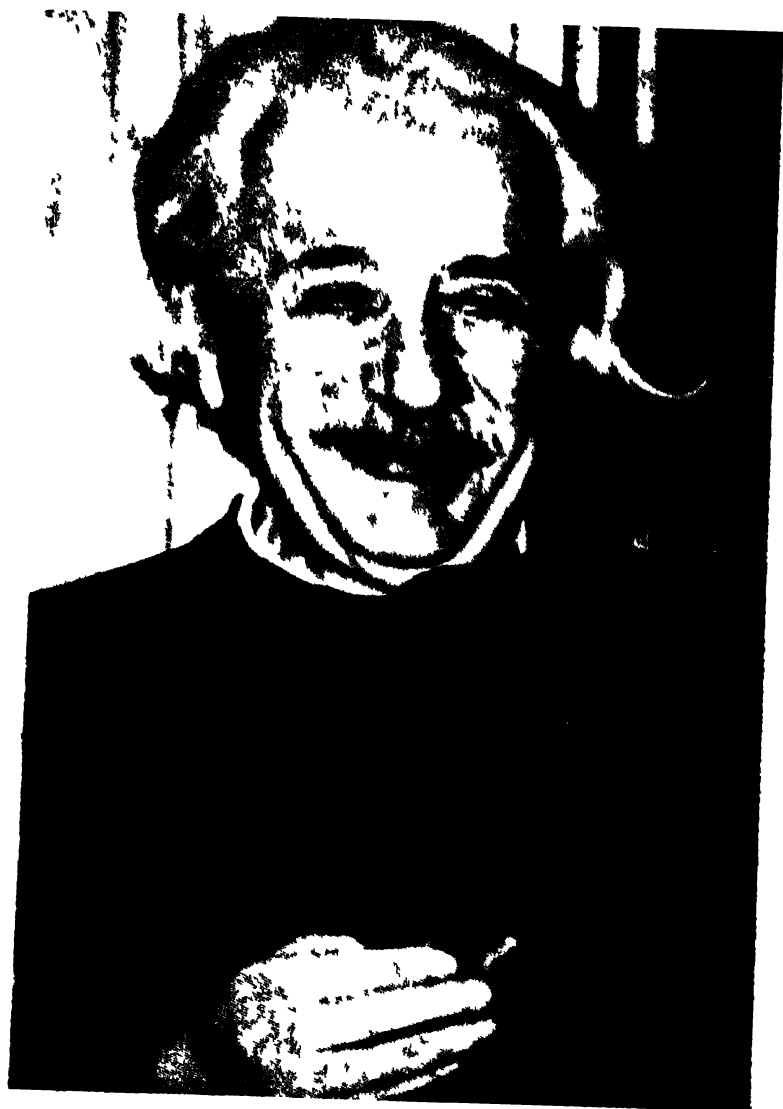
অধ্যাপক আলবার্ট আইনষ্টাইন

বেশ উঁচু দরের মনে হল। অপরাহ্নে আমার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাবার কথা ছিল; কিন্তু ভারত সম্বন্ধে ডাঃ সেডলভস্কির জানবার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল ছিল যে, বিস্তৃতভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তিনি আমাকে পরের দিনও মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন।

এক তরুণ বাঙালী রসায়নী ডাঃ প্রতুল মুখার্জী তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিল। আমাকে সে জৈব রসায়ন বিভাগে নিয়ে গেল। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ষ্টর্ক আমেরিকার প্রতিভাবান তরুণ রসায়নীদের একজন। বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর। সম্প্রতি 'হার্বার্ড' হতে এখানে এসেছেন। খুব যত্ন নিয়ে তিনি তাঁর রসশালা দেখালেন। খুব সাদাসিদে, সরল ও খোলা-প্রাণ লোক তিনি। ভারতে বিদেশী রসায়নী নেবার পক্ষপাতী তিনি নন। তাঁর ধারণা ভারতে কৃতি তরুণ রসায়নী আছে, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে তারা কৃতিত্ব দেখাতে পারবে।

প্রাণ রসায়নাগারে আমাকে তিনি প্রথম অধ্যাপক কিং-এর বিভাগে নিয়ে যান। এখানে ভাইটামিন 'সি' নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। অধ্যাপক কিং উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সহকারী আমাকে সব দেখালেন। এর পর বিখ্যাত পুষ্টি-রসায়নী অধ্যাপক শেরমানের রসশালায় যাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তিনি গুরুতর-ভাবে পীড়িত। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের স্বামী পবিত্রানন্দের সঙ্গে একটা বিকাল বেশ আনন্দে কাটালাম। ছাত্রজীবনে ঢাকায় আমরা পরস্পরকে জানতাম। জীবন গড়ে উঠার দিনগুলি নিয়ে আলাপ করতে মন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল। কিছু সময়ের জন্য যেন ফিরে গিয়েছিলাম অতীতের সেই দিনগুলিতে। রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের স্থান নিয়েও আলোচনা ইত্যাদি হল।

৩১শে মে, রবিবার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টারের মন্দিরে "ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেই। নীচে তার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম দেওয়া হল ঃ—

"ভারতীয় সভ্যতার সার কথা হল এই যে, জীবন একটি পরিপূর্ণ সমগ্র সত্ত্বা এবং তার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা। সৌরজগতে সূর্যের যে স্থান আধ্যাত্মিকতার সেই স্থান ভারতীয় সভ্যতায়। জীবনের সকল দিকই বিবেচনার বস্তু হয়েছিল বলেই ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটে। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই দেখেছি চরম উৎকর্ষ; কিন্তু নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়েনি কিছুই। চিন্তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মহান ঐক্য রয়েছে, ভারতবর্ষ তা স্বীকার করে নিয়েছিল। অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন না করে পরিবর্তন ও সংস্কার করার ক্ষমতা ভারতীয় সভ্যতার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

"জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ আমাদের ঋগ্বেদে ভগবান সম্বন্ধে সর্বোচ্চ কল্পনা

পাই,—'তিনি এক, পণ্ডিতেরা তাঁকে বহু নামে অভিহিত করেন।' আমাদের উপনিষদ ও ভগবদ্‌গীতা অন্তরাত্মাকে মহীয়ান করার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। খুব উন্নত এক সাহিত্য ছিল আমাদের এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাসের ন্যায় সাহিত্যিক-প্রতিভা জন্মেছিলেন ভারতে। গণিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ভারত তাব প্রতিভার পরিচয় দেয়। নিউটনের (১৭শ শতাব্দী) পূর্বে ভারতবর্ষে মাধ্যাকর্ষণের ধারণা খুব স্পষ্টভাবে জানা ছিল। ভাস্করাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের বইতে লিখেছেন,—'পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির জন্য বস্তু সকল উপর হতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু মনে হয় তারা নীচে পড়ছে।'

'পৃথিবীর বহু সভ্যতা আজ লুপ্ত, শুধু পণ্ডিতগণের গবেষণা থেকে তাদের সম্বন্ধে জানতে পারা যায়; কিন্তু নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতা টিঁকে রয়েছে। অনাদিকাল হতে জীবন সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা প্রচলিত থাকায় এক অদ্ভুত অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির সৃষ্টিই তার কারণ। তাই এমন কি বর্তমান যুগেও ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণের ন্যায় সাধুপুরুষ, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সাহিত্যিক-প্রতিভা, গান্ধীর ন্যায় রাজনৈতিক নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি অগ্রভাগে আসার পূর্বে লোকমান্য তিলক ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌ বলে স্বীকৃত ছিলেন। স্যার ভ্যালেণ্টিন চিরল তাঁর 'ভারতে অশান্তি' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, তিলকই ছিলেন ভারতে অশান্তির জনক। তিলক ছিলেন ভগবদ্‌-বিশ্বাসী। তাঁকে যখন ছয় বৎসরের নির্বাসনের আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আদালতে বলেন—'আমার অনুপস্থিতি ও দুঃখবরণের দ্বারা যদি আমার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হবে, ভগবানের এই ইচ্ছা হয়, তবে আমি প্রস্তুত।' এই দুই নেতাই ভারতীয় কৃষ্টির উৎস হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

"ভারতীয় সভ্যতা অতি মহিমাময়;—জগতের যে কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বস্তু।"

অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এই বক্তৃতার। তাঁদের মধ্যে আমার বন্ধু স্বামী নিখিলানন্দও একজন। এঁর মতের মূল্য আমার কাছে যথেষ্ট; কারণ, এ বিষয়ে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। ডাঃ সেডলভস্কিও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঐদিন অপরাহ্নে বোষ্টন রওনা হই। হার্বার্ডের অধ্যাপক ফিজারের নিকট পরিচয়পত্র ছিল। সেখানা সঙ্গে দিয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখি। এই অনুরোধ তাতে জানাই যে, ১লা জুন, সোমবার তাঁর রসশালা দেখতে চাই, তাঁর সুবিধা হবে কিনা আমাকে যেন খবর দেন। তাঁর উত্তর আমি রওনা হবার আগে নাও পেতে পারি এ সংশয় হওয়াতে তিনি নিউইয়র্কে টেলিফোন করে আমায় খবর দেন। কাজেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম কত সুন্দর প্রকৃতির লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যখন তিনি গতবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন;—অসুস্থতাবশতঃ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম।

রাস্তায় ট্রেণ হতে 'নিউ লণ্ডনে'র সমুদ্রতীর দেখে মুগ্ধ হলাম। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী বোষ্টন ষ্টেশনে এক ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। যেখানে অপেক্ষা করার কথা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি নেই। এদিক ওদিক, চারদিক তাকিয়ে তাঁকে খুঁজছিলাম। সম্ভবতঃ একজন বিদেশী কোন অসুবিধায় পড়েছে ভেবে তৎক্ষণাৎ একজন আমেরিকান মহিলা এসে আমায় বললেন,—"আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?" তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "এক বন্ধুর এখানে এসে অপেক্ষা করার কথা ছিল। এবং তিনিই আমাকে 'ওয়াই, এম, সি, এ'তে নিয়ে যাবেন। তাঁকেই খুঁজছি।" এই পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এরূপ সাহায্যের মনোবৃত্তি আমেরিকান মহিলাদের একটা বৈশিষ্ট্য।

কাউণ্টেস ম্যাবেল বোষ্টন শহর হতে ১৪ মাইল দূরে তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতেন। ১লা জুন সকালে তিনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন 'কনভার্স মেমোরিয়াল' রসশালায়। সেখানেই অধ্যাপক ফিজার কাজ করেন। ভারত ভ্রমণের স্মারক হিসাবে রক্ষিত কতকগুলি ফটো প্রথম অধ্যাপক আমাকে দেখালেন। তারপর অন্য দেশ হতে আগত তাঁর বর্তমান সহকর্মীদের নাম জানালেন। এর পর তিনি তাঁর রসশালা ভাল করে দেখালেন। এটি বেশ সুসজ্জিত রসশালা এবং অধ্যাপকও কঠোর পরিশ্রমী। শ্রীবিদ্যুৎ ভট্টাচার্য নামক একজন বাঙ্গালী রসায়নীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি কলকাতার নিকটবর্তী যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। বর্তমানে এই রসশালায় 'ষ্টেরয়ড' নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁকে দেখলাম একটি 'রঙ্গপূর্ব যন্ত্র' নিয়ে কাজ করছেন। তার দাম ১৪ হাজার ডলার। আমি তাঁর সঙ্গে পশ্চিম বাংলার গবেষণা কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করি। তাঁর মতে পশ্চিম বাংলায় গবেষণার সুযোগ কতকটা সীমাবদ্ধ।

অধ্যাপক ফিজার আমাকে আমেরিকার একজন অতি প্রতিভাবান তরুণ রসায়নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ইনি অধ্যাপক উডওয়ার্ড। বর্তমানে তাঁর বয়স ৩৬ বৎসর। মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে কুইনিন সংশ্লেষণ করেন। তাঁর প্রণালীতে এক কারখানায় তৈরী সংশ্লেষিত কর্টিসোনের নমুনা দেখালেন। অন্য কাজের মধ্যে তিনি তখন ষ্ট্রীকনীন সংশ্লেষণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের শেষভাগে তিনি একাজ সুসম্পন্ন করেছেন। তাঁর রসায়নাগার ঘুরে দেখালেন ও বললেন,—"তরুণ ভারতীয় রসায়নীদের মধ্যে প্রতিভাবান লোক আছেন। তাঁদের কার্যকরী কিছু করার উপদেশ না দিয়ে যা করতে চান, সেই কাজেরই সুযোগ দিন। তাঁরা ফললাভে সক্ষম হবেন।" এঁকে খুব সাদাসিদে লোক বলে মনে হল। ম্যাসাচুসেট ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি' (এম, আই, টি) র বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক নর্বার্ট ভিনারের নিকট আমার পরিচয়পত্র ছিল। তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। কিন্তু আমার ইনষ্টিটিউট দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তাই আমি অধ্যাপক ফিজারকে

অনুরোধ করি তিনি যদি পরের দিন আমার দেখবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। খুব আনন্দের সঙ্গেই তিনি তা করলেন।

অধ্যাপক ফিজারের চেহারা রুক্ষ্ম, কিন্তু তিনি হৃদয়বান লোক। বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্লাস মিউজিয়াম' দেখতে বলেন। আমি তা দেখিও।

চেহারা যে অনেক সময় ভুল ধারণার সৃষ্টি করে, তা বুঝতে পারলাম যখন বাইরে এলাম। কাউণ্টেস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, অধ্যাপক আমার সঙ্গে যথাযোগ্য ভদ্র ব্যবহার করেছেন কিনা,—কারণ তাঁকে রুক্ষ্ম প্রকৃতির লোক বলে মনে হল। কাউণ্টেস পুরাপুরি আমেরিকান। কোন আমেরিকাবাসীর কাছে আমি অভদ্র ব্যবহার পেলে আমেরিকার মর্যাদাহানি হবে। সে তিনি সহ্য করতে নারাজ। তদুপরি আমাকে ভাইয়ের মত মনে করতেন কাউণ্টেস। কাজেই অনেকটা উদ্বিগ্ন তিনি ছিলেন; কিন্তু যখন আমি অধ্যাপক সম্বন্ধে আমার মত বললাম, তখন তিনি খুব খুশী হলেন।

গ্লাস মিউজিয়াম দেখে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, কাঁচের এমন সব মডেল তৈরীও সম্ভব হতে পারে। মনে হল যেন প্রকৃতি দেবীর নিজের হাতেই তৈরী এ সব—মানুষের নয়। কর্ণফ্লাউয়ার (এক রকম নীল ফুল) থেকে প্রজাপতি মধু আহরণ করছে, এ মডেলটি কত যে স্বাভাবিক ঠিক ধারণা করা যায় না। পুষ্প-পরাগের সংযোগ দেখাবার ব্যবস্থাটি অনবদ্য।

এ সমস্ত কাচের মডেল তৈরীর কৃতিত্ব লিওপোল্ড রুডলফ ব্লাচকার। এঁরা পিতাপুত্র জার্মানীর ড্রেসডেনের অধিবাসী। সমস্ত জিনিসটি তৈরী করতে এঁদের অর্ধ শতাব্দী লেগেছিল এমন মিউজিয়াম পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এ কাজের জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন মিসেস এলিজাবেথ লি. ভারে ও তাঁর কন্যা মিস লি. ভারে। এ সমস্ত মডেলের সম্পূর্ণ সংগ্রহই তাঁরা হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। ১৬৪ প্রকারের ফুলগাছের নমুনা রয়েছে এই যাদুঘরে। বাছাই করা অপুষ্পক উদ্ভিদগোষ্ঠী ও তাদের জটিল জীবন-ইতিহাস দেখান হয়েছে। কীটপতঙ্গ কি ভাবে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে পরাগ নিয়ে যায় এবং যে সমস্ত ফলের ফুল গোলাপের পাপড়ির মতই স্তরে স্তরে সাজানো থাকে,—যেমন আপেল, এপ্রিকট, পিচ প্রভৃতি ফল এবং এদের উপর ছাতা পড়া রোগের ফলাফল—সমস্ত কিছুই মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থা! লিওপোল্ড ও রুডলফ ব্লাচকা এই দুই প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ শিল্পীকে আমার নমস্কার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিক ঘুরে দেখি। অপরাহ্নে কাউণ্টেস আমাকে ইমার্সন ও থোরো যাদুঘর এবং "কনকর্ড" পুলের উপরে যেখানে প্রথম ইংরেজ সৈন্য ও আমেরিকার স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সংগ্রাম হয় সে স্থান ঘুরিয়ে দেখান।

কনকর্ড হতে কাউণ্টেস সান্ধ্য ভোজনের জন্য আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যান। তাঁর মা কৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা এবং জীবন ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম।

২রা জুন সকালবেলা কাউণ্টেস আমাকে 'এম আই টি'তে নিয়ে যাবার জন্য আবার আসেন। আমার অনুরোধে শ্রীবিদ্যুৎ ভট্টাচার্য'ও আমার সঙ্গে গেলেন। 'এম আই টি' একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, এক সকালবেলায় সমস্ত কিছু দেখা অসম্ভব বলা চলে। ডাঃ এ্যাসডাউন আমাদের ঘুরিয়ে দেখান এবং প্রত্যেকটি জিনিস সম্যক ভাবে দেখাবার জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। বড় সুন্দর প্রকৃতির লোক তিনি। এ প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারটি বেশ ভাল কিন্তু বসে পড়বার ঘরের ব্যবস্থাটি আরও চমৎকার। এখানকার বিজ্ঞানাগারও যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার এবং বার্ষিক খরচ ৩ কোটি ২২-১/২ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫-৪ কোটি টাকা। প্রত্যেক ছাত্রকে বার্ষিক ফি দিতে হয় নয় শত ডলার এবং তার বার্ষিক খরচ হয় প্রায় দুই হাজার ডলার। "এম আই টি"র মত কোন প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়ে তোলা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। ভারতকে তার নিজস্ব প্রণালীতেই গড়ে উঠতে হবে। তার নিজ প্রতিভা, প্রয়োজন এবং আর্থিক শক্তির মাপকাঠিতেই তা স্থির হবে।

অপরাহ্নে মিস্ কুপল্যাণ্ড আমাদের বোষ্টনের কারুকলা-যাদুঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন। দেখবার মতই জায়গা বটে। খুশী হলাম দেখে যে পাঞ্জাবের হরপ্পা খনন করে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার কিছু কিছু এ যাদুঘরে রয়েছে।

৩রা সকালবেলা বোষ্টন ছেড়ে "বাফেলো" ষ্টেশনে এসে পৌঁছাই। "বেল হাওয়াই জাহাজের কারখানা"র পদার্থ-বিজ্ঞানী মিঃ জন আমাকে অভ্যর্থনা করে। ষ্টেশনে প্রাতরাশ সমাধার পর সোজা মোটরে করে আমায় নিয়ে যান নায়গারা জলপ্রপাতের কাছে। বাস্তবিকই এ জলপ্রপাত জগতের একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। ভগিনী নিবেদিতা একে তুলনা করেছেন "দেব প্রয়াগে" হিমালয়ের অলকনন্দা ও মন্দাকিনী নদী দু'টির সঙ্গমস্থলের সঙ্গে। সে স্থানও আমি দেখেছি। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার প্রতি উপযুক্ত সম্মানের ভাব রেখেও আমাকে বলতেই হচ্ছে যে নায়গারা আরও অপরূপ, উদাত্ত এবং গম্ভীর। এ সৌন্দর্য অতুলনীয় বুঝি বা! প্রকৃতির কী অপূর্ব সৃষ্টি! পার্কগুলির ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে জলপ্রপাত দেখে আমরা "হাওয়া-গুহা"তে যাই। এ এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সমস্ত শরীর যাতে না ভেজে সেজন্য একপ্রকার হাল্কা হলুদ রঙের পোশাক আমাদের পরতে হলো। সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ সজোরে এসে চোখে মুখে লাগছিল। কখনো কখনো এত জোরে আঘাত করছিল যে অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। এ অনুপম অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে বার বার মনে জেগে উঠছিল রবীন্দ্রনাথের গানের একটি ছত্র,—

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো—"

অনুভব করলাম ভগবানের করুণাধারা যেন আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে ঐ জলকণার আকারে।

কিন্তু অস্বাভাবিক আনন্দ হল "মেইড অব দি মিষ্ট" বা 'কুয়াশার রাণী' জাহাজে চড়ে নায়গরা নদী ভ্রমণে। তা না করলে এ প্রপাতের বিশালতা এবং ঐশ্বর্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। জীবনে আমার এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

পাশপোর্টের বিধিনিষেধের জন্য প্রপাতের ক্যানাডার দিকে অবস্থিত অংশে যেতে পারিনি। যেতে অবশ্য পারতাম, কিন্তু ফিরে আসতে আবার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিতে হত। অন্য পন্থা ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে ছাড়পত্র নেওয়া। ক্যানাডা সীমান্তের পুলের কাছে রক্ষী দপ্তরখানায় গিয়ে এ খবর জানতে পারলাম। আমার প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখালেন, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। আমি মনে করি এ নিয়মের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং প্রকৃত ভ্রমণকারীদের জন্য সীমান্ত দপ্তরখানা থেকে "পাশ" বা ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং 'কুয়াশারাণী" জাহাজ হতে ক্যানাডা অংশের প্রপাত যতদূর দেখতে পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। অন্য উপায় ছিল না।

জনে'র দুজন রসায়নবিদ বন্ধু আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনে নিয়ে গেলেন এবং "হুকার কেমিক্যাল কোম্পানী" দেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

নায়গারা প্রপাতের কাছে অনেকগুলি রাসায়নিক কারখানা আছে। "হুকার কেমিক্যাল কোম্পানী"র প্রধান কাজ লবণের তড়িদ বিশ্লেষণ করা। বহু পরিমাণে এখানে কষ্টিক সোডা উৎপন্ন হয়। যে ক্লোরিণ উৎপন্ন হয় তার ক্রিয়ার দ্বারা অনেক জৈব যৌগিক পদার্থকে কীটপতঙ্গনাশী পদার্থে পরিণত করা হয়। এই কোম্পানীতে ১৫০০ জন কর্মী আছে। সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করে কর্মীরা সর্বনিম্ন বেতন পায় ৫২ ডলার। বেশ ভাল গবেষণাগার রয়েছে। যা কিছু আমি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করি সে সমস্তই দেখান হল।

বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র দেখতে যাই। যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা দুই দেশই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসাবে নায়গারা প্রপাতকে ব্যবহার করছে।

যে জায়গা থেকে নায়গারা নদীর ঘূর্ণাবর্ত দেখতে পাওয়া যায় জন আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। প্রকৃতির এ সৃষ্টি-খেয়ালের কি অর্থ কেউ তা জানে না। এখনও এ এক পরম রহস্য। তারপরে যাই যেখনে নায়গারা নদী অণ্টারিয়ো হ্রদে পড়েছে। স্থানটি বড় মনোরম। এখানে একটি দুর্গ আছে। ১৭২৫ সালে ফরাসীরা এটি তৈরী করে। পরে ইংরেজেরা সেটি দখল করে এবং ১৮১৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে। এই সুরক্ষিত দুর্গটি থেকে চারিদিককার দৃশ্য অপূর্ব। একটু দূরেই নায়গারা নদীতে নৌকা চালানোর সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

লুরে গুহা

থাউজেণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে বিবেকানন্দ-কুটিরে—গ্রন্থকার

জেফার্সনের সমাধি

দুরন্ত ইচ্ছা জাগলেও সময়ের দিকে তাকিয়ে সে সখ থেকে নিবৃত্ত হতে হল।

সান্ধ্য-ভোজনের পর, চিকাগো যাওয়ার জন্য জন আমাকে মোটরে করে "বাফেলো" ষ্টেশনে পৌঁছে দিল।

অতি সেবাপরায়ণ এই তরুণ যুবক জন,—বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি তার শ্রদ্ধার ভাবও উল্লেখনীয়। তাকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। সকাল থেকে রাত্রি,—আমি বিদায় নেবার পূর্ব পর্যন্ত সে সমস্তক্ষণই আমার সঙ্গে ছিল। মোটর চালিয়ে, আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব আমাকে সব দেখাবার চেষ্টা করে সে সারাটি দিন কাটিয়েছিল। নায়গারা প্রপাত দেখার মত তার সান্নিধ্যও কম আনন্দের হয়নি। এরূপ তরুণ যে কোন জাতির সম্পদ!

ঠিক এমনি সুন্দর ও বুদ্ধিমান একজন তরুণের ভালবাসা জড়ানো সেবা পেয়েছিলাম চিকাগো শহরে। সে ভারতীয়, মহারাষ্ট্রের অধিবাসী; নাম গৌরাঙ্গ যোধ। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমাণবিক বিজ্ঞানাগারে ডক্টর উপাধির জন্য গবেষণা করছিল। চিকাগোতে এখন 'ফার্মি,' 'উরে' ও 'এন্ডারসনে'র মত বিখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী রয়েছেন। গৌরাঙ্গ আমাকে সাইক্লোট্রোন, সিন্‌কোট্রোন যন্ত্র ও সমস্ত বিজ্ঞানাগার দেখাল। কেম্ব্রিজের (ইংল্যান্ড) ক্যাভেণ্ডিস বিজ্ঞানাগারের চেয়েও চিকাগোর বিজ্ঞানাগার অধিকতর সুসজ্জিত মনে হল। জৈব ও প্রাণরসায়ন বিভাগও আমি দেখি।

এই চিকাগো শহরেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিন্দুধর্মের বাণী পাশ্চাত্য জগৎকে শুনিয়েছিলেন। যেখানে ধর্ম মহাসভা বসেছিল এবং স্বামিজী তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমি সেই স্থানটি দেখি।

বহু সংখ্যক নিগ্রো এখানে বাস করে। নিগ্রো অঞ্চল বলে পরিচিত "ইন্ডিয়ানা এভেন্যু" দেখতে যাই। বেশ অপরিচ্ছন্ন এলাকা এটি। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে জৈব পদার্থসমূহ পচে বেশ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। তবু, আমাকে বলতেই হবে যে কলকাতার বস্তি অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চল অনেকগুণ ভাল। এ অঞ্চল দেখার সময় কেবলই আমার মনে হয়েছিল এদেশ হতে খৃষ্টান মিশনারীদের ভারতে না গিয়ে প্রথম এদেরই সেবা করা উচিত।

৪ঠা জুন বিকালে গৌরাঙ্গ কয়েকজন ভারতীয় ও আমেরিকান বন্ধুকে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করে। সৌহার্দপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল সেদিন এবং আলাপ-আলোচনাতেও ঘরোয়া ভাব ছিল।

ভারতীয়রা স্বভাবতই ভারতের উন্নতির বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন। আমেরিকানরাও ভারতবর্ষের সঙ্গে সমকক্ষ হিসাবে বন্ধুত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সকলের অনুরোধে কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে কিছু বলতে হল। কষ্ট স্বীকার করে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন বলে সমবেত বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলি,—"ভারতবর্ষ আমেরিকা সমেত সকল দেশের সঙ্গেই প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ

সম্পর্ক কামনা করে। সে কাউকে শোষণ করতে চায় না নিজেও শোষিত হতে চায় না। ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে, এখন তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। সেজন্য তাকে নির্ভর করতে হবে মুখ্যতঃ আত্মশক্তির উপর। আমি বিশ্বাস করি,—আমেরিকার আর্থিক বা অন্য কোন প্রকারের সাহায্য ভিন্নই ভারত তার খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারে। সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী আমাদের মাত্র শতকরা দশভাগ খাদ্য ঘাটতি। অন্য সব জিনিস অপরিবর্তিত থাকলেও আমরা যদি শুধু ভাল বীজ সরবরাহ করতে পারি, তাহলেই শতকরা দশভাগেব বেশী খাদ্য উৎপন্ন হবে। বানর এবং অন্যান্য বন্য জন্তু যে পরিমাণ খাদ্য নষ্ট করে তা বন্ধ করতে পারলে অনেক পরিমাণ খাদ্য বেঁচে যাবে। গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপরই নির্ভর করে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান। আমেরিকার প্রধান সমস্যা হচ্ছে শ্রমলাঘবের উপায় আবিষ্কার, আর ভারতের সমস্যা হল বেশী পরিমাণ লোককে কাজে নিযুক্ত করা।"

চিকাগোর বিখ্যাত "সায়ান্স ও আর্ট মিউজিয়াম" শিক্ষাপ্রদ এবং দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। এ ধরণের যত যাদুঘর এ পর্যন্ত দেখেছি তার মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হল। সাধারণ বিজ্ঞান, মনুষ্য-শরীর, টেলিফোন, দূরেক্ষণ, প্লাসটিক, সংশোধিত রবার প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানে অনেক কিছু শেখা যায়। কোন প্রবেশ-মূল্য নেই। বহু শিশু এটি দেখতে আসে। অসাবধানভাবে নাড়াচাড়া করে যদি তারা টেলিফোন যন্ত্র খারাপও করে ফেলে তবু কেউ তাদের তিরস্কার করে না। শিক্ষাদানের কী চমৎকার ব্যবস্থা!

গ্রীষ্মকালে চিকাগো বেশ গরম। রাত্রিকালে অবশ্য ঠাণ্ডা হয়। আমার থাকাকালীন দুইদিনই বজ্রপাতসহ বৃষ্টি আমাকে ভারতবর্ষের কথা মনে করিয়ে দিল : মিচিগান হ্রদের তীরে এই চিকাগো শহর। হ্রদের ধারের দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর,—কিন্তু সৈকত যেমন পরিষ্কার আশা করেছিলাম তেমনটি নয়।

৫ই জুন অপরাহ্নে চিকাগো হতে ওয়াশিংটন যাত্রা করি। ট্রেণে এক মজার ঘটনা ঘটে। ট্রেণ চিকাগো ছাড়বার ঘণ্টাখানেক পরে এক বৃদ্ধ আমেরিকান ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং আমাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলেন। তাঁর মতে যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা। যত ভালই আমি হই না কেন, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে আমার মুক্তি নেই। ইনি মেননাইট সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের প্রকাশিত সাহিত্য কিছু আমাকে দিলেন। মনে হল ইনি সম্পূর্ণ ধর্মান্ধ। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য আমাকে যখন পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করলেন তখন বললাম,—"ভগবান সর্বশক্তিমান, একথা আপনি বিশ্বাস করেন কি?" তিনি জবাব দিলেন—"হ্যাঁ।" আমি বলি,—"আমার জন্য তা হলে তো চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার ভার যদি তিনি নিতে পারেন আমার ভারও নিতে পারবেন। তাঁর হেফাজতে আমাকে রেখে সন্তুষ্ট থাকুন।" নিরাশ ও দুঃখিত

হয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ওয়াশিংটনে আমি জি. এল. মেহতার আতিথ্য গ্রহণ করি। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন পূর্বেই সেখানে ছিলেন। ভারতের অবস্থা, দেশের সামনে উপস্থিত নানা সমস্যা এবং তার সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টা,—ইত্যাদি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হল। খোলাখুলি ভাবে তিনি নিজের মত ও মন্তব্য প্রকাশ করলেন। আমিও তেমনি ভাবেই আমার মত ব্যক্ত করি। শ্রীজওহরলাল নেহরুর বৈদেশিক নীতি তিনি পুরাপুরি সমর্থন করেন। কিন্তু দেখে আনন্দ হল যে, তিনি সেই আত্মবিমুগ্ধের একজন নন, যাঁরা মনে করেন পৃথিবীর কোন দেশ ভারতবর্ষের ন্যায় সাত বৎসরে এতটা উন্নতিসাধন করতে পারেনি। শ্রীমেহতার সঙ্গেও ভারতের পঞ্চবার্ষিক যোজনা সম্বন্ধে আলাপ করার সুযোগ হল। তিনি পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। আমার মতে এই যোজনার যা ত্রুটি, তা দেখালাম। আমেরিকার অবস্থা এবং আমেরিকা ও ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলাপ হল।

ওয়াশিংটনে প্রথম দেখতে যাই জর্জ ওয়াশিংটন, লিঙ্কলন ও জেফারসনের স্মৃতিস্তম্ভ। জর্জ ওয়াশিংটন স্মৃতিস্তম্ভের কাছে গিয়ে যা দেখি তাতে মনে খুবই দুঃখ পাই এবং একথা উল্লেখ না করলে কর্তব্যের ত্রুটি হবে বলে মনে করি। দেখলাম চারদিকে চীনে বাদামের খোসা ছড়ান রয়েছে। একজন মহান ব্যক্তির স্মৃতি-স্তম্ভের কাছে এমন দৃশ্য আমেরিকায় দেখব, তা কল্পনা করিনি।

আর এক আঘাত পেলাম সেদিন রাত্রিতে। শ্রীবাহাদুর সিং প্রথম সেক্রেটারী। তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। শ্রীরাধাকৃষ্ণন ছিলেন প্রধান অতিথি। শ্রীমেহতা ও আমি আরও চারজনের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছিলাম। যে দু'জন মহিলার মাঝখানে আমি ছিলাম তাঁরা একজন আমেরিকান ও অন্যজন ভারতীয়। দু'জনেই প্রচুর মদ খাচ্ছিলেন। আমি প্রগতিশীল নই,—এ সমালোচনা শোনার ঝুঁকি নিয়েও বলছি যে, একজন ভারতীয় মহিলা এমনিভাবে মদ্যপান করছেন দেখবো আশা করিনি। কিন্তু শ্রীমতী সিংহকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। কবি রবীন্দ্র-নাথের সেক্রেটারী অজিত চক্রবর্তীর কন্যা ইনি। সারাক্ষণ বাংলাতেই তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। বাংলায় কথা বলতে পেরে তাঁর মুখে আনন্দের দীপ্তি দেখলাম। আমিও বেশ আনন্দ পেলাম।

৭ই রবিবার, আর্ট গ্যালারী এবং যাদুঘর দেখা ছাড়াও "মাউন্ট ভারনন" দেখলাম। জর্জ ওয়াশিংটন সেখানে বাস করতেন। এই মহান ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রবিবার বহু লোক এখানে আসে। আমি সুখী যে, সে সম্মান দেখাবার সৌভাগ্য আমারও হল। স্থানটি যত্নে রাখা হয়েছে। অমন সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল মনকে আনন্দে ভরিয়ে দিল।

রাত্রিবেলা মিঃ নিকোলাস জি থ্যাচার আমাকে সান্ধ্যভোজনে আমন্ত্রণ জানালেন।

ইনি কলকাতায় কনসাল থাকা সময়েই আমরা দুজনে পরস্পরের পরিচিত ছিলাম। এখন তিনি ওয়াশিংটন ডি সি'তে আছেন এবং বৈদেশিক দপ্তরে এশিয়া সংক্রান্ত বিভাগে কাজ করছেন। ভারতীয় বিষয়াদি নিয়েই তাঁর কাজকর্ম। পাকিস্থানেব বিষয় ইত্যাদি কাজের ভারপ্রাপ্ত ডাঃ সাইমনসকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেন। অতএব রাজনৈতিক আলোচনা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। আমাদের খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে উল্লেখ করে এ সমস্ত বন্ধুদের আমি বলি, যে কোন প্রকারের বিদেশী সাহায্য না নিয়ে ভারত তার খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারে। সুতরাং এ কাজের জন্য আমেরিকার অর্থসাহায্য নেওয়ার বিপক্ষে আমি। অথচ আমি এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবন্ধ হবার একান্ত পক্ষপাতী। একথাও তাদের বলি যে, ইন্দোচীনের ফরাসী সরকারকে আমেরিকা যে অর্থ সাহায্য করছে তাকে উপনিবেশবাদের পৃষ্ঠপোষণ হিসাবে ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য যদি ফ্রান্স ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ঘোষণা দেয় তবে বলার কিছু থাকে না। আমেরিকা উপনিবেশবাদ পছন্দ করে না, সুতরাং অবিলম্বে ফ্রান্সকে সে পথ অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দেওয়া সঙ্গত। ইন্দো-পাকিস্থান সম্পর্ক নিয়েও আমরা আলোচনা করি। এই দুই দেশের মধ্যে যে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত—এ বিষয়ে কোন মতভেদ ছিল না। সমস্ত আলোচনাই অতি আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে হয়েছিল। শ্রীমতী থ্যাচারের মনখোলা এবং সহজ ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ।

৮ই সোমবার। আমি শিক্ষা বিভাগ দেখতে যাই এবং দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করি। তাঁরা আমার সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং আমেরিকার শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক ইত্যাদিও দিলেন। আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার মুখ্য বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি ফেডারেল। শিক্ষার ব্যবস্থা বিভিন্ন ষ্টেটের হাতে। জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর বলে কিছু নেই। ৪৮টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকের শিক্ষা বিভাগ ভিন্ন এবং তারা বিভিন্ন নামেও পরিচিত। কিন্তু ১৮৭৬ সালে একটি ফেডারেল শিক্ষা দপ্তর সৃষ্টি হয়। তার উদ্দেশ্য—(১) বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থা ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা, (২) যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলের শিক্ষা যাতে ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেজন্য স্কুলসমূহের পরিচালনব্যবস্থা, নিয়মকানুন ও শিক্ষণ-পদ্ধতি বিষয়ক তথ্যাদি পরিবেশন করা এবং (৩) আরো অন্য উপায়েও দেশব্যাপী শিক্ষার প্রসার করা।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রণালী নির্ণয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কাজেই সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রণালী এক ছাঁচে ঢালা নয়। কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেক ক্ষেত্রেই মিল আছে। "উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যেক ষ্টেটেরই একজন প্রধান ষ্টেট স্কুল অফিসার আছেন। সাধারণতঃ তাঁকে বলা হয় 'কমিশনার

অব এডুকেশন' অথবা 'সুপারিণ্টেনডেণ্ট অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন।' অধিকাংশ রাষ্ট্রেই জনসাধারণ কর্তৃক প্রধান ষ্টেট স্কুল অফিসার নির্বাচিত হন। তিনিই রাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই "ষ্টেট বোর্ড অব এডুকেশন" আছে। সাধারণত শিক্ষাপ্রণালী যৌথভাবে নির্ণীত হয়। ষ্টেট বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট বিবেচনা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কুল সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করেন। অধিকাংশ রাষ্ট্র আবার ভৌগোলিক হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তারা শিক্ষা পরিচালনার স্থানীয় কেন্দ্রস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের শিক্ষা অনেক পরিমাণে স্থানীয় পরিচালনাধীন। অতএব শিক্ষাপরিচালনায় সরকারের তিনটি স্তর আছে—(১) ফেডারেল সরকার, (২) রাষ্ট্র ও (৩) স্থানীয় পরিচালন কেন্দ্র। এরা প্রত্যেকেই আর্থিক সাহায্য দেয়। স্কুলের জন্য (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ফেডারেল সরকার দেয় শতকরা মাত্র ২ ভাগ, রাষ্ট্র সরকার শতকরা ৪৩ ভাগ আর বাকী ৫৫ ভাগ স্থানীয়। সাধারণের উচ্চ শিক্ষার জন্য অবশ্য ফেডারেল সরকাব বেশী খরচ করে (শতকরা প্রায় ১১ ভাগ), রাষ্ট্র সরকার দেয় শতকরা ৪০ ভাগ, বাকী ৪৯ ভাগ আসে ছাত্র বেতন ও প্রতিষ্ঠানের অন্য আয় হতে। স্কুল শিক্ষার জন্য বার্ষিক সরকারী ব্যয় ৬০০ কোটি ডলার এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় ২০০ কোটি ডলার অর্থাৎ সর্বমোট ৮০০ কোটি ডলার (৩৮০০ কোটি টাকা। ১ ডলার=৪ টাকা ১২ আনা)।

স্কুল শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। সকল শিশুকেই নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত একটি সরকারী বা সরকারী স্কুলের সম মান বিশিষ্ট বে-সরকারী স্কুলে পড়তে যেতেই হবে। অধিকাংশ রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক স্কুল-শিক্ষার সময় ৭ হতে ১৬ বৎসর। যে বয়সে স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক তা ৬ হতে ৮ পর্যন্ত। ৩৩টি রাষ্ট্রে ৯ বৎসর স্কুলে পড়া আবশ্যক। ১৯৫০ সালে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫১ লক্ষ আর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছিল ২৫ লক্ষ। অতএব আমেরিকায় প্রতি ছয়জন লোকের মধ্যে একজন স্কুলে পড়ে, কিন্তু ব্রিটেনে প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা, স্কুলের ছাত্রসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ, কিন্তু ব্রিটেনে এই অনুপাত শতকরা মাত্র ১.২। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার অনুপাত পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্তমানে সরকারী এবং বেসরকারী দু'রকম স্কুলেই ১৪ থেকে ১৭ বৎসরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ১৯০০ সালে এরূপ ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ আর ১৯৫০ সালে হয়েছে ৬০ লক্ষ,—অর্থাৎ সমস্ত দেশের উক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী।

১২ বৎসর কাল স্কুল শিক্ষার পর ১৭ কি ১৮ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ ছাত্ররা তাদের স্কুলশিক্ষা বা স্কুল উপাধি কোর্স শেষ করে। তিন প্রকারের স্কুলই সাধারণতঃ

চালু—(১) ছয় বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা, তারপর জুনিয়ার হাইস্কুলে তিন বৎসর ও সিনিয়ার হাই স্কুলে তিন বৎসর। একে বলা হয় ৬-৩-৩ প্ল্যান, (২) আট বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা, তারপর হাই স্কুলে চার বৎসর। একে বলা হয় ৮-৪ প্ল্যান। (৩) প্রাথমিক স্কুলে ছয় বৎসর ও তারপর জুনিয়ার সিনিয়ার দুই ভাগ না করে হাইস্কুলে ছয় বৎসর। একে বলা হয় ৬-৬ প্ল্যান। এই তিন প্রকারের মধ্যে ৬-৩-৩ সর্বাধিক চালু, আর ৬-৬ সবচেয়ে কম।

কোন কোন গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলের সমস্ত বা অধিকাংশ বর্গ একজন শিক্ষক এক-কোঠাবিশিষ্ট স্কুলে পড়ান। কতকগুলি গ্রামের মিলিত স্কুলে বা শহরের স্কুলে এক বর্গের ছাত্রদের এক কামরায় এক শিক্ষক পড়ান। একজন শিক্ষক কতসংখ্যক ছাত্র পড়াবেন তা কিছু নির্দিষ্ট নেই বরং বিভিন্ন স্কুলে তারতম্য খুবই বেশী। তবে ক্রমেই একজন শিক্ষক পিছু ছাত্রসংখ্যা ২৫-৩০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিক স্কুলের কার্যক্রমের মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু সমরূপতা নেই।

শিশুরা পড়া, লেখা ও গণনা (অঙ্ক) শেখে। তারা আমেরিকার ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান পড়ে। গান, শিল্প ও সৃষ্টিধর্মী অন্যান্য কাজ শিক্ষার সুযোগও কিছুটা পায়। এদের পৃথিবীর ইতিহাসে অবশ্য ভারতবর্ষের স্থান খুবই কম বা নেই বললেও চলে।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলেই এক একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফলদৃষ্টে স্বাস্থ্য ভাল করার উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ, শারীরিক ব্যায়ামচর্চা এবং প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে। স্কুল কাফেখানায় সুষম মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রে ও শহরে ছাত্রদের বিনা পয়সায় পাঠ্য পুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং যেখানে এখনও তা হয়নি, করার চেষ্টা চলছে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত না হলেও ছয় বৎসরের নীচের শিশুদের জন্য "কিণ্ডারগার্টেন" খুবই জনপ্রিয়। জনশিক্ষার ইতিহাসে বর্তমানে "কিণ্ডার-গার্টেন"-এ ছাত্র ভর্তি সর্বাধিক। সরকারী স্কুলের কিণ্ডারগার্টেন বিভাগে ছাত্র-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ এবং বেসরকারী কিণ্ডারগার্টেন-এ পাঁচ লক্ষ। (কিণ্ডারগার্টেন জার্মান শব্দ, এর অর্থ 'শিশুদের বাগান' অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা।) কিণ্ডারগার্টেন-এ যাওয়ার পূর্বে ৪-৫ বৎসরের শিশুদের জন্য নার্শারী স্কুল আছে—কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা মোটেই সর্বজনীন হয়নি এখনো।

পাঠাগারগুলি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপোষক অংশ। স্কুলগুলিতে প্রায় ২৮ হাজার কেন্দ্রীয় পাঠাগার আছে এবং বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরী শিক্ষা সরকারী স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। এর উদ্দেশ্য জনসাধারণকে দরকারী কাজে নিয়োগের জন্য প্রস্তুত করা। কৃষি—কারিগরী শিক্ষা সমস্ত জাতির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম, কৃষি বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা।

১৭ই জুন মোফিট-এর সংগে নিউইয়র্কে একটি কারিগরী স্কুল দেখতে গেলাম। এই স্কুলটির নাম "মেশিন মেটাল ট্রেডস স্কুল।" জুনিয়ার হাই স্কুলের পড়া শেষ করে যারা এখানে ভর্তি হয়েছে তাদের তিন বৎসর কাজ করতে হবে। তখন প্রায় ১৪০০ ছাত্র ছিল। তারা অক্সি-এসিটিলিন ও বৈদ্যুতিক আর্ক আলোর সাহায্যে ধাতব পদার্থ জোড়া দেওয়ার কাজ, ড্রিলিং বা ধাতব পদার্থে ছিদ্র ইত্যাদি কাজ. লেদের কাজ, ড্রয়িং ও নক্সা তৈরীর কাজ প্রভৃতি শিখছে। শিক্ষকদের সংগে ব্যবহারে ছাত্ররা সংকোচহীন। বেশ ভাল রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানাগার রয়েছে। নিউইয়র্ক শহরে ৩২টি কারিগরী বিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এ সমস্ত স্কুলের জন্য বার্ষিক খরচ প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার বা ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

বিপথগামী বা অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েদের জন্যও স্কুল রয়েছে। ১৮ই জুন নিউইয়র্কের একটি সরকারী স্কুল ৬১২ ম্যানহাটান দেখতে যাই। মিস বেটি রবিনসন আমাকে নিয়ে যায়। বেটি সম্প্রতি স্নাতক হয়েছে—বেশ মেধাবী ও বিনয়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই স্কুলে ৩৬০ জন ছাত্র ও ১৭ জন শিক্ষক। শিক্ষিকারা প্রায় মায়ের মত যত্ন নেয় এই ছাত্রদের। এদের বাড়ীর সংগেও যোগাযোগ রাখে। না বললে ধারণাই করতে পারতাম না যে, এই ছাত্রদের মধ্যে চোর, মানসিক অপূর্ণতাসম্পন্ন ও যৌন বিপথগামী ছেলে রয়েছে। আমার বিশ্বাস ছেলেদের অনেক উন্নতি হয়েছে। এদের মধ্যে নিগ্রোদের সংখ্যা বেশ। এখানে আমাকে নিউইয়র্কের শ্লাম বা বস্তির অস্তিত্বের কথা বলা হল। একজন খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ও স্নেহপ্রবণ শিক্ষক বলছিলেন যে, বংশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরাধপ্রবণ স্বভাবের জন্য দায়ী। স্কুল ছেড়ে যাবার পর এদের সম্বন্ধে খবর রাখবার কোন ব্যবস্থা নেই। শীঘ্রই স্কুলের উপাধিদান অনুষ্ঠান হবার কথা। সেদিন ছাত্রদের অভিনয় ইত্যাদির মহড়া দেওয়া হচ্ছিল। মধুরস্বভাবা প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সৌজন্যপূর্ণ অনুরোধে আমি উপস্থিত থাকি। ছাত্ররা বেশ সুন্দর অভিনয় ইত্যাদি করল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সে হচ্ছে অতিমাত্রায় আমেরিকাত্ব।

স্কুলের শিক্ষা ছাড়াও আমেরিকাবাসী নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা রেখেছে। হাজার হাজার পাঠাগার, শিক্ষা ও গবেষণার জন্য দাতব্য-সংস্থা, এবং যাদুঘর প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়েছে এ জন্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১১·৭ কোটি ডলার খরচ করে। ৫ কোটি লোক বৎসরে যাদুঘর দেখতে যায়। পাবলিক লাইব্রেরী হতে বই নেয় এরূপ লোকের রেজিষ্ট্রীকৃত সংখ্যা ২½ কোটি এবং বৎসরে এরা ৫০ কোটি

বই নেয় পড়বার জন্য।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষক-বেতনের তারতম্য খুবই। ৪৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২৮টি রাষ্ট্রে নিম্নতম বেতন-আইন আছে। অধিকাংশ আইনে স্নাতক শিক্ষক, কাজের প্রারম্ভে বার্ষিক ১৮০০—২৪০০ ডলার বেতন পান। এ'দের মধ্যে ১০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যাঁরা সাধারণতঃ তাঁরা পান. বার্ষিক ৩২০০-৪০০০ ডলার। বেশ সংখ্যক বড় বড় স্কুল এর চেয়ে অনেক বেশী প্রারম্ভিক ও সর্বোচ্চ বেতন দেয়। যাদের স্নাতকোত্তর উপাধি বা "মাষ্টার ডিগ্রী" আছে তারা বৎসরে আরো ২০০-৪০০ ডলার বেশী বেতন পান। বড় সহরের স্কুলের ও কলেজের সুপারিণ্টেনডেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টরা বৎসরে ১০,০০০ কলেজের সুপারিণ্টেনডেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টরা বৎসরে ১০,০০০-২৫,০০০ ডলার পান। শিক্ষকদের নিজেদের সংঘ আছে। আমেরিকার শিক্ষকদের ফেডারেশন শ্রমিক ইউনিয়ন হিসাবে সংগঠিত এবং শ্রমিক ফেডারেশনের অন্তর্গত সংস্থা। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বেশী মহিলা।

বিপুল অর্থব্যয় এবং সকলকে উ'চুদরের শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চল, শহর ও গ্রামের স্কুল এবং শ্বেতজাতি ও নিগ্রোদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের অসাম্য বর্তমান। ধনী শহর ও রাষ্ট্র গড়ের চেয়ে অনেক বেশী খরচ করে, আর দরিদ্র সম্প্রদায় অতি কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা রাখে।

পিতামাতা ও শিক্ষাবিদগণ দেশের শিক্ষার বর্তমান অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট নন। সকল ছেলে-মেয়ের জন্য সমভাবে উৎকৃষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা দাবী করে আন্দোলন করছেন তাঁরা। তাঁদের দাবী (১) শিক্ষকদের উ'চু মান, (২) শিক্ষকদের এ কাজে আকৃষ্ট করার ও ধরে রাখার জন্য অধিক বেতন, (৩) গ্রাম অঞ্চলে মিলিত স্কুল এবং আরো নানাবিধ উন্নতিমূলক কাজ।

১২ বৎসর স্কুল শিক্ষার পর উচ্চশিক্ষা আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চ শিক্ষা দেয়।

সমস্ত দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮৫৭টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই সহ-শিক্ষা প্রচলিত। ২২৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে শুধু পুরুষদের জন্য, ২৬৮টি রয়েছে শুধু মেয়েদের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহে নিগ্রো ও শ্বেতকায় ছাত্রদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান বর্তমান।

উচ্চশিক্ষায় ছাত্র ভর্তি করার দুটি পদ্ধতি;—প্রথমতঃ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক স্কুলে রক্ষিত ছাত্রের নানাবিষয়ের ফলাফল এবং শিক্ষকদের মতামত ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ছাত্র ভর্তি করে, আর দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা করে ছাত্র ভর্তি করে।

চার বৎসর স্নাতকপূর্ব শিক্ষালাভের পর সাধারণতঃ যে উপাধি দেওয়া হয় তা "ব্যাচেলর অব আর্টস" অথবা "ব্যাচেলর অব সায়েন্স।" চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম উপাধি হল "ডক্টর অব মেডিসিন" এবং এজন্য তিন বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার

প্রয়োজন। স্কুলের পড়া সমাপ্ত করার পর ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রথম ডিগ্রী পাওয়ার জন্য চার বা পাঁচ বৎসর ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক পাঠ দরকার।

ব্যাচেলর ডিগ্রীর পর প্রথম উপাধি 'মাষ্টার'। ব্যাচেলর ডিগ্রী পাওয়ার পর সাধারণতঃ এজন্য এক বৎসর পড়তে হয়। 'ডক্টর অব ফিলসফি' হল সর্বোচ্চ উপাধি: এর জন্য স্নাতকের পরে অন্তত পক্ষে আরও তিন বৎসর কাল পড়তে হয়। কোন একটি সারবান গবেষণা পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা ও প্রকাশ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে মোটামুটিভাবে তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—(১) সরকারী ও (২) বেসরকারী কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান-গুলির এক-তৃতীয়াংশ প্রথম শ্রেণীর আর দুই-তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের এক বৃহৎ অংশ কোন না কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক পরিমাণে ছাত্র-বেতনের উপর নির্ভর করে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এখানে ছাত্র-বেতনের হার বেশী। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণতঃ বদান্য ব্যক্তিদের তহবিল আছে।

উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মুখ্যতঃ আত্মনিয়ন্ত্রিত। এ জন্যই মান ঠিক রাখার জন্য ব্যবস্থার দরকার। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষিত মান ঠিক রাখতে পেরেছে তাদের তালিকা প্রণয়নের জন্য সরকারের সাথে সম্পর্কহীন প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রও তাদের সীমার মধ্যে অবস্থিত ঠিক ঠিক মানরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা রাখে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের ভার একটি বোর্ডের হাতে ন্যস্ত। এই বোর্ড—"বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ" নামে অভিহিত। সরকারী প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের সভ্যগণ সাধারণতঃ ষ্টেটের গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হন। কোন ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সেই সম্প্রদায় বোর্ড নিযুক্ত করে। বোর্ডের সভ্যগণ বিনা বেতনে কাজ করেন। এই সভ্যপদ অতি সম্মানের বলে গণ্য করা হয়, এবং একজনের সেবাকার্যের পুরস্কার স্বরূপেই এ সম্মান দেওয়া হয়। ট্রাষ্টিগণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচন করেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট বা চ্যান্সেলার নামে অভিহিত হন। এ পদের মর্যাদা প্রচুর।

নিজেদের অর্থাভাব, বাইরের সাহায্য ও বৃত্তি পাওয়ার অক্ষমতার দরুণ ধনী আমেরিকায়ও বহু সংখ্যক মেধাবী যুবক কলেজে পড়তে পারে না।

স্কুল এবং কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। যে দেশে ইউরোপের নানা দেশ থেকে নরনারী এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে সেখানে এক ভাষার মাধ্যমে ঐক্য বা একজাতীয়ত্ব স্থাপনের মস্ত বড় সহায়ক।

শিক্ষা বিভাগ দেখার পর কয়েকজন খ্যাতনামা ভারতীয় ও আমেরিকাবাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল শ্রী মেহতার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। মিঃ হ্যারিমানের পাশেই বসেছিলাম আমি। রাজনীতি নিয়ে আমাদের আলোচনা হল।

গত সভাপতি নির্বাচনের সময় তিনি কেন যে দল পরিবর্তন করেছিলেন তা বললেন। আগে তিনি একজন ডেমোক্র্যাট ছিলেন, এখন তিনি রিপাব্লিকান মতবাদী। এঁর সঙ্গে আলাপে আনন্দ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে মাপ চেয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে যেতে হল। কারণ নিউইয়র্ক হতে স্বামী নিখিলানন্দ ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছিলেন; এবং মিঃ ও মিসেস চার্লস, টি. নীল স্বামিজী ও আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গর্ডনসভিলে (ভার্জিনিয়া) হতে এসে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারেই মিসেস নীলের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি অতি মধুর মাতৃসুলভ হৃদয়সম্পন্ন মহিলা। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

পথে গর্ডনসভিলের নিকটে মিঃ নীল আমাদের এক কৃষকের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এই কৃষকের ৭৩টি দুধালো গরু আছে এবং সে সময় তারা দৈনিক ২২০ গ্যালন (১ গ্যালন=৫ সের) দুধ দিচ্ছিল। বাছুর ও দুটি ষাঁড়সহ মোট জানোয়ার সংখ্যা ছিল ১৫২টি। কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। ১০০ একর গোচারণ ভূমি রয়েছে। নীল পরিবারের বাসস্থান রকল্যাণ্ডে পৌঁছলাম বিকালে। সবুজ প্রকৃতির মাঝে খুব মনোরম স্থানে বাড়ীটি অবস্থিত। এত সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল আমি আর কোথাও দেখিনি। এমন কি মাউণ্ট ভার্ণনের ফুলও এমন সুন্দর নয়। বদান্য প্রকৃতির মাঝখানে বাস করে এই পরিবার উদার এবং স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের অধিকারী হয়েছে। কথাচ্ছলে তাঁদের ছেলে স্যামী জানতে পারে যে, ভারতে প্রতি-দিনই আমার মিষ্টি জলের মাছ খাওয়ার অভ্যাস। তাই তার এক পায়ে প্লাষ্টার থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে নিয়ে মোটর চালিয়ে গিয়ে এক মিষ্টি জলের হ্রদ থেকে আমার জন্য মাছ ধরে নিয়ে এল! এ আমি কখনও ভুলতে পারব না। কিন্তু এই কিছুদিন আগেও শুনলাম তার পায়ে স্বাভাবিক অবস্থা তখনো ফিরে আসেনি। কষ্ট পেলাম শুনে। ভগবান তাকে শীঘ্রই সুস্থ করে দিন। মিসেস নীলকে একবার বলি, গরমকালে গর্ডনসভিলে বেশ গরম, প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশের মতই। এরূপ আবহাওয়ায় ভারতীয় পোশাকই বেশী আরামদায়ক। একদিন বিকালে মিসেস নীল খুব চুপচাপ করে এসে বললেন, যদি সান্ধ্য ভোজনের সময় আমি ভারতীয় পোশাকে যাই তবে তাঁরা সকলেই খুশী হবেন। আমি সে অনুরোধ রাখি এবং তাঁরা সকলেই আনন্দিত হন।

আড়াই দিন গর্ডনসভিলে ছিলাম। এরই মধ্যে অনেক কিছুই দেখি এবং শিখি। শারলটসভিলে (ভার্জিনিয়া) বিশ্ববিদ্যালয়, জেফারসনের বাড়ী মণ্টিসেলো, বিখ্যাত লুরে গুহা, একটি ডিম ফুটাবার কারখানা, একটি গবেষণামূলক-সরকারী কৃষি ফার্ম, একটি খরগোস পালন কেন্দ্র, একটি হাসপাতাল, মিঃ নীলের খামার ইত্যাদি দেখি। সে সঙ্গে একদিন "ব্লুরীজ" পর্বতে পিকনিক করতেও যাই। অতি ভারী কার্যক্রম সত্ত্বেও সাথীদের গুণেই আমি খুব সতেজ ও স্ফূর্তিতে ছিলাম।

৯ই জুন সকালবেলা। আমরা মিঃ নীলের কন্যা মার্গারেটের বাড়ী যাই। সে নিজের খামারে কাজ করে এবং তার মুরগী পালন ব্যবস্থা আছে। মাংসের জন্য মুরগী কাটা হয় না। ডিম ফুটালে প্রজননের জন্য যত প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী মোরগ জন্মে। অতিরিক্ত মোরগগুলি দু'মাস বয়স হলে কাটা হয়। তারপর 'রিফ্রিজারেটারে' ঠান্ডা অবস্থায় জমিয়ে রাখা হয়। দু'মাসের বেশী এদের পালন করা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ক্ষতিকর। এর পর আমরা মণ্টিসেলো যাই। এখানে আমেরিকার খ্যাতনামা সভাপতি টমাস জেফারসন বাস করতেন। পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, উন্নতমনা এবং স্থপতি ছিলেন তিনি। সভাপতি হিসাবে প্রারম্ভিক বক্তৃতায় জেফারসন ঘোষণা করেছিলেন—"সকল মানুষের প্রতি ন্যায় আচরণ, সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে অকপট বন্ধুত্ব, জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এরূপ মিত্রতা কারো সঙ্গেই নয়।" তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ সমেত সেখানকার সমস্ত জিনিসই দেখি শ্রদ্ধাসহকারে। তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্রই। জেফারসনকে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক বলা যেতে পারে। তাঁর বাড়ী হতে শারলটস্ভিলে সেই বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। মোটা-মুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি ঘুরে দেখার পর রসায়নাগার দেখতে যাই। যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এই রসায়নাগার। অধ্যাপকগণ অতিশয় যত্ন ও আগ্রহসহকারে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন আমাকে। ওখান থেকে আমরা বনভোজনের জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৪৫০০ ফুট উঁচু 'ব্লু-রীজ' পর্বতে যাই। মিঃ ও মিসেস নীল, তাঁদের পুত্রবধূ, মেয়ে ও জামাই, স্বামী নিখিলানন্দ ও আমি মিলেই হল বনভোজনের দল। বনভোজনের পরিকল্পনার জন্য নীল পরিবারকে সমস্ত অন্তরের ধন্যবাদ। এতে কল্পনা শক্তির প্রকাশ রয়েছে। এ মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সে অঞ্চলে উৎপন্ন একটি বড় তরমুজও রাখা হয়েছিল প্রকৃতির ঘাস বিছানো মেঝের উপর। বনভোজন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছি আমি। ভোজনের পর মিঃ ও মিসেস নীল এবং তাঁদের পুত্রবধূ বিদায় নিলেন। বাকীরা সকলে মিলে বিখ্যাত লুরে গুহা দেখতে যাই। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গুহা এটি এবং শারলটসভিল হতে ৬৫ মাইল দূরে ভার্জিনিয়ার সেনানডোয়া উপত্যকায় অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ এ্যানড্রু ক্যাম্পবেল দু'জন সহকর্মীর সহযোগিতায় এ গুহা আবিষ্কার করেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসীম ধৈর্য সহকারে কাজ করে প্রকৃতি একে গড়ে তুলেছে। লতা, গুল্ম, গাছপালা, ঘাস গজিয়ে জলে কিছু অম্ল তৈরী হয়, সেই অম্ল মিশ্রিত জল আস্তে আস্তে চুনা পাথরের উপর গড়িয়ে এমন সুন্দর জিনিস সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ উপাদান হতে এই সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কি অপরূপ সৃষ্টি! অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রায় পৌনে দু' মাইল এ গুহার বিস্তৃতি : প্রতি পদক্ষেপে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রকৃতির বিশাল ও মহীয়ান সৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও কাল্পনিক সৌন্দর্যের ধারণাতীত অভিব্যক্তি। প্রচুর আলঙ্কারিক সৌন্দর্য, শিল্পীর সৃষ্টিকে হার মানায়। অনুভব করলাম যেন স্বপ্ন-

রাজ্যে—পরীর দেশে উপস্থিত হয়েছি। বড় বড় ঘরের মধ্যে দেখা যায় বিশাল অথচ সুন্দর নানা রঙয়ে চিত্রিত স্তর সংহতি! অনেকগুলি ঘর লম্বায় প্রায় ৫০০ ফুট এবং তাদের ছাদের উচ্চতা ১৪০ ফুট। এ গুহা দেখতে দেখতে এই প্রকৃতির তৈরী শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা করছিলাম মানুষের দুটি সুনিপুণ শিল্পসৃষ্টির—অজন্তার চিত্রাবলী ও এলোরার পাহাড় কেটে তৈরী মন্দির। এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে মানুষের মধ্যে যিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি তার চেয়েও বড় শিল্পী। যখন প্রথম অজন্তা গুহা দেখি এবং পরিদর্শক বইতে মতামত লিখতে অনুরুদ্ধ হই তখন স্বতঃই এই কথা কয়টি আমার কলম দিয়ে বেরিয়েছিল—"ভারতবর্ষে জন্মাবার সৌভাগ্য যার হয়েছে তার অজন্তা দেখা একান্ত দরকার নইলে তাকে পুনর্জন্ম নিতেই হবে।" লুরে গুহাতে গিয়েও আমার সেই অনুভূতিই মনে জাগল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময় এ গুহা দেখতে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। গুহার অভ্যন্তরে অনেক জায়গায় পাথরগুলি হাতে স্পর্শ না করার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু খুব কম লোকেই তা মানছে। নিজেকে অভিনন্দন জানাই এ জন্য যে, আমি সে লোভ সংবরণ করতে পেরেছিলাম। তা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না।

অরেঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে দুইটি দরজা, একটি শ্বেতকায় ও অপরটি নিগ্রোদের জন্য। একটি খৃষ্টান ও গণতান্ত্রিক দেশে শ্বেতকায়-শ্রেষ্ঠত্বের এরূপ উৎকট অভিব্যক্তি বড়ই বেদনাদায়ক। আমাদের বিদায় দেবার জন্য মিঃ ও মিসেস নীল ষ্টেশনে এসেছিলেন। বিদায়ক্ষণটি ব্যথার অনুভূতিতে ভরেছিল।

নিউইয়র্ক যাবার পথে কয়েকঘণ্টার জন্য ওয়াশিংটন যাই। ডাঃ নৃপেন লাহিড়ী (এম. আই. টি হতে প্রাণরসায়ণে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত) আমার পুরাতন এক সহকর্মীর ছোট ভাই। মধ্যাহ্ন ভোজনে তার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সে ষ্টেশনে এসেছিল। ভারতের ট্যারিফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ. এল. দে ও শ্রীমতী দে নিমন্ত্রিত ছিলেন। ডাঃ অমিয় দাশগুপ্তও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইনি আমার এক সহপাঠীর ছোট ভাই। দূরপ্রান্তে এ সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দই হল। আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করলাম এঁদের কাছ থেকে।

এর পরের সাত দিন, অর্থাৎ আমেরিকা ত্যাগ করে হল্যান্ড রওনা হবার দিন (১৯শে জুন) পর্যন্ত আমি নিউইয়র্ক ও আশেপাশের দর্শনীয় বস্তু ইত্যাদি দেখে ও বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে কাটাই। শ্রীমতী কোকাটনুর একজন আমেরিকান মহিলা। আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় রসায়নী ডাঃ কোকাটনুরের স্ত্রী তিনি। কুমারী বেটি রবিনসনের মত তিনিও আমার গাইড ছিলেন। সকলের পরামর্শক্রমেই বাস, টিউব রেলে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি যাতে আমেরিকার জীবনধারার সর্বাঙ্গীন রূপটি আমার চোখে পড়ে। অবশ্য বহুদূরের পথে সেভাবে যাইনি।

১৬ই, সন্ধ্যায় স্বামী পবিত্রানন্দের অনুরোধে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারে মহাত্মা

গান্ধী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেই। সমস্ত হলটি দর্শকে একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল আমি যা বলেছিলাম সংক্ষেপে তা এই ঃ মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁকে বলা যেতে পারে একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি বলতেন,—"ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত এমন কি গাছের একটি পাতাও পড়ে না।' ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার পর প্রথম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি সাধারণতঃ রাজনীতি বলতে যা বুঝায় সে সম্বন্ধে তিনি আমাকে উপদেশ দেননি। আমাকে তিনি উপনিষদের জীবন যাপন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'যখন প্রথম উপনিষদ পড়ি দেখতে পাই যে আমি সেই উপনিষদের জীবনই যাপন করছি। সে জীবনই যাপন কর।' তাঁর শক্তির উৎস ছিল ভগবানে বিশ্বাস ঃ ভারতীয় কৃষ্টির ঝরণাধারা থেকেই তিনি আকণ্ঠ বারি পান করেছিলেন। রাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেখানেই নিহিত ছিল তাঁর শক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অস্ত্র ছিল 'সত্য ও অহিংসা'। অনেকে বলেন অহিংসা শব্দটি বাদ দিলে সাম্যবাদ এবং গান্ধীবাদে কোন পার্থক্য থাকে না। একথা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ অহিংসা বাদ দিলে গান্ধীবাদের কিছুই থাকে না। যদি কোন একটি শব্দ থাকে যা গান্ধীবাদের রূপকে যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারে,—তা হল "অহিংসা"। অহিংসা শব্দের অর্থ সকলের প্রতি ভালবাসা। ভালবাসায় রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক কোন প্রকারের শোষণের স্থান নেই। সেজন্য তিনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। দেশকে শুধু বিদেশী শাসনমুক্ত করতে চাননি সকল প্রকারের অন্যায়—আর্থিক ও সামাজিক, দূর করতে চেয়েছিলেন তিনি। অস্পৃশ্যতা বর্জনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তাঁর মতে অস্পৃশ্যতা হিংসার নামান্তর মাত্র, আর হিন্দুধর্মের কলঙ্কস্বরূপ তা। তাঁর চরখা ছিল জনগণের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রতীক। তাঁর ১৯২১ সালের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিত ছিল—হিন্দু মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হাতে কাটা সূতায় হাতে বোনা কাপড় বা খদ্দর ব্যবহার এবং সূতাকাটার জ্ঞান। কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ছিল এই যে, প্রতিজ্ঞাপত্র সুরু হয়,—"ভগবানের নাম নিয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি,"—এই ক'টি কথা দিয়ে। এর মর্মার্থ পুরাপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি আমরা সেদিন। এখন বুঝতে পারছি তা। অহিংস মানুষের শক্তির উৎস একমাত্র ভগবানে বিশ্বাস।

অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস এত প্রগাঢ় ছিল যে যদি ঈপ্সিত ফললাভ না হত, অহিংসার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে তিনি তার কারণ বলে ব্যাখ্যা করতেন না। বরং নিজের অপূর্ণতাই তার কারণ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন প্রকৃতপক্ষে আমি একজন দোষত্রুটিপূর্ণ অহিংসার পূজারী। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর নোয়াখালি যাবার পথে তিনি আমাকে পতঞ্জলীর একটি সূত্র উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলেন—

"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" যার মনে অহিংসা সুপ্রতিষ্ঠিত

তার কাছে এলে বৈরভাব দূর হয়ে যায়। সেই আদর্শ অবস্থায় তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা—তিনি সেই সভ্যতার খাঁটি সৃষ্টি। তাঁর অহিংসায় কাপুরুষতার কোন স্থান ছিল না। এ অহিংসা ছিল সাহসী ব্যক্তির জন্য।

উপসংহারে বলি—গান্ধীপন্থা অনুসরণ করে চললে ভারত আবার স্ব-স্থান ফিরে পাবে।

বক্তৃতা সকলেরই ভাল লেগেছিল। স্বামী পবিত্রানন্দেরও মনোমত হয়েছিল খুব।

সুধীর ঘোষও অল্পকথায় মহাত্মা গান্ধীর কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে। আমেরিকা থাকাকালীন তিনবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের ও ভারতের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়। সে ব্যাপারে আমেরিকা ও ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধেও কথাবার্তা হয়। তাতে আনন্দ পেয়েছি। সুধীরের প্রতি আমার একটা স্নেহভাব আছে। কারণ মহাত্মাগান্ধী একদিন আমাকে বলেছিলেন, "তোমাকে ও সতীশবাবুকে যেরূপ বিশ্বাস করি সুধীরকেও ঠিক তেমনি।"

একটি কারিগরী এবং একটি অপরাধপ্রবণ শিশুদের বিদ্যায়তন দেখার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শ্রীমতী কোকাটনুর নিউ জার্সির রহাওয়েতে স্থিত মার্কের রাসায়নিক কারখানা দেখাবার ব্যবস্থা করেন। শুধু গবেষণাগারটি আমাদের দেখান হয়। কিন্তু যেখানে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন হয় সে বিভাগ দেখবার অনুমতি দেওয়া হলো না। এ ব্যবস্থার কথা আগে জানা থাকলে আমি সেখানে যেতাম না।

স্প্রিং উপত্যকায় ডাঃ ফাইফারের গবেষণাগারও দেখতে যাই। এখানে ব্যাক্টিরিয়ার (জীবাণুর) সাহায্যে তাড়াতাড়ি বিভিন্ন প্রকারের জৈব পদার্থকে সারে পরিণত করার গবেষণা হচ্ছে। কাজ হচ্ছে ভালই কিন্তু ব্যবসার জন্য গোপন রাখা হচ্ছে।

শ্রীমতী কোকাটনুর আমাকে কয়েকটি দোকান দেখাতে নিয়ে গেলেন। "ম্যাসী"র দোকান একটি ছোটখাট শহর। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই সেখানে পাওয়া যায়। একতলা থেকে অন্যতলায় যাবার জন্য বিদ্যুৎচালিত চলন্ত সিঁড়ি (এসকেলেটর) আছে। সাততলা পর্যন্ত আমি গিয়েছিলাম। ৫ ও ১০ সেন্টের দোকান দেখার মত। আগে এ দোকানে শুধু ১০ সেন্ট পর্যন্ত দামের জিনিসপত্র বিক্রী হত। এখন অবশ্য বেশী দামী জিনিসও বিক্রী হয়।

শহরের চীনাদের বাসের অঞ্চল, একটি যাদুঘর এবং আরো কয়েকটি অঞ্চল, বেটির সঙ্গে ঘুরে দেখি।

নিউইয়র্ক শহর লন্ডনের চেয়ে পরিষ্কার। অবশ্য আরও পরিচ্ছন্ন হতে পারত। সবচেয়ে বড় অসুবিধা মোটর রাখবার স্থানাভাব। আমেরিকার কোথাও এমন কি গ্রামাঞ্চলেও আমি বাইসাইকেল দেখিনি। ব্রিটেনে বহু লোককে বাইকে

চড়ে যেতে দেখেছি। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মোটর আছে,—সমস্ত পৃথিবীর ৩/৪ অংশ। কিন্তু প্রাচুর্যেরও অসুবিধা আছে। এক আমেরিকান মহিলা আমাকে বলেছিলেন,—"মোটর গাড়ী আমাদের পারিবারিক জীবন নষ্ট করেছে। আমার স্বামীর একখানা গাড়ী—অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি নিজের গাড়ীতে যান বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমি আমার গাড়ীতে যাই আমার বন্ধুদের কাছে। ছেলের বন্ধুর কাছে ছেলে যায় নিজের গাড়ীতে এবং মেয়েরও ঠিক সে অবস্থা। সান্ধ্য ভোজনের সময় আমরা একসঙ্গে মিলি বটে, তবে তাও সব দিন নয়। কারণ কারো না কারো নিমন্ত্রণ থাকেই বন্ধুর বাড়ীতে।"

আমেরিকায় জীবন ধারণের মান উঁচু। বেতনের হারও তেমনি। এরও অসুবিধা আছে। নিউইয়র্কে সারাদিনে ডাক বিলি হয় মাত্র একবার। অবশ্য ডাকঘর হতে দিনে তিনবার নেওয়া যেতে পারে। বেতনের হার উঁচু হওয়াতে ডাক বিলি করা সম্ভবপর নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন ভারতে শ্রীবিনোবাভাবে সম্বন্ধে একটি খবর বের হয় "নিউইয়র্ক টাইমস-এ"। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চিনি কিনা অনেকে সে প্রশ্ন আমায় করেন। তাঁর সম্বন্ধে সকল কথা জানতে চান তারা এবং এ আন্দোলনের তাৎপর্যও বুঝতে চান। তাদের যা বলি তার সার হল এই;—"আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানি। তাঁর শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল, কিন্তু তিনি গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মহাত্মা গান্ধীর তিনি যোগ্য শিষ্য, এবং তাঁরই মত একই ভারতীয় সভ্যতার উৎসধারাসিক্ত তিনি। গান্ধীজীর মত তাঁরও নির্ভরতা ভগবদ্ বিশ্বাসের উপর। তাই বিনোবাকেও ভারতের গ্রামের নিরক্ষর লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে পারে। এ আন্দোলন ভারতবর্ষের ভূমি-সমস্যার শ্রেষ্ঠ এবং অহিংস সমাধানের প্রকৃত পথ। এর মধ্যে অনেক শক্তি লুক্কায়িত এবং যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তবে ভারতের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। সাধারণভাবে দেখলে এই আন্দোলন রাজনৈতিক নয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ খুব উঁচুস্তরের রাজনৈতিক আন্দোলন। শুধু সামাজিক নয়, ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এর ফলে।"

আমার ধারণা আমেরিকাবাসী সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়। কিন্তু সুদৃঢ়ভাবে কমিউনিষ্ট বিরোধী মনোভাব রয়েছে। সেনেটর ম্যাকার্থী এ মনোভাবের গোঁড়া প্রতিনিধি। আমি দেখেছি একদল লোক তাঁর কথাকে খুবই গুরুত্ব দেন। কিন্তু মনে হল আমেরিকার জনগণের বৃহৎ অংশ তাঁর পেছনে নেই। যদি তিনি সমস্ত লোকের হৃদয় জয় করতে পারেন, সেদিন আমেরিকা ও গণতন্ত্রের পক্ষে অশুভই হবে।

সকল প্রকারের জাগতিক সুখ-সুবিধা সত্ত্বেও নিউইয়র্কের অধিকাংশ লোকের চেহারাই আনন্দোজ্জ্বল নয়। বরং তাদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমেরিকাবাসীও বুঝতে পারছে যে শুধু জাগতিক সুখে সত্যিকারের শান্তি নেই। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই দুয়ের পরিপূর্ণ মিলনেই আসবে সে শান্তি। আমেরিকার আধ্যাত্মিক

পিপাসাও কিছুটা জেগেছে। একদিন তা বিরাট আকার ধারণ করতে পারে।

খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করছি যে আমেরিকার ঐশ্বর্য নয়, হল্যান্ড ও লিংকলন টানেলের মত কৃতিত্বপূর্ণ কাজ অথবা মোটর চলাচলের "হাইওয়েজ"ও নয়—আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং তাদের নিকটতর করেছে আমেরিকাবাসীদের সাদাসিদে ঘরোয়া ভাব। আমেরিকার হৃদয় সুস্থ ও সবল—এ আমি অনুভব করেছি।

১৯শে জুন। নিউইয়র্ক ছেড়ে হল্যান্ডের পথে যাত্রা করি।

তৃতীয় অধ্যায়

হল্যাণ্ড

আবার 'ভিন্ডাম' জাহাজে। আগের মত আমিই একমাত্র ভারতীয় যাত্রী। অবশ্য এবার আমেরিকাবাসী ছিল অনেক। হাওয়াই দ্বীপের এক তরুণী প্রথম আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসে। বাঙ্গালী অধ্যাপক ডাঃ সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত সম্বন্ধে ভাষণ শুনে সে মুগ্ধ হয়েছিল।

আমেরিকাবাসী পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই বেশ ঘরোয়াভাবাপন্ন ছিল। তাদের অনেকেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল, যেন আমি তাদেরই একজন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের বহু প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হয়েছিল। কলেজের ছাত্র এবং যুবক শিক্ষকরাই ছিল বিশেষ কৌতূহলী। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মিস্ ভেসলী পিয়ারসোল, তার স্নেহময়ী মা এবং কাকা ওহাইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লারভিল,—আমার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা হল। ভেসলী ত প্রায় আমার মেয়ের মত হয়ে দাঁড়াল; তার সরলতা, শান্ত অথচ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, অতি ভদ্র ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তা এবং সর্বোপরি অন্তরের উদারতা তাকে আমার স্নেহের পাত্রী করে তুলেছিল। তার মাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—পুরানো কালের কোন এক শান্তশ্রী কৃষ্টিসম্পন্না ও ধর্মপরায়ণা বাঙালী মহিলা। মেয়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট টান। সম্ভবতঃ স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি শুধু এই একমাত্র সন্তানের যত্ন ইত্যাদির জন্য। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ভেসলী তার মায়ের স্নেহের যোগ্য প্রমাণিত হবে। অধ্যাপক লারভিল সমাহিত, চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। খুব কম কথাই তাঁকে বলতে শুনেছি। প্রায়ই আমরা দুজনে একসঙ্গে বেড়াতাম। অধ্যাপক হাল্‌ম্‌ এবং তাঁর পরিবারবর্গও আমার প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

খাবার টেবিলে আমার সঙ্গী ছিল তিনজন। একজন মাতৃভাবাপন্ন জার্মান মহিলা,—ইনি আমেরিকায় ১৬ মাস থেকে নিজের দেশ হামবুর্গে ফিরে যাচ্ছেন, একজন বেলজিয়ামবাসী—গেঁটে বাতের ফলে শারীরিক অক্ষমতা থাকলেও বেশ হাসিখুশী ও রসিক এবং তৃতীয় জন হলেন, ৭৫ বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ লোক—ইনি নিজেকে জার্মান-অষ্ট্রীয়ান বলতেন। জার্মান মহিলাটি ষোল মাস আমেরিকায় থাকার পরও ইংরেজী বলতে পারতেন না। শুধু 'ইয়েস' অথবা 'নো'—এই দু'টি কথা বলতে পারতেন। আমেরিকা তাঁর কেমন লেগেছে জিজ্ঞাসা করি। জবাব দিলেন জার্মান ভাষায়,—"আমেরিকা একটি সুন্দর দেশ, কিন্তু নিজের দেশ নিজের দেশই।" বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একেবারেই জল পান করতেন না। মদই ছিল তাঁর প্রিয় পানীয়। জলকে বলতেন, 'গ্যানসে ভাইন' অর্থাৎ, হাঁসের মদ,—একমাত্র

পাখীদের পক্ষেই পান করা সম্ভব—কোন মানুষের নয়। যাত্রা আনন্দপূর্ণই হয়েছিল।

উত্তর সাগর হতে যখন জাহাজ চ্যানেলে প্রবেশ করে তখন দু'পাশেই হল্যাণ্ডের যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা ছবির মত সুন্দর। ষ্টীমার হতে দেখা পূর্ববাংলার বরিশালের কয়েকটি অঞ্চলের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের কথা মনে জাগল। অবশ্য হল্যাণ্ডে কোন নারিকেল গাছ নেই।

৩০শে জুন অপরাহ্নে রটারডাম্ পৌঁছি। এখন বোমার ধ্বংসের চিহ্ন তেমনটি নেই। যদিও এখনো কোন কোন অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয়নি।

রটারডাম হতে মোটরে হেগে পৌঁছি। সেখানে ভারতীয় রাজদূত শ্রী বি, এন, চক্রবর্তীর অতিথি আমি। মোটরে যাওয়ার সময় ঝকঝকে রাস্তাঘাট ও সুন্দর গোলাপ ফুল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু সংখ্যক মেয়ে ও পুরুষকে রাস্তায় বাইসাইকেলে যেতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম এদেশ আমেরিকা এমন কি ব্রিটেন থেকেও সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দেশ। এপ্রিলের প্রথম দিকে তুলনা-মূলক শিক্ষা বিষয়ক ভ্রমণ সমাপ্ত করে হল্যাণ্ড থেকে ফিরে যাবার সময় সাধনা আমার জন্য লণ্ডনে যে সুন্দর 'টিউলিপস্' ফুল নিয়ে গিয়েছিল তা দেখতে পেলাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে টিউলিপস্-এর মরসুম শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হেগে পৌঁছানমাত্রই কলকাতার এক চিঠিতে জানতে পারলাম যে, অন্তরীণ অবস্থায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু ঘটেছে। ইনি একজন রাজনৈতিক নেতা! অন্তরীণ অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটেছে এ সংবাদ শুনলে সংস্কারবশতঃই আমার মনে শাসকগোষ্ঠীর উপর একটা বিরূপ ভাব জেগে ওঠে। আরও প্রবল হয় সে ভাব যদি তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। যখন খুবই পীড়িত হলেন তখন কি ডাঃ মুখার্জিকে মুক্তি দেওয়া যেত না এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনকেও খবর দিয়ে ডাক্তারসহ তাঁর সেবার জন্য আসতে বলা যেত না। এই কথাই আমার মনে এল প্রথম।

৫ই জুলাই সকাল পর্যন্ত আমার কার্যক্রম স্থির করেন শ্রী চক্রবর্তী। অবশ্য অনেক পূর্বেই আমি কি কি দেখতে চাই তা তাঁকে জানিয়েছিলাম। স্কুলগুলি বন্ধ ছিল এবং ডাঃ বেণ্ডা-র মত শিক্ষাবিদও দেশে ছিলেন না। আমি অবশ্য ডেলফ্ট্-এর টেকনিক্যাল হাই স্কুল ও লাইডেনের কেমারলিঙ্ ওনেস বিজ্ঞানাগার দেখতে পেয়েছিলাম। শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরে গিয়ে হল্যাণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক বেশী সুযোগ পেয়েছিল সাধনা। সে কয়েকটি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছিল এবং ডাচ শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনারও সুযোগ হয়েছিল তার। অতএব হল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে যা লেখা হয়েছে তাতে তার দানই সমধিক।

১লা জুলাই সকালবেলা প্রথম দেখতে যাই "মরিসঠুইচ মিউজিয়াম।" বাড়ীটি

এমন সুন্দরভাবে বসান ও তৈরী হয়েছে যে আর্ট গ্যালারীর ইমারত হিসাবে এর তুলনা খুব কমই মিলে। কাচ ছাড়াই ছবি ঝুলান রয়েছে। রেমব্রাণ্ট, ফ্যানডাইক ও রুবেন্স্-এর মনোরম চিত্রগুলি সেখানে রাখা হয়েছে। ডাচ্ মনের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যবোধের অকৃত্রিম প্রকাশ হয়েছে এ সব ছবিতে। হল্যাণ্ডের কয়েকজন উঁচু-দরের শিল্পীর অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। সেখান থেকে যাই "প্যানোরামা মেজ্ডাগ্" দেখতে। এটি শিল্পী মেজডাগের একটি চমৎকার চিত্র। এত স্বাভাবিক! মনে হল যেন সত্যিকারের জিনিস দেখছি। অবর্ণনীয়কে বর্ণনা করার চেষ্টা আমি করব না।

অপরাহ্ণে হেগের অদূরে মিঃ ভোয়ারদেনের খামার দেখতে যাই। এই খামারে জমির পরিমাণ ২৫ হেক্টর বা ৬০ একর। তার মধ্যে ১০ হেক্টর ঘাসের জমি। ১৮টি দুধালো গরু আছে সেখানে। তখন তারা দৈনিক ৩৫০ লিটার (প্রায় দশ মণ) দুধ দিচ্ছিল। কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা রয়েছে বলে সেখানে কোন ষাঁড় নেই। দুধ দোয়ার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। মিঃ ভোয়ারদেন সমেত মোট চার-জন লোক খামারের সমস্ত কাজ করে। প্রতি একরে গম উৎপন্ন হয় ৪০০০ পাউণ্ড, আলু ২০,০০০ পাউণ্ড। আর হেক্টর প্রতি চিনিবিট উৎপন্ন হয় ৫০ টন। সমস্ত খরচ-খরচা বাদে নিট আয় হয় বৎসরে ১২ হাজার গুলডেন অর্থাৎ ১৫ হাজার টাকা। অতএব একর পিছু নিট লাভ দাঁড়ায় বার্ষিক ২০০ গুলডেন বা ২৫০ টাকা।

মিঃ ফ্যান ডি কোপ্পেল্ আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সব দেখাতে। তিনি মিঃ ভোয়ারদেন ও আমার ছবি তুললেন কয়েকটা দুধালো গরুর সঙ্গে। খামার দেখে ফিরে আসবার পর মিসেস ভোয়ারদেন আমাদের চা খেতে অনুরোধ জানালেন। চা খেতে খেতে একটি ডাচ কৃষক পরিবারের সৌন্দর্য ও রুচিবোধের পরিচয় পেলাম। চা-এর পর মিসেস ভোয়ারদেন আমার সঙ্গে ফটো তুলতে চাইলেন। আমার হাতের নীচে হাত দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। মিঃ কোপ্পেল যখন ফটো তুলতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় মিঃ ও মিসেস ভোয়ারদেনের এক তরুণী কন্যা ছুটে এল এবং কিছু না বলেই সরল শিশুর মত আমার আর এক হাতের নীচে তার হাত গলিয়ে দিল। এ রকম জিনিস সম্ভবতঃ হল্যাণ্ড তথা ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ভারতবর্ষে এ জিনিস কল্পনাতীত। তাদের আর এক কন্যা ঘোড়ায় চড়ায় কৃতিত্বের জন্য যে সব মেডেল পেয়েছে মিঃ ভোয়ারদেন তা খুব গর্বের সঙ্গে আমায় দেখালেন।

পরদিন সকালে মিঃ কোপ্পেল আমাকে আলসমীয়ারে ফুলের বাজারে নিয়ে গেলেন। পথে রাস্তার দু' পাশ চমৎকার সবুজ। বাজারে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল ছিল। খুব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফুল নীলামের কাজ সম্পন্ন হয়। হাওয়াই জাহাজে করেও ফুল দেশের বাইরে পাঠান হয়। কিন্তু বাজারে দেখলাম ফুল মোড়াবার কাগজের টুকরা ইতস্ততঃ ছড়ান। পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের সঙ্গে

এ বড়ই বেমানান মনে হল। মিঃ কোপেল-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এদিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন তা।

ফুলের বাজার থেকে আমরা হার্লেমারমিয়ারে একটি খামার দেখতে যাই। খামারটি মিঃ কিস্টেনমাকের-এর। ইনি জনসেবার কাজে আগ্রহশীল এবং একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বলেই মনে হল। খামারে জমির পরিমাণ ৫০ হেক্টর। গম, যব, চিনি-বিট, আলু, মটর চাষ হয়। পরিবারে খাওয়ার জন্য অন্যান্য তরিতরকারীও উৎপন্ন করা হয়। পরিবারের প্রয়োজনে মুরগী ও ভেড়া পালন করা হয়। গরু আছে মাত্র চারটে। জমি উদ্ধারের পর ১৮৫২ সালে যখন প্রথম কাজ সুরু হয় তখন এ জমি উর্বর ছিল না। কিন্তু এখন উহা অতি উৎকৃষ্ট জমি। এবং সমস্ত জমিতে বৎসরে বিশ হাজার কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম=২·২ পাউন্ড) ফসফেট, সমপরিমাণ ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট আর ১৫ হাজার কিলো পটাস সার হিসাবে দেওয়া হয়। এই সারের সর্বমোট মূল্য ৭ হাজার গুলডেন। মিঃ কিস্টেন-মাকের বৎসরে ১৫ থেকে ২০ হাজার গুল্ডেন লাভ করেন।

আলস্মিয়ার-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে ফুল উৎপাদনের জন্য অনেক কৃত্রিম উপায়ে গরম করে রাখা ঘর দেখলাম। সাড়া হল্যান্ডের বহু স্থানে ফুল ও সব্জী উৎপাদনের জন্য এরূপ ঘর আছে।

বিকালবেলা সেভিনিংগেনের বিখ্যাত উত্তর সাগর সৈকত দেখতে যাই। যারা সেখানে যায় তাদের সুবিধার জন্য চমৎকার সব হোটেল আছে। কিন্তু ভারতের পুরী ও মাদ্রাজের সমুদ্রতীর যে এর চেয়ে অনেক ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুরীর সৌন্দর্য অনেক বেশী মহিমাময়। যখনই পুরী যাই প্রতি দিন সমুদ্র-স্নানের লোভ সংবরণ করতে পারি না কিন্তু এখানে সেরূপ কোন ইচ্ছাই হল না।

৩রা জুলাই সকালবেলা লাইডেনের বিখ্যাত ক্যামারলিঙ ওনেস বিজ্ঞানাগার দেখতে যাই। এই বিজ্ঞানগার হিম-তাপ ও চুম্বকত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিখ্যাত। সর্বপ্রথম ক্যামারলিঙ ওনেস হিলিয়াম গ্যাসকে তরল পদার্থে পরিণত করে। এক সময় তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন এখানে—ওনেস, ট্সিমান ও লোরেনট্স। যে যন্ত্রের সাহায্যে হিলিয়াম তরল করা হয় তা দেখলাম। বর্তমানে তরল করার যন্ত্র আরো উন্নত। এখানে তরল বায়ু তৈরীর দুটি যন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি ঘণ্টায় ৩০ লিটার করে তৈরী করে। এই বিজ্ঞানাগার অন্য সব বিজ্ঞানাগারকে বার আনা লিটার দরে তরল বায়ু সরবরাহ করে। তরল হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেনও সরবরাহ হয়।

ডিরেক্টর বেতন পান বার্ষিক তের হাজার গুলডেন বা ১৬,২৫০ টাকা। অপরাহ্ণে ডেল্ফট্ টেকনিক্যাল হাই স্কুল দেখে আনন্দ পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এই স্কুলের। সাধারণ স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ছাত্ররা এখানে আসে। বাছাই করে তাদের ভর্তি করা হয়। কোর্স পাঁচ বৎসরের, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করতে ছাত্রদের

সাধারণতঃ ছয় হতে সাত বৎসর পর্যন্ত লাগে। মোট ছাত্রসংখ্যা পাঁচ হাজার। এখানকার কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগটি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখি। এ বিভাগে ছাত্রসংখ্যা প্রায় আট শ এবং বার্ষিক খরচ ৫½ লক্ষ গুলডেন। অধ্যাপকের বেতন বার্ষিক তের হাজার গুলডেন—ক্যামারলিং ওনেস বিজ্ঞানাগারের ডিরেক্টরের সমান।

এ বিভাগে দুটি প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে—(১) চিনি-বীট হতে সালফার ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে চিনি নিষ্কাশনের পদ্ধতি আরো উন্নত ও ব্যাপক করার মাঝারি আকারে পরীক্ষা, (২) উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট কেরোসিনকে তার চেয়ে নীচু স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট গ্যাসোলিনে পরিণত করা। পরদিন সকালে শিক্ষামন্ত্রী-দপ্তরে যাই। ডাঃ ফ্যানলিণ্ডেন হল্যাণ্ডের শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য আমাকে দেন। এখানে সংক্ষেপে হল্যাণ্ডের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রাসঙ্গিকই হবে।

হল্যাণ্ডে শিক্ষা ৮ বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক কিন্তু অবৈতনিক নয়। ৭ বৎসর বয়স থেকেই শিক্ষার বাধ্যতামূলক অধ্যায়ের সুরু হয়। কিন্তু প্রায়ই ছাত্রেরা তার চেয়েও অনেক আগে ছয় কি সাড়ে ছয় বৎসর বয়সে স্কুলে নাম লেখায়।

১৫ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা তার চালাতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ৮ বছর শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এতেও স্কুল উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়,—শিক্ষা বাড়ীতে বসেও চলতে পারে। অবশ্য সাধারণতঃ ১০০ ছাত্রের বেশী এ সুযোগের ব্যবহার করে না। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্কুল ছাড়া অন্য সব স্কুলেই সহশিক্ষা। পাব্লিক স্কুল আছে এবং সাম্প্রদায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আছে। সাম্প্রদায়-গত শিক্ষায়তনগুলি অবৈতনিক। পাব্লিক স্কুলে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয় পিতামাতার আয়ের উপর নির্ভর করে। তিন থেকে ছয় বৎসরের শিশুদের জন্য নার্সারী স্কুল ও ইনফ্যাণ্ট বা শিশু শিক্ষায়তন আছে।

এক কোটী অধিবাসীর মধ্যে সব মিলিয়ে মোট ২০ লক্ষের অল্প কিছু বেশী সংখ্যক ছাত্র আছে স্কুলে। অতএব দেশে প্রতি ৫ জনে একজন স্কুলে যায় অথচ ইংল্যাণ্ডে ৭ জনে একজন এবং আমেরিকার প্রতি ছয় জনে একজন ছাত্র স্কুলে যায়। এ ভাবে দেখা যায় ব্রিটেন ও আমেরিকার চেয়েও হল্যাণ্ডে শতকরা অধিক সংখ্যক শিশু স্কুলে পড়ে। হল্যাণ্ডে শিক্ষা অবৈতনিক না হওয়া সত্ত্বেও এ অবস্থা। এতেই প্রমাণিত হয় ডাচ জাতির কতখানি আগ্রহ রয়েছে শিক্ষা ব্যাপারে। নার্সারি এবং শিশু-শিক্ষায়তনের ছাত্রসংখ্যা থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঐ বয়সের শিশু এ ধরণের স্কুলে পড়ে। কয়েকটি বড় শহরে এর শতকরা হার অনেক উঁচু, প্রায় শতকরা ৮০ জন। ১৯৫০ সালে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার এরূপ ছাত্র স্কুলে পড়ত, এর মধ্যে ২৬৭০০০ ছিল ফ্রি স্কুলে। এ শিক্ষা পরিচালনার জন্য কোন আইন নেই।

নার্সারী এবং শিশু-শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের সকলেই স্ত্রীলোক। প্রাথমিক

শিক্ষার সঙ্গেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুলগুলিতে ৬-৭ অথবা ৮ বছরের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। পড়া, লিখা এবং অংক ছাত্রদের শেখানো হয়। এ ছাড়া ডাচভাষা, ডাচ্ ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গান, নাচ, শরীর চর্চা এবং সূচী-শিল্প ইত্যাদি শেখানো হয়। সমস্ত বিষয়গুলিই বাধ্যতামূলক।

তিন প্রকারের প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল রয়েছে। (১) প্রাথমিক, (২) চলতিমান প্রাথমিক ও (৩) উচ্চমান প্রাথমিক স্কুল। সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর পরেও দু'বছর পাঠ নেবার ব্যবস্থা আছে চলতিমান প্রাথমিক স্কুলে। এ ধরণের স্কুলগুলি প্রায়ই প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যারা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে না এবং যারা বাধ্যতামূলক ৮ বৎসর শিক্ষাকাল সমাপ্ত করেন এ সমস্ত স্কুল তাদেরই জন্য।

উচ্চমান বা অগ্রসর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার কাল তিন থেকে চার বছর। সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে ছয় বছর শিক্ষা লাভ করার পর এতে যোগ দিতে হয়। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্ততঃ তিনটি পড়তে হয়—ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষা, গণিতশাস্ত্র এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা। এ সকল ছাত্রের অধিকাংশই একটি প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়। অবশ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে এ পরীক্ষা হয়।

যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল রাষ্ট্র এবং মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় অবস্থিত তাহাদের বলা হয় পাবলিক স্কুল। যে সমস্ত স্কুল কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত তাদের বলা হয় ফ্রি স্কুল। এখানে ডাচ শিক্ষা প্রণালীর একটি অসাধারণ দিকের কথা উল্লেখ করা সমীচীন হবে। এ বিশেষ ব্যবস্থার ফলেই ফ্রি স্কুলগুলি গড়ে উঠেছে। জনসাধারণের অর্থে "ফ্রি" এবং 'পাবলিক' ধরণের স্কুলের সমান অধিকার আছে। পাবলিক স্কুল ও ফ্রি স্কুল-এর পরিচালকমণ্ডলীকে সমানাহারে ছাত্রপিছু টাকা দেওয়া হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলের অনুমতি নিয়েই এ প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য এ কথার উল্লেখ না করলেও চলবে যে শিক্ষাদানের মান সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়ার উপর নির্ভর করে এই আর্থিক সাহায্য করা হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও ফ্রি স্কুলের শিক্ষা দানের স্বাধীনতা অক্ষত থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,২৪৩,৬৬৮। এদের মধ্যে শতকরা ৭৩ জন ফ্রি স্কুলের ছাত্র।

১৯২০ সালের আইন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুদের মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য হাতে-কলমে এবং সকল প্রকারের দরকারী বিষয়গুলি শিখাণ। এভাবে তাদের শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং খৃষ্টধর্মের ও সকল সামাজিক গুণাবলী শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য। ধর্মশিক্ষা স্কুলের শিক্ষকদের হাতে নয়, সে কাজের ভার পাদ্রীদের। ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ

দেবার জন্য পাদ্রীদের হাতে স্কুলের কামরা ছেড়ে দেওয়া হয়। এর জন্য কোন ভাড়া নেওয়া হয় না এবং স্কুলের নির্দিষ্ট কার্যসূচীর মধ্যেই পাদ্রীদের ধর্মশিক্ষা স্থান পায়। ফ্রি স্কুলগুলির অধিকাংশই ধর্ম সংস্থা পরিচালিত এবং শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪৩ জন স্ত্রীলোক। শিক্ষকতা পদের জন্য দরখাস্তকারীর সে বিষয়ের ডিগ্রী ও চরিত্রের প্রশংসাপত্র ইত্যাদি দরকার হয়। সেজন্য প্রত্যেক শিক্ষকই ট্রেনিং প্রাপ্ত। যাঁদের প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্রশংসাপত্র আছে একমাত্র তাঁরাই প্রধান শিক্ষক পদের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন।

সমান কাজ ও সমান যোগ্যতার জন্য স্ত্রী বা পুরুষ উভয় শিক্ষকই সমান বেতন পান।

যে সমস্ত শিশু শরীর ও মনে অপটু তাদের জন্য আলাদা স্কুল আছে। বর্তমানে হেগ মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত খোলা হাওয়ায় অবস্থিত একটি স্কুল সাধনা দেখেছিল। ফুসফুসে ব্যাধির জন্য যে সব শিশু সাধারণ স্কুলে পড়তে পারে না এ স্কুল তাদেরই জন্য। তবে মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার পরীক্ষা করে রোগমুক্ত বলে ঘোষণা করলেই ভর্তি করা হয়। স্কুলটি সমুদ্রের কাছে, বালিয়াড়ি ঘেরা—এক আদর্শ পরিবেশে, বিস্তীর্ণ জায়গায় স্থাপিত। শীত থেকে রক্ষার জন্য ভাল তক্তা বিছান জমি রয়েছে।

প্রতিদিন সকালবেলা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাসে অথবা বিশেষ রেল গাড়ীতে করে ১০৬ জন শিশু এখানে আসে। পরিজ (ওটসের তৈরী), রুটি এবং মাখন প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর প্রাতরাশ তাদের জন্য সেখানে তৈরী থাকে। স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান ব্যবহারিক শিক্ষার অংগ। প্রত্যেক শিশুকে একটি দন্তমার্জনী ও একখানা পরিষ্কার তোয়ালে দেওয়া হয়। শিশুরা যাতে সেগুলি ব্যবহার করে তা দেখা হয়। খেলাধুলোর প্রচুর সুবিধা রয়েছে। পড়া, লেখা, অঙ্ক সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের পাঠ খোলা জায়গায় বসে দেওয়া হয়। একমাত্র বৃষ্টির সময় ঘরে পড়াশুনার ব্যবস্থা। মনকে আকৃষ্ট করার নানা ব্যবস্থার মধ্যে সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার একটি। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে শহর থেকে ট্রাকে করে দুপুর বেলার জন্য গরম খাবার আনা হয়। খাওয়ার পর প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ বালিশ, কম্বল নিয়ে আসে এবং ছোট খাটিয়ার উপর বিছানা তৈরী করে আরাম করে। ২-২০ মিনিটে উঠে ব্যায়াম, সেলাই ও বাগানের কাজ ইত্যাদিতে লেগে যায়। বোটানিক্যাল গার্ডেন, সুন্দরভাবে আলোকিত মাছরাখার জায়গা, মৌমাছির চাক,—এ সব কোন দর্শকেরই দৃষ্টি এড়াতে পারে না। ধর্মশিক্ষাদান অন্য সব কিছুরই মত প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। বিকাল সাড়ে তিনটার সময় দিনের শেষ খাওয়া দেওয়া হয়।

হল্যাণ্ডবাসী তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কত বেশী চিন্তা-ভাবনা করে—স্কুলের এমন সুব্যবস্থা সে কথাই দৃষ্টি পথে এনে দেয়।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা সমাপ্তির পর ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণী থেকে কিছু সংখ্যক

ছাত্র মাধ্যমিক স্কুলে যায়। কয়েক রকমের মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে হল্যাণ্ডে—(১) খিমনাজিয়ুম বা গ্রামার স্কুল, (২) হোগে বুরগার স্কুল (এইচ, বি, এস) বা নাগরিকদের উচ্চ বিদ্যালয়, (৩) লাইসিয়াম ইত্যাদি। এখানকার কোর্স ৫ বা ৬ বৎসরের। বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষার বিশদ বিবরণ দেবার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু খিমনাজিয়ুমে একজন ছাত্রকে এতগুলি ভাষা শিখতে হয় যে দেখে অবাক হতে হয়। মাতৃভাষা ডাচ ছাড়াও তাকে শিখতে হয় গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষা। শিক্ষাব্যবস্থা অতি মাত্রায় কেতাবী এবং ছাত্রদের মস্তিষ্ক অতি-ভাবে পীড়িত।

প্রায় এক লক্ষ ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার বেলায় পাবলিক ও ফ্রি স্কুল সমভাবে সরকারী সাহায্য পায়। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলে সে নিয়ম প্রযোজ্য নয়। অবশ্য ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে। মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকদের শতকরা ২১ জন মাত্র মহিলা। প্রাথমিক স্কুলে সকল শিক্ষকই ট্রেনিং প্রাপ্ত,—কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার বেলায় তা নয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে অর্থাৎ আমেরিকার মত ১২ বৎসর স্কুল শিক্ষা শেষ করে ছাত্ররা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যায়।

হল্যাণ্ডে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়। তার মধ্যে লাইডেন, ইউট্রেক্ট এবং গ্রোনিংগ্যেন রাষ্ট্র পরিচালিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও সমমর্যাদাবিশিষ্ট চারটি স্কুল আছে। তার মধ্যে ডেল্ফ্টের ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল এবং ভাগেনিংগ্যেনের কৃষি-বিদ্যালয় সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ কিন্তু তফাৎ এই যে, এখানকার শিক্ষা এক সত্বার অংশবিশিষ্ট, কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১৯৫০-৫১ সালে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ২৮ হাজার,—এর শতকরা মাত্র ২১ জন মহিলা। ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষি ও অর্থনীতিতে ছাত্রী সংখ্যা মাত্র শতকরা ২·২ ভাগ। সাধারণতঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিভাগ আছে ঃ—ধর্মতত্ত্ব, আইন, সাহিত্য ও দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগ আছে সরকার তার খরচের শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থ সাহায্য করে। সে সঙ্গে যদি চিকিৎসা, অঙ্ক এবং পদার্থ বিজ্ঞানের একটি বিভাগ যুক্ত থাকে তবে শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ সাহায্য করা হয়। আর যদি শেষোক্ত দুটি বিভাগই থাকে তবে সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

সমস্ত বিভাগেই অন্ততঃ দুটি পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। প্রথম পরীক্ষার ফলে 'ক্যান্ডিডেট' উপাধি দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পরীক্ষার উপাধি হল 'ডক্টরেন্ডাস'। এজন্য সাধারণতঃ ছয় বৎসর সময়ের দরকার হয়। 'ডক্টরেন্ডাস' উপাধি পাবার পর সমর্থনযোগ্য মৌলিক গবেষণা করে ছাত্র 'ডক্টর' উপাধি পায়।

হল্যাণ্ডে কোন আবাসিক কলেজ নেই। হল্যাণ্ডে মাত্র ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বৃত্তি পায়, ব্রিটেনে এর হার শতকরা ৭২। অতএব হল্যাণ্ডের অধিকাংশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রই ধনী পরিবারের।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ভার ৫ জন হতে ৭ জন কিউরেটার দ্বারা গঠিত একটি বোর্ড-এর হাতে। সাধারণতঃ এ'রা সকলেই সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বোর্ডের একজন সম্পাদক থাকেন। রাষ্ট্র-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড নিযুক্ত করেন রাণী। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক পরিমাণে শিল্প-মন্ত্রীর উপর নির্ভর-শীল। এখানকার অধ্যাপকগণ বিভিন্ন বিভাগের পরামর্শক্রমে রাণী কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমস্ত অধ্যাপক মিলে গঠিত হয় "একাডেমিক কাউন্সিল"। অধ্যাপকদের বেতন বার্ষিক ১০,০০০ হতে ১৩,০০০ হাজার গুলডেন।

বর্তমানে বার্ষিক সরকারী শিক্ষাব্যয় প্রায় ৫০ কোটি গুলডেন। শিক্ষা-মন্ত্রীর কৃষি-শিক্ষার উপর কোন হাত নেই। উহা কৃষি-খাদ্য ও মৎস্য-মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন।

হল্যাণ্ডের কর্মীদের শতকরা ২০ জন কৃষিকাজে নিযুক্ত। সে জন্য কৃষি-শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। ভাগেনিংগ্যেনের কৃষি-বিদ্যালয় তার নিদর্শন। এখানে প্রায় এক হাজার ছাত্র পড়ে। শিক্ষাকাল পাঁচ হতে ছয় বৎসর। স্নাতকদের "ল্যাণ্ডব্যউকুণ্ডিখ ইনখেনিউর" বা ভূমি-বিশেষজ্ঞ উপাধি দেওয়া হয়।

১৯৫০ সালে দেশ জুড়ে ২২৭টি প্রাথমিক কৃষি ও ফল, তরকারি চাষ বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ১৬ হাজার ৫ শত জন।

৫ই ভোরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ হেগে আসেন। এখানেও তাঁর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য আলাপের আনন্দ পেয়েছিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ব্লুয়েমেনডাল রওনা হই। সেখানে মিঃ হ্যারি বয়সভাঁ নামক এক ডাচ ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হই। ৮ই অপরাহ্ন পর্যন্ত আমার কার্যক্রম স্থির করেন তিনি। 'ব্লুয়েমেনডাল' শব্দটির অর্থ ফুলের উপত্যকা। স্থানটির যোগ্য নামই বটে। মিঃ বয়সভাঁও এই মনোরম স্থানের উপযুক্ত অধিবাসী। এ'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। এ পরিচিতির ফলে আমি একটি কৃষ্টিসম্পন্ন ডাচ পরিবারের সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলাম। মিসেস বয়সভাঁ শারীরিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। এতে আমি কম কুণ্ঠিত হইনি। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁকে।

পশ্চিমে আসার পর এখানেই প্রথম স্থানীয় এক হোটেল থেকে সুন্দর সূর্যাস্ত দেখি। মিঃ বয়সভাঁ দু'জন শিক্ষাবিদকে চা ও সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন যাতে ডাচ শিক্ষার সব দিক সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। সান্ধ্য ভোজনের পর হেঁটে বেড়াতে যাই। প্রকৃতি এবং মানুষের হাতে তৈরী এমন নয়নমনোহর সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে চলতে মন আনন্দে ভরে উঠল।

পরদিন সকালবেলা। মিঃ বয়সভাঁ আমাকে লিউভারদেনে নিয়ে গেলেন। ব্রুয়েমেনডাল হতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত এই শহর ফ্রিজল্যাণ্ডের রাজধানী। পথে আমরা প্রথম 'উত্তর সাগর ক্যানাল' পার হই। তারপর পনিরের জন্য বিখ্যাত শহর আলকামারের উপর দিয়ে গিয়ে নূতন তৈরী 'জাইভারজী' বাঁধ পার হই। গাড়ী থামিয়ে বাঁধ দেখি। এ বাঁধ ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন। এই বাঁধের ফলে সমুদ্র হতে প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি উদ্ধার হয়েছে। যাবার সময় বাঁধের দক্ষিণ ধারে অবস্থিত সাগরের অংশকে বর্তমানে বলা হয় 'আইসেলমিয়ার'। এটি এখন মিষ্টি জলের হ্রদে পরিণত হয়েছে এবং মিষ্টি জলের মাছ জন্মাচ্ছে এতে।

লিউভারদেনে প্রবেশ করেই দেখি চমৎকার গোলাপফুলে চারদিক ভরে আছে। এর পর ফ্রিজিয়ান মিউজিয়াম দেখতে যাই। ফ্রিজিয়ানদের শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক এটি। যাদুঘরের একটি সুন্দর বাক্য আমাকে বড় আকৃষ্ট করে। ঐ একটি বাক্যই হল্যাণ্ডবাসীর জীবনদর্শনকে রূপ দিয়েছে। বাক্যটি হল—"ভগবান পাখীর জন্য খাবার প্রস্তুত রেখেছেন, কিন্তু সেজন্য তাকে উড়তে হবে।"

আগেকার দিনে ফ্রিজ মহিলারা নানারূপ কারুকার্যশোভিত রঙ-বেরঙয়ের পোশাক পরতেন। এখন অবশ্য সে পোশাক শুধু যাদুঘরেই দেখতে পাওয়া যায়।

ফ্রিজদের নিজেদের ভাষা ফ্রিজিয়ান। এই প্রদেশে ফ্রিজিয়ানকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য আন্দোলন চলছে। প্রাথমিক স্কুলে একটা স্তর পর্যন্ত এ ভাষা মাধ্যম হয়ে গেছে এর মধ্যেই।

আমরা ফিরে আসছিলাম আমষ্টারডমের শহরতলী দিয়ে। মিঃ বয়সভাঁ কতকগুলি বাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এ সব বাড়ীতে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকেরা বাস করে এবং মাসিক ভাড়া ৩০ থেকে ৬০ গুলডেনের মধ্যে। যদি সম্ভব হয় তবে একখানা বাড়ী দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁকে গাড়ী থামাতে অনুরোধ করলাম, তিনি গাড়ী থামিয়ে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। ভদ্রলোকটি খুশী মনে তাঁর বাড়ী দেখবার অনুমতি দিলেন। এই বাড়ীতে একতলা ও দোতলা মিলিয়ে ৩ খানা শোবার ঘর, ২ খানা বসবার ঘর, ২টি পায়খানা, একটি স্নানের ঘর, একটি রান্নাঘর এবং বাড়ীর পেছনে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান ও বাইসাইকেল রাখার জন্য ছোট্ট একখানা ঘর। মাসিক ভাড়া ৬০ গুলডেন। গ্যাস ও ইলেকট্রিকের খরচা মাসে ২০ গুলডেন পর্যন্ত। ঐ রকম একখানা বাড়ী কলকাতায় ২৫০ টাকা (২০০ গুল্ডেন) ভাড়ায় পাওয়া যায় না।

বাস্তবিকই অতি উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ হল এ ভ্রমণ। চারদিকের সবুজ, চমৎকার গোলাপফুল এবং শাদা-কাল মেশান রঙয়ের সুন্দর গরু মাঠে,—এমন দৃশ্য কখনো ভোলা যাবে না।

৭ই সকাল। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল শিক্ষানবীশদের ট্রেণিং স্কুল দেখতে গেলাম। আইমুইডেন লোহার কারখানার সঙ্গে যুক্ত এটি। বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী ও মেসিন

চালক তৈরীর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাকাল ২ হতে ৩ বৎসর। প্রতি বৎসর ৫০ জন ছাত্র শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসে এবং লোহার কারখানায় কাজে নিযুক্ত হয়। ট্রেণিং নেবার সময় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তত্ত্বীয় বক্তৃতা শোনা এবং খেলা এর অঙ্গ। ঘণ্টা পিছু ৩০ থেকে ৫০ সেণ্ট (১০০ সেণ্ট—১ গুল্ডেন) পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

হল্যাণ্ডে লৌহ আকরিক নেই, থাকলেও অতি সামান্য পরিমাণে। লোহা বা ইস্পাত তৈরীর জন্য নরওয়ে ও সুইডেন হতে আকরিক আনা হয়।

আইমুইডেন হতে আমাকে হারলেমে ফ্রান্স হালস্ মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। নানা ধরণের চিত্র রয়েছে সেখানে। বাস্তবের সুষ্ঠু প্রকাশ হিসাবে এগুলি উচ্চপ্রশংসিত। অবশ্য ডাচ জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর নয় বলে এ সকল চিত্রের মাধুর্য ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি।

অপরাহ্নে আমরা 'হুকফ্যান হল্যাণ্ড' রওনা হই। যে জিলার ভিতর দিয়ে আমরা যাই, ফুলকন্দের জন্য সেটি বিখ্যাত। বৎসরে প্রায় ১২½ কোটি টাকা মূল্যের ফুল ও কন্দ উৎপন্ন হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাধনা সেদিনই লণ্ডন হতে এখানে এসে পেঁাছে। মিঃ বয়সভাঁ তাকেও অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন।

পরদিন সকালবেলা তিনি আমাদের আমষ্টারডম দেখাতে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট মোটর বোটে শহর পরিক্রমা করি। শহর দেখবার সুন্দর ব্যবস্থা। এর পর বিখ্যাত "রাইখস মিউজিয়াম" দেখতে যাই। দেখেই বুঝতে পারা যায় কত বড় শিল্পী এ জাত। ফুলের প্রতি অপরিসীম প্রীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রের দৃশ্য—তাদের সৃজন প্রতিভার সৃষ্টি করেছে। জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্পের পাশে রেমব্রাণ্টের অঙ্কিত চিত্র স্থান পাবার যোগ্য।

সুন্দর রোদ উঠেছে। দেখে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাইরে গিয়ে একটু হাটবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ছোট ছেলেরা বড়শী ফেলে মাছ ধরছিল। কতকগুলো ফটো নেওয়া হল। তারপর ব্লুয়েমেণ্ডাল ছেড়ে আসার সময় হল। মিঃ বয়সভাঁর অনুরোধে সাধনা পিয়ানো বাজিয়ে প্রথম একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও পরে ভারতের জাতীয় সংগীত গেয়ে শোনাল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আগেরবার যখন সে এদেশে আসে তখন নেদারল্যাণ্ড রেডিও তার গান রেকর্ড করে নেয় ব্রডকাষ্ট করার জন্য। মিঃ বয়সভাঁ ডাচ্ জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন। এ সব আনন্দ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর তিনি মোটর চালিয়ে আমাদের হেগে নিয়ে আসেন।

অতি উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মিঃ বয়সভাঁ। মানব প্রকৃতির একত্বে তিনি বিশ্বাস করেন। একমাত্র এ ধরণের ব্যক্তিরাই পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুস্বরূপ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আমি ভাগ্যবান যে, এরূপ লোকের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার

ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

এ ভাবে আমার আট দিনের প্রীতিপ্রদ হল্যাণ্ড ভ্রমণ শেষ হল। ছবির মত সাজান দেশ এটি। লোকজন সৌন্দর্যের উপাসক।

ফুল, বাইসাইকেল এবং বায়ুচালিত যন্ত্র,—এই এখানকার বিশেষত্ব। এত ফুল পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিনি। একটি বাড়ীও এমনকি একখানা নৌকা-বাড়ীও ফুল ছাড়া নেই। এক কোটি লোকের মধ্যে ৩০ লক্ষের উপর বাইসাইকেল। বায়ুচালিত যন্ত্রের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

ইউরোপের মধ্যে হল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রতিবর্গ কিলো-মিটারে লোকসংখ্যা ৩১৯ অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৮২৫। কিন্তু জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। কোন কোন অঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা দু-হাজারেরও উপর। কৃষকদের মধ্যে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এবং চাষের জমির স্বল্পতার জন্য শিল্প প্রসার ও দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ১৯৫১-৫২ সালে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত ১১ জন লোক দেশ ত্যাগ করে গিয়েছে। বেশী সংখ্যা (৪১ হাজারের কিছু কম) গিয়েছে ক্যানাডায়। দেশের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট কৃষি-জমি আছে। বেশী উৎপাদনের জন্য জমিতে সমস্ত বছর ধরেই ফসল উৎপাদন করা হয়। আমেরিকা এমন কি ব্রিটেনের মতও যন্ত্রচালিত নয় এখানকার কৃষি।

গম, যব ইত্যাদিতে এদেশ আত্মনির্ভরশীল নয়। কিন্তু আলু, শাক-সব্জি, ফল, মাখন, পনির, ডিম, শূকরের মাংস প্রভৃতি রপ্তানী করে। যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করা হয় তার মূল্যের চেয়ে রপ্তানী করা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক বেশী। গত একশ বছরের মধ্যে একর প্রতি আলুর উৎপাদন তিনগুণ বেড়েছে আর গমের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ। গাই পিছু গড়ে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৩৭৫'০ কিলোগ্রাম। জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণ তরিতরকারী, ফল, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, ডিম ইত্যাদি খায়, ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভাল। পৃথিবীর মধ্যে হল্যাণ্ডের লোকই দীর্ঘজীবী,—গড় আয়ু প্রায় ৬৮ বৎসর। এদেশ অবশ্য শিল্পে খুব উন্নত নয়। মোটরগাড়ী তৈরীর কোন কারখানা এখানে নেই। শুধু বিভিন্ন অংশ এনে জোড়া দেওয়ার কারখানা আছে।

হল্যাণ্ড এমন একটি দেশ যাকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

৯ই জুলাই সকাল—আমরা হল্যাণ্ড ছেড়ে পশ্চিম জার্মানী রওনা হই। আমাদের রাজদূতপত্নী শ্রীমতী চক্রবর্তী হেগে আমার সুখ-সুবিধার জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী চক্রবর্তীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিম জার্মানী

হেগ থেকে ট্রেণ ছাড়ল। নানারূপ ভাবনায় আমাদের মন আচ্ছন্ন। কেমন যেন এক ভয় ও উদ্বেগ মন ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের দুঃসাহসিক আকাঙ্ক্ষাও জড়িয়েছিল সে সঙ্গে। ব্রিটেন এবং হল্যাণ্ড—দুই জায়গাতেই জার্মানদের সম্বন্ধে নানা রকমের কথা শুনেছিলাম আমরা। এমন কি সাধনার কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু তাকে এখানে আসতে নিরুৎসাহ করেছিল। এ ছাড়াও ছিল ভাষাগত সমস্যা। জার্মান ভাষা সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছিল যে, সে জ্ঞান রেলওয়ে ট্রেণে কোন কাজে আসবে না। আমরা দু'জনেই ইংরেজী ভাষা জানি বলে দাবী করি। দু'জনেই ইংরেজ অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি। তা সত্ত্বেও ব্রিটেনে ট্রেণে রেলওয়ে কর্মচারীরা চীৎকার করে যা বলতেন বুঝতে পারতাম না বললেই চলে। তাই ভাবলাম জার্মান কর্মচারীরাও আমাদের কথা বুঝবেন না, আমরাও বুঝব না তাঁদের কথা। অতএব কি যে ঘটবে কে জানে। হল্যাণ্ডের সীমানা পেরিয়ে গাড়ী জার্মান প্রান্তে ঢোকার সঙ্গেই দু'জন লম্বা সুদর্শন মজবুত শরীর জার্মান শুল্ক বিভাগের কর্মচারী এলেন আমাদের কাছে। তাঁদের পরনে ছিল সবুজ পোশাক। বেশ সুন্দর ইংরেজী বললেন অনর্গলভাবে। আশ্চর্য রকম ভদ্র ব্যবহার তাঁদের। যথাযোগ্য কর্তব্য শেষ করার পর—হাসিমুখে বললেন,—"গুটে রাইজে"—আপনাদের যাত্রা শুভ হোক এই কামনা করি। সমুদ্রের তুষার গলে যায় গ্রীষ্মের পরশে,—আমাদের সমস্ত ভয় গলে গেল ঠিক তেমনি করে। অনুভব করলাম স্বাগত জানাচ্ছে জার্মানী আমাদের। পৃথিবীর অন্য কোথাও জার্মানদের মত শুল্ক-বিভাগের কর্মচারী দেখিনি।

গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী এবং হল্যাণ্ড পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে; তবুও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সীমান্ত পেরোতে যাত্রীদের যে হয়রাণী হয়, তার অর্ধেকও হয় না হল্যাণ্ড ও জার্মান সীমান্তে। যদিও দুই বাংলার শাসনপদে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল দুইটির মত নিয়েই দেশকে দু'ভাগ করা হয়েছিল।

যতই জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম ততই বেশী করে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা চোখে পড়ল। মানুষের নির্মম হাতের কার্যকলাপ দেখে উপলব্ধি করলাম যুদ্ধ কি জিনিস! এক এক সময় মনে হল চীৎকার করে বলি,—"নিষ্ঠুরতা, তোমারই নাম মানুষ!" ক্যোলনে আমরা নেমে গেলাম এবং মোটরে করে ভারতীয় দূত—শ্রীসুবিমল দত্তের আবাসে এলাম। আমাদের ইচ্ছানুযায়ী তিনি আমাদের পশ্চিম জার্মানীর কার্যসূচী ঠিক করে দেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের ঠিক পরেই আমরা শহর দেখতে বের হলাম। প্রথম দেখলাম ঠিক রাইন নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়ান বিখ্যাত ক্যোলন গির্জা।

এর অনেকখানিই বোমায় ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক ভাগ্যবিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে প্রায় ছয়শ' বছরে এই গির্জা তৈরী হয়। গির্জার উপর হতে সমস্ত শহর ও রাইন নদীর চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়।

১০ই জুলাই সকালবেলা আমরা বন্ বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সঙ্গে ছিল এক তরুণ জার্মান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ ভেরনার রিখটার-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি। জ্ঞানী লোক তিনি। হের হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি জার্মানী ত্যাগ করে ১২ বৎসর আমেরিকায় বাস করেন। সুন্দর ইংরেজী বলেন। তিনি বললেন—জার্মান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ যে, ছাত্রকে কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করার দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়। সে কথা মনে রেখে শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানদের প্রভাবের কথাও তিনি বললেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৭ হাজার ছাত্র। বোমায় গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এটি। পুনর্গঠনের জন্য এরই মধ্যে প্রায় ৫ কোটি মার্ক (১ মার্ক—একটাকা দু-আনা) ব্যয় করা হয়েছে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও ৫ কোটি মার্ক ব্যয়ের পরিকল্পনা আছে। ৭ হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র পাঁচশ' হোষ্টেলে থাকে। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বা কর্ণেলের মত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জার্মানীতে কখনই ছিল না। ছাত্ররা বরাবরই কোন ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে বা নিজেদের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করেছে।

এর পর ডাঃ হাস আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ সীগফ্রিড বেন আমাদের আকৃষ্ট করেন খুব। তিনি অতি জ্ঞানী এবং নিজের বিষয়ে সুপণ্ডিত। বয়সের দরুণ পক্ককেশ কিন্তু শিশুর মত সরল। শিশুর মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করার প্রণালী আমাদের দেখালেন, এ ছাড়া আমরা কলা-বিভাগও দেখি। জার্মানীর আধুনিক শিল্পীদের ছবি দেখলাম। জার্মান প্রতিভার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে তাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখা শেষ হলে তরুণ জার্মান যুবকটি কাছেই একটি রেস্তোরাঁয় আমাদের নিয়ে গেল মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। নাম উল্লেখ করতে না পারার জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইছি: তার নাম ও ঠিকানা লেখা নোট বইখানি দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়ে ফেলি। যুবকটি সরল, ভদ্র ও বয়স্থদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর সাহায্য করার জন্য সব সময়ে উদগ্রীব তো বটেই। অল্প খরচে আমরা সুন্দর খাওয়া পেলাম। গরম স্যুপ, মাছ, আলুসেদ্ধ, রুটি, স্যালাড্, গরম গলান মাখন এবং মিষ্টি পুডিং। সব মিলিয়ে খরচ হল মাথা-পিছু মাত্র দুই মার্ক। পশ্চিম জার্মানীর কোন রেস্তোরাঁয় এই আমাদের প্রথম খাওয়া। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ছিল রেস্তোরাঁটি।

খাওয়ার পর জার্মান যুবকটি আমাদের নিয়ে গেল এক সমিতিতে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ছাত্র অদল-বদল করাই এর কাজ। জার্মান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাই এখানে। আমেরিকার মত পশ্চিম জার্মানীর শিক্ষাও ফেডারেল সরকারের

পরিচালনাধীন নয়, রাষ্ট্র সরকারের। ১৯৫০-৫১ সালে স্কুল ছাত্র সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৭০ লক্ষ। ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্র ছিল বৃত্তি শিক্ষাদানকারী স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার। ১৪ বৎসরের পর ছাত্ররা "গিমনাজিয়ুম"-এ ভর্তি হয়। সেখানে জার্মান ভাষা ছাড়াও তারা তিনটি ভাষা শিখে। ইংরেজী, ফরাসী এবং গ্রীক বা ল্যাটিন। পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের বেতনের কোন তারতম্য নেই।

পরদিন সকালে আমরা জাহাজে রাইন নদী ভ্রমণে যাই। এবার আমাদের সংগী কেউ ছিল না। 'রাইনল্যান্ড' জাহাজের যাত্রীরা সকল রকমে আমাদের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে। কয়েকজন তরুণ অন্য একজন তরুণকে নিয়ে এল আমাদের সব কিছু ইংরেজীতে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ইংরেজী জ্ঞান তার নেহাৎ কম হওয়ায় তারা আবার নিয়ে এল একজন তরুণীকে। বেশ ভালভাবেই সে সব বুঝিয়ে দিল ইংরেজীতে।

ধ্বংসের চিহ্ন বর্তমান সত্ত্বেও রাইনের দুই তীরের দৃশ্য অতি মনোরম। সুন্দর আংগুরের ক্ষেত, আর ছাতার মত ছড়িয়ে ছাঁটাই করা লিণ্ডেন গাছ এক অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করেছে। আমরা "জিবেন গেবিরগে" বা সাতটি পর্বত দেখি। একে কেন্দ্র করে বহু রূপকথা রচিত হয়েছে। কলকাতার কাছের হুগলী নদীর মত চওড়া নয় রাইন নদী, কিন্তু রাইন খরস্রোতা। টেমস্ বা ক্লাইডের চেয়ে রাইন বহুগুণে সুন্দর। আমরা কোবলেণ্টস্-এ নেমে গেলাম। দেরীতে পেঁাছাল আমাদের জাহাজ। কাজেই যে জাহাজে ফেরার কথা ছিল আগেই সে চলে গিয়েছিল। এতে "শাপে বর হল" বলা যেতে পারে। আমরা কোবলেণ্টস্ শহর দেখবার সুযোগ পেলাম। রাইন ও মোজেল নদীর সংগমস্থলে এ শহর—ফরাসী অধিকৃত এলাকায়। এই বহু বিধ্বস্ত শহরের রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াই। যুদ্ধ বিরতির ৮ বৎসর পরেও বহু বাড়ীঘর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের পুনর্গঠন বা মেরামত এখনও করা হয়নি। ধ্বংসের কী-তাণ্ডবলীলা। জার্মান স্ত্রী বা পুরুষ যাদের সান্নিধ্যেই এলাম সকলেই আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক দেখলাম। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও ছেলে-মেয়েরা খেলছে ও আনন্দ করছে। কাছে কোথাও কোন কাফেখানা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। তারা ছোট্ট একটি কাফেখানায় আমাদের নিয়ে যায়। আমরা কে জানার জন্য তাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। আমরা ভারতবাসী একথা জেনে তাদের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। কোন মতে আমার ভাংগা জার্মান ভাষা দিয়ে কাজ চালালাম। অন্য স্থানের এক জার্মান বন্ধু আমার এই ভাষাকে "শুলে ডয়েটশ্" বা স্কুল জার্মান আখ্যা দেন। কাফের লোকেরাও ইংরেজী জানে না। এক অক্ষরও নয়। কিন্তু তারা বেশ সাহায্যপ্রবণ এবং তাদের ব্যবহারে বুঝলাম আমাদের স্বাগতম জানাচ্ছে এরাও। অবশ্য একটি জনশূন্য রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় আধা মাতাল

একটি আলজেরিয়ান সৈন্যের সম্ভাষণে একটু ভয় পেয়েছিলাম। সে বললে,—"তোমরা কি আফ্রিকাবাসী? আমার সঙ্গে এস। আমরা সব ভাইবোন।" আমি বলি,—"দয়া করে আমাদের মাফ কর। আমরা ভারতবাসী, আমাদের ক্যোলনে ফিরে যেতে হবে।"

ঠিক রাইন ও মোজেলের সঙ্গমস্থলে একটি দালান আছে। তাকে বলা হয় "ডয়েটসে এক্কে"—বা জার্মান কোন। সম্রাট প্রথম উইলিয়মের স্মৃতি রক্ষার্থে এটি তৈরী হয়। এর উঁচু চূড়া থেকে আমরা চারপাশের দৃশ্য দেখতে পাই। রাইনের অপর তীরে একটা প্রকাণ্ড দুর্গ আছে। মোজেলের তীরে তাঁবু খাটিয়েছিল জার্মান কিশোর ও তরুণরা। সাঁতার কাটছিল তারা। আমারও লোভ হল। কিন্তু সময়ও ছিল না এবং সাঁতারের পোষাকও ছিল না।

ফিরবার পথে আমরা প্রকৃত উপলব্ধি করলাম রাইন ও মোজেল ভাইন (মদ)-এর জন্য বিখ্যাত এ অঞ্চল। সময়টা ছিল শনিবারের বিকাল। পুরুষ, মেয়ে সকলেই মদ খাচ্ছিল এবং পরস্পর হাত ধরাধরি করে নাচ-গান করছিল। কিন্তু শিষ্টাচার ও সভ্যতার সীমা ছাড়ায়নি কখনো। প্রায় রাত দশটায় আমরা ক্যোলন গিয়ে পেঁছব। ভাবলাম অত রাত্রিতে আমাদের জন্য খাবার নাও ত থাকতে পারে। তাই জাহাজেই আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। যখন খাবার জল চাইলাম, তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারা বললে,—"রাইন ভাইন খাও, অথবা সোডাপানি, নয়তো দুধ।" জলের স্বাদ এ সব কিছুতেই মেটানো যায় না সে কথা তারা উপলব্ধি করে না।

রাইন ভ্রমণের ফলে এ দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, জার্মানেরা মিশুক প্রকৃতির লোক।

শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী দত্ত স্বভাবতঃই আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, কারণ পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পেঁছাইনি। ফিরে এসে দেখি তাঁরা না খেয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। শ্রীমতী দত্ত আমাদের গরম ভাত ও বাঙালী-খাবার খেতে দিলেন। মহিলাদের রূপ সর্বত্রই এক। কলিকাতা, লণ্ডন, ওয়াশিংটন বা ক্যোলন-মারিয়েন-বুর্গ, যেখানেই থাকুন না কেন এ'র মত মহিলারাই বাংলার কৃষ্টিকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবেন।

১২ই আমরা বার্লিন রওনা হই। শ্রী দত্তের সঙ্গে তিন দিন কাটিয়ে এই প্রথম জানতে পারলাম যে, তিনি বেশ রসিক লোক এবং বাংলাদেশের ভক্তিমূলক গান. কীর্তন খুব ভালবাসেন। তাঁর কাছে জানলাম শুল্কের জন্য পশ্চিম জার্মানীতে চা ও কফি দুধের চেয়ে অনেক মহার্ঘ এবং আমার প্রিয় "ইয়োগুর্ত" বা দই দেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। আরও জানতে পারি যে, পশ্চিম জার্মানী আমেরিকার কাছ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার বা ১৪২৫ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য পেয়েছে। খুব উপভোগ করেছিলাম এখানকার দিন কয়টি।

স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়েই ক্যোলন থেকে বার্লিন আসি বিমান-এ। বার্লিনে

ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মেননের স্ত্রী শ্রীমতী মেনন আমাদের নিতে আসেন বিমানবন্দরে। সেখান থেকে শ্রীমেননের আবাস 'আমরূপেনহর্ণ'-এ যাবার পথে ধ্বংসের যে দৃশ্য চোখে পড়ল আমাদের দেশে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এ থেকে ১৯৪৫ সালে যখন জার্মানীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তখনকার অবস্থা কল্পনা করে নিলাম। জার্মানরা নিশ্চিতই শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিল।

চা পানের ঠিক পরেই শ্রীমতী মেনন আমাদের নিয়ে গেলেন ষ্টেডিয়াম ও বার্লিনের অন্যান্য জায়গা দেখাতে। সান্ধ্য ভোজনের পর আবার শ্রী মেননসহ সকলে বেড়াতে বের হই। বিখ্যাত রাস্তা 'কুরফুরষ্টেনডাম' এবং অন্য কয়েকটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বেড়ালাম। দোকানগুলি জিনিসপত্রে ভর্তি। প্রচুর আলো দিয়ে সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে সব জিনিস। রাস্তাগুলিও আলোকসজ্জিত। বহু বিধ্বস্ত বাড়ীঘর থাকা সত্ত্বেও এখনো বার্লিন, লণ্ডন এমন কি নিউইয়র্কের চেয়েও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

১৩ই সকাল। রুশ অধিকৃত পূর্ব বার্লিন দেখতে যাই। পথে বার্লিন ডালেমে বিখ্যাত 'টেকনিসে হোকশুলে'—টেকনিক্যাল কলেজ দেখি বাইরে থেকে। সামনের অংশটি রাবিশে ভর্তি। অবশ্য কম বিধ্বস্ত অংশ মেরামত করে প্রতিষ্ঠানটির কাজ কিছু কিছু আরম্ভ করা হয়েছে।

রুশিয়ায় জার্মানরা কি পরিমাণ ধ্বংসসাধন করেছে তা স্বচক্ষে দেখতে পারিনি, কিন্তু পূর্ব বার্লিনের যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে বুঝলাম মানুষ কত হিংস্র হতে পারে। পূর্ব বার্লিনে প্রবেশ করার সংগে সংগেই লক্ষ্য করলাম পোষ্টারের সাহায্যে প্রচারের আধিক্য। কিন্তু জনসাধারণের পোশাক ও চেহারায় দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। পশ্চিম বার্লিনের মত দোকানগুলি দ্রব্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ নয়। খাদ্য-দ্রব্যের দোকানের সামনে লোকজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান দেখলাম। এ দৃশ্য পশ্চিম জার্মানীর কোথাও চোখে পড়েনি। লোকজনের চেহারায় কেমন একটা থমথমে ভাব। ঘরবাড়ী ইত্যাদির ধ্বংস এবং ক্ষতিও এ অংশেই বেশী। এখনও একে পোড়া শহর বলে মনে হয়।

কিন্তু দুটো জিনিসের জন্য পূর্ব জার্মানী সত্যিকারের গর্ব করতে পারে :— (১) ষ্ট্যালিন আলী বা এভেন্যুর নবনির্মিত সৌধমালা ও (২) ট্রেপটো পার্ক।

বাইরে থেকে এ সমস্ত সৌধকে খুব জাঁকজমকশালী ও চিত্তাকর্ষক মনে হয়। আমরা ভেতরে যাইনি, তাই সেখানকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়। ষ্ট্যালিন এভেন্যুতে প্রবেশ করার মুখেই ষ্ট্যালিনের একটি প্রতিমূর্তি নজরে আসে। এটি ষ্ট্যালিন পূর্ব বার্লিনকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।

ট্রেপটো একটি সুপরিকল্পিত বৃহৎ আকারের বাগান। নানা রকমের বহু গাছপালা এতে রয়েছে, কিন্তু কোন ফুল দেখলাম না। বাগানে প্রবেশ করার পর প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রুশমাতার প্রতিমূর্তিটি। মূর্তিটির এক হাত

বুকের উপর এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে বেদনার আর্তি ফুটে উঠেছে। একটি সমাধি-স্তম্ভের দিকে মুখ করে এটি স্থাপিত। যে সমস্ত রুশ ও জার্মান সৈন্য ফ্যাসীবাদের হাত থেকে বার্লিনকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছে বলে কথিত—তাদের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরী এ স্তম্ভ। এর শীর্ষদেশে একটি সৈনিকের প্রকান্ড মূর্তি। ঐ সৈনিকের বাঁ হাতে একটি শিশু এবং ডান হাতে তরবারী। তাকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, তরবারীর সাহায্যে সে জাতির শিশুদের রক্ষা করছে। রুশমাতাকে পেছনে রেখে সোজা ঐ স্তম্ভের দিকে এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল দুটি সিমেণ্টের তৈরী হাতুড়ি ও কাস্তে খোদিত লাল পতাকা এবং এর নীচে দু'দিকে নতমস্তকে দুটি সৈনিকের প্রতিমূর্তি। আরো সামনে এগোতে দেখলাম দু'পাশে ছোট ছোট বহু স্তম্ভ গড়ে তাতে ষ্ট্যালিনের বাণীকে রুশ ও জার্মান এই দুই ভাষায়ই উৎকীর্ণ করা রয়েছে। সমাধি-স্তম্ভের ভেতরের ছাদে রেড স্কোয়ারের প্রতীক আঁকা রয়েছে।

আমাদের মতে পার্কের সৌন্দর্যহানি অনেক পরিমাণে ঘটেছে দুই কারণে—(১) নীচুদরের প্রচার ও (২) বিজেতাজনসুলভ শিল্পকলা। মানুষের প্রাণের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির কাছে তার কোন আবেদন নেই। ইতিহাস কি আমাদের এই শিক্ষা দেয়নি যে বিজেতারা চিরকালই সকল সদগুণের আদর্শস্থল!

বার্লিনের একটি রাস্তাকে ষ্ট্যালিন এভেন্যু নাম দেওয়া এবং সেখানে ষ্ট্যালিনের মূর্তি স্থাপন করার মধ্যেও রয়েছে বিজেতা ও বিজিতের চিরন্তন কাহিনী। আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে এ সব জার্মানদের মনে সর্বক্ষণ একটা বিরক্তির ভাব সৃষ্টি করে। আমরা অনুভব করিনি যে ষ্ট্যালিন এভেন্যু ও ট্রেপটো শান্তি ও মানবজাতির সুখের প্রতীক।

পূর্বেকার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় এখন রুশ অধিকৃত অঞ্চলে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হুমবোলড্‌ট-এর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নামকরণ হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমরা সেখানে যেতে পারিনি।

অপরাহ্নে আমরা প্রথম দেখতে যাই 'কাইজার ভিলহেলম ইনষ্টিটিউট'। অবশ্য এর নাম এখন হয়েছে 'ফ্রিটসহাবার ইনষ্টিটিউট।' ইনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বায়ু থেকে ব্যাপকভাবে নাইট্রিক য়্যাসিড তৈরী করার প্রণালী আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু ইনষ্টিটিউটটি পূর্ব নামেই অধিক পরিচিত। এর পরিচালনার ভার এখন ম্যাক্সপ্লাঙ্ক সোসাইটির উপর। বর্তমান ডিরেক্টর বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফন লাউয়ে আমাদের ইনষ্টিটিউট দেখালেন। ডাঃ সুবোধ বাগচী এখানে বেশ ভাল কাজ করেছেন। তিনিও ছিলেন সঙ্গে। স্বনামধন্য অধ্যাপক আমাদের বিশেষভাবে ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে কাজ হচ্ছে তা দেখালেন। উঁচুদরের গবেষণা কাজ হচ্ছে সেখানে। এই বয়সেও অধ্যাপকের উদ্যম ও উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তেমনি মুগ্ধ করেছে তাঁর

রুশীয় মাতা
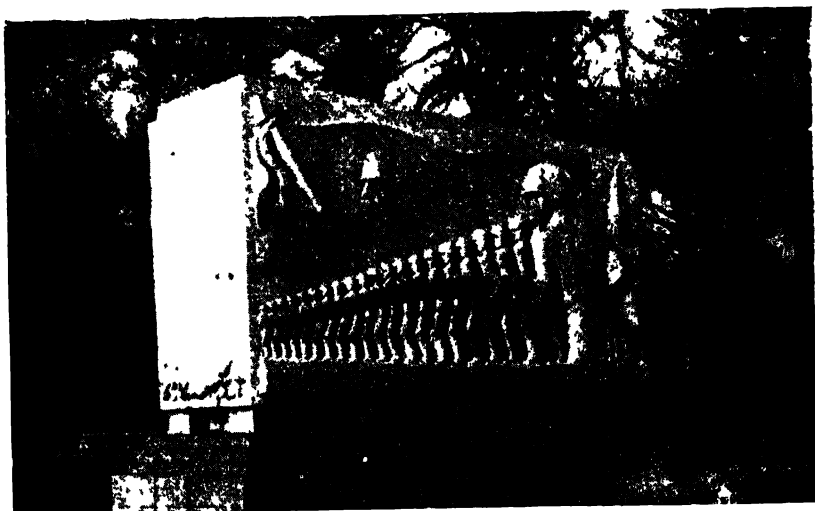
ট্রেপটো পার্কে

পশ্চিম বার্লিন—জীবাড ম্যারিয়েনডর্ফ ক্যাম্পে বাস্তুহারাদল

বাস্তুহারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লেখক

বিনয়। তিনি বেশ স্নেহপ্রবণও।

ইনষ্টিটিউট হতে আমরা যাই "ফ্রাইয়ে উনিভারসিটেট" বা 'স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়' দেখতে। পুরান বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বার্লিনে। পশ্চিম জার্মানীতে উপরিউক্ত নামে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ করা হয়েছে। আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের টাকায় এখনো বাড়ীঘর তৈরীর কাজ চলছে। ছাত্রসংখ্যা মোট ৬ হাজার। ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থার জন্য সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক খরচ ১ কোটি মার্ক।

১৪ জুলাই, ফরাসী জাতীয় দিবস। এই দিবস উদযাপন উপলক্ষে বার্লিন হতে কয়েক মাইল দূরে ফরাসী এলাকায় একটি অনুষ্ঠান হয়। ফরাসী ট্যাংক ইত্যাদিসহ সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব। আমন্ত্রিত হয়ে আমরাও যাই সেখানে। ফরাসী জাতীয় সংগীত (লা মার্সাই) ব্যাণ্ডের সাহায্যে গীত হয়। অতি চমৎকার হয়েছিল তা। কিন্তু সামরিক শক্তি প্রদর্শন আমাদের পছন্দ হয়নি কারণ এর একমাত্র ফল হবে জার্মানীতে ফরাসী-বিরোধী ভাবের বৃদ্ধি। ফরাসী ও জার্মানী পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছে। ১৮৭১ সালে ফরাসী-জার্মান যুদ্ধ হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অপমানজনক যে ভার্সাই সন্ধি ফ্রান্সের উপর চাপান হয় তার প্রত্যুত্তর দেয় ফ্রান্স ১৯১৮ সালে, তার চেয়ে কঠোর না হলেও সেইরূপ অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর উপর চাপিয়ে। ফলে যে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয় জার্মানীতে তারই পরিণতি হিটলারের অভ্যুত্থান। আবার জার্মানীকে অপদস্থ করা হয়েছে প্রচুর ক্ষতি সহ্য করে। ইউরোপে কখনো শান্তি স্থাপিত হবে না যতক্ষণ বিজয়ী জাতি উপলব্ধি না করবে যে প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি এমন কি লাভজনকও নয়। ফ্রান্স কি তা উপলব্ধি করবে? এই কথাই উঠছিল আমাদের মনে বার বার।

শ্রী মেনন অপরাহ্নে কয়েকজনকে চা-তে নিমন্ত্রণ করেন। স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ মিঃ গ্রুয়েনার ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন এঁদের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ হল। ডাঃ বাগচী সমেত ৪ জন ভারতীয়কেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বার্লিনের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানবার সুবিধাও হল।

১৫ই জুলাই সকালবেলা। শ্রীমতী মেনন আমাদিগকে বার্লিনের উপকণ্ঠে 'জি বাড মারিয়েন ডর্ফ' নিয়ে গেলেন শরণার্থীদের অবস্থা দেখাতে। ঐ স্থানের কাছাকাছি যেতেই চোখে পড়ল নবাগত শরণার্থীপ্রবাহ। এদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। বয়স্থদের হাতে কেবল একটি মাত্র স্যুটকেস্। বাকী সবই ফেলে রেখে এসেছে। তাদের মুখে গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। খুবই করুণ দৃশ্য। এদের অধিকাংশই আসছিল পূর্ব জার্মানী থেকে। প্রথম কথা যা আমাদের মনে এল তা এই :—কম্যুনিজম যদি সকল সমস্যা সমাধানের পন্থা হয় তবে এরা কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত দেশ হতে নিজেদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে কেন আসছে! এরা

বিকৃতবুদ্ধি অথবা রাজনৈতিক অপপ্রচারের বলি, একথা বলাও ব্যর্থতার স্বীকৃতি। শরণার্থীরা এসেই যেখানে স্থান পায় এরূপ একটি অন্তর্বর্তী শিবির প্রথম দেখি। এখানে তাদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। এখান হতে একটি স্থায়ী শিবির দেখতে যাই। পাঁচশ' শরণার্থী ছিল এখানে। শিবিরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুশৃংখল কিন্তু ভীড় বেশী। পূর্ব জার্মানীর লাইপজিক ও অন্যান্য স্থান হতেই বেশীর ভাগ এরা এসেছে। পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া হতে আগত লোকও ছিল। তারা কেন এসেছে সে বিষয়ে কথাবার্তা হল। লাইপজিক হতে আগত এক মহিলা তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া হতে আগত এক মহিলাও। এদের মতে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল সেখানে। তাদের ছেড়ে আসতে হয়েছে এবং সেটা মোটেই আনন্দের হয়নি তাদের পক্ষে। তাদের সব কথা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু এটা ত খাঁটি সত্য যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৮ বৎসর পরেও বহু সংখ্যক জার্মান কম্যুনিষ্ট দেশ ছেড়ে চলে আসছে। তারা সকলেই আসছে সুদিনের আশায়। কাজ নেই বলে এদের মধ্যে কেউ কেউ বিষণ্ণ।

এই পাঁচশ' লোকের মধ্যে ৬ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশু ৫০টি, ৬ হতে ১৪ বৎসরের ১০০ জন আর বাকী সব তদূর্ধ্ব। শিবিরে যে খাবার সরবরাহ করা হয় তা সব দিক দিয়েই সন্তোষজনক।

৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকে পাচ্ছে দৈনিক সাড়ে তের ছটাক দুধ, ৬ হতে ১৪ পর্যন্ত প্রত্যেকে নয় ছটাক এবং বাকী সবাই সাড়ে চার ছটাক। ১৪ বৎসর পর্যন্ত সবার জন্য শুদ্ধ মাখন দেওয়া হয়, তদূর্ধ্বদের জন্য অর্ধেক মাখন, অর্ধেক মার্গারিণ (দালদা জাতীয় পদার্থ।) ডিম প্রতিদিন দেওয়া হয়। শাক-সব্জী, ফল, মাংসও আছে। শরণার্থীরা ত দূরে থাকুক আমি বলতে পারি না কলকাতার কয়টি বাঙগালী পরিবার এরূপ খাওয়া পায়। এমন কি সংগতিপন্নলোকের পক্ষেও পরিবারের জন্য ঐ পরিমাণ ভাল দুধ যোগাড় করা শক্ত।

এদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে কিছু সংখ্যক শরণার্থী শিবিরের আঙিনায় সমবেত হয়। আমি তাদের সম্বোধন করে জার্মান ভাষায় বলি, "আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখের হোক এই কামনা করি।" তারা আমাদের এই বন্ধুত্ব-পূর্ণ সাক্ষাৎ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ জানায় এবং বিদায় সম্ভাষণ করে।

পশ্চিম জার্মানীর শরণার্থী সমস্যা সম্বন্ধে এখন কিছু বলতে চাই।

সরকারী হিসাব মত গত কয়েক বৎসরে শরণার্থী এসেছে প্রায় ১ কোটি। বে-সরকারী হিসাবে সংখ্যা আরো বেশী। অথচ এখান থেকে অপরদিকে অর্থাৎ পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি অঞ্চলে কেউ যায়নি বললেই চলে। যে অংশ পশ্চিম জার্মানী বলে এখন পরিচিত তার লোক সংখ্যা ৪ কোটিরও কম ছিল। কোন দেশের পক্ষেই তার জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ নবাগত লোককে মিলিয়ে এক করে নেওয়া সহজ নয়। আর যে দেশ জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব যুদ্ধে ক্ষতির পর নিজেকে

দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে, যার শতকরা ৪০টি বাড়ী ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং শিল্প কারখানা নষ্টপ্রায় তার পক্ষে আরো কম সহজ। কিন্তু এই বিরাট সংখ্যক শরণার্থী আসা সত্ত্বেও আমরা যখন সেখানে ছিলাম (জুলাই-আগষ্ট ১৯৫৩) তখন সারা পশ্চিম জার্মানীতে বেকারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লক্ষ। খুবই অসাধারণ এ কৃতিত্ব। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হের হিটলার যখন ক্ষমতাশীল হন ঠিক সেই সময় তৎকালীন জার্মানীতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে শরণার্থী সমস্যার পুরাপুরি সমাধান হয়েছে সেখানে। এমন কি জার্মানরাও সে দাবী করে না। কিন্তু যা করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। সরকারের সমস্ত আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ ব্যয় হয় জনকল্যাণের কাজে। শরণার্থী পুনর্বসতি এর অন্তর্ভুক্ত। শরণার্থীদের বোঝাস্বরূপ মনে করা হয় না। রাষ্ট্রের অন্য সকলের মত তাদেরও দেশের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্পদের উৎস বলে মনে করা হয়। অবাঞ্ছিত সংখ্যা বৃদ্ধিকারী বলে তাদের গণ্য করা হয় না। তারা সমস্ত দেশবাসীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ও জাতির সুখ-দুঃখে সমভাগী। এখানেই রয়েছে সমস্যা সমাধানের ভিত্তি। শরণার্থী পুনর্বসতি সমস্ত জাতির আর্থিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা হিসাব না করে পৃথক সত্ত্বা হিসাবে শরণার্থী সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এভাবেই জার্মানরা এই সমস্যার বিচার করেছে এবং সমাধানের চেষ্টা করেছে। শরণার্থীরাও সহযোগিতা করেছে। যে কাজেই তাদের দেওয়া হোক না কেন তা করতে অস্বীকার করে না। শরণার্থী আসার পরই বৃত্তি অনুযায়ী তাদের পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করা হয়। সরকার যথাসম্ভব তাদের পূর্ববৃত্তি অনুযায়ী কাজ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাধ্যাতীত বলে যদি কাউকে অন্য কাজ দেওয়া হয় কোন শরণার্থীই তা করতে অস্বীকার করে না। ধরুন একজন স্কুলের শিক্ষক এসেছেন। স্কুলগৃহের অভাবে হয়ত কিছুদিনের জন্য অর্থাৎ যতদিন স্কুল গৃহ পুনর্নির্মিত হয়ে স্কুলের কাজ আরম্ভ না হয় তাঁকে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষগণ তাঁকে বলতে পারেন "আপনাকে ছয় মাস পরে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। এই সময়টা আপনি......হোটেলে গিয়ে বাসনপত্র ধোয়ার কাজ করুন।" ; তিনি তা করতে অস্বীকার করবেন না। কারণ প্রথমতঃ কোন কাজই অসম্মানজনক বিবেচিত হয় না ও দেশে, আর দ্বিতীয়তঃ বেতনের হারও স্কুল শিক্ষকের বেতনের সমান হতে পারে। সকল শরণার্থীই অবশ্য উপযুক্ত খাদ্য, একান্ত প্রয়োজনীয় পোশাক, ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুযোগ পায়। যেমন পায় জাতির অন্য সকলেও। এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস। কিভাবে জার্মানী গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এতদূর করতে সমর্থ হয়েছে তা পরে বলছি।

বার্লিনে ভারী খুশীর এক ঘটনা ঘটে। আমরা একটি ক্যামেরা কিনতে যাই। ফার্মের প্রোপ্রাইটার হের হেলার বেশ নামী ফটোশিল্পী। পূর্ব বার্লিন থেকে

তিনি এ অঞ্চলে এসেছেন। আমাকে বিনীতভাবে বললেন—"আপনার মেয়ের কয়েকটি ফটো আমাকে তোলার অনুমতি দেবেন কি? খাঁটি ভারতীয় পোশাকে একজন ভারতীয় মেয়ের ছবি তোলা আমার জীবনের সাধ। আমি বড় খুশী হব তিনি যদি রাজী হন।" তাঁর বলার নম্র ও বিনীত ধরণ অস্বীকৃতির কোন পথই রাখলে না। সাধনা খুব আনন্দের সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল। তারপর চুপি-চুপি আবার অনেকটা কাণে কাণে বলার মত করে বললেন,—"আমার ধারণা ছিল যে, ভারতীয় মেয়েরা কি করে প্রাণ খুলে হাসতে হয়, তা জানে না, কিন্তু আপনার মেয়ে তার ব্যতিক্রম।" সাধনা তক্ষুণি সে কথার জবাবে বললে,—"কি করে মন খুলে হাসতে হয়, ভারতীয় মেয়েরা জানে তা, কিন্তু তারা কৃত্রিম নয়, হুকুম মত হাসতে পারে না। তা ছাড়া নিষ্প্রয়োজনে দাঁত দেখাতে ভালবাসে না।" হের হেলার এ জবাবে খুব খুশী হলেন। সাধনার অনেকগুলো ফটো তিনি নিলেন এবং তার মধ্যে চারখানা বাছাই করা চমৎকার ছবি তিনি পাঠিয়েছিলেন। আমরা 'সোয়ার্তস্' বা কালা আদমী বলে অপমানিত হইনি বরং এভাবে ভদ্রতা ও সম্মান পেয়েছি। কালা আদমী বলে উপযুক্ত সম্মান না পাবার ভয় আছে অনেকের মনে। পাশ্চাত্যের কোথাও বর্ণ-বৈষম্যের জন্য কোন রকমের অসুবিধাই আমাদের ভোগ করতে হয়নি, অবশ্য ব্যবহারে আন্তরিকতার ঊনিশ-বিশ ছিল এবং তা স্বাভাবিক।

১৫ই জুলাই দুপুরবেলা আমরা বিমানে হামবুর্গ রওনা হই। এটিও আর একটি বহু পরিমাণে যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর।

এ ভাবে বার্লিন সফরের তিনটি দিন আমাদের শেষ হয়ে গেল।

বার্লিনের জনসংখ্যা যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় এখনো আসেনি; কিন্তু জীবনের একটা স্পন্দন অনুভব করলাম। আরো সুন্দর বার্লিন তৈরীর নানা নিদর্শন আমাদের চোখে পড়ল। জনসাধারণের অদম্য ইচ্ছাশক্তি রয়েছে এর পেছনে। শ্রী ও শ্রীমতী মেননের সঙ্গে আগে আমাদের কোন পরিচয় ছিল না; কিন্তু তাঁদের হৃদয়ের প্রীতির পরশ আমাদের বার্লিনের দিন কটিকে অতি মধুর করে রেখেছিল। আমাদের অন্তরে তাঁরা চিরদিনের জন্য তাঁদের স্থান করে রেখেছেন। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁদের আর স্নেহ ও ভালবাসা তাঁদের ছেলেমেয়েদের।

জার্মানীতে প্রথম হামবুর্গেই আমাদের সৌভাগ্য হল মিঃ কুর্ট ফ্রিডরিশের মত একজন কৃষ্টিসম্পন্ন জার্মান ভদ্রলোকের বন্ধুত্ব ও প্রীতিপূর্ণ সহায়তালাভের। তিনি স্বামী নিখিলানন্দের বন্ধু; যুদ্ধের সময় জার্মান নৌবিভাগে কাজ করতেন। হেলিগোল্যান্ড তাঁর জন্মভূমি এবং সেখানকার কথ্য ভাষা ফ্রিজিয়ান। বর্তমানে তিনি একজন ব্যবসায়ী, হামবুর্গ—আথমার্শেন-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তিনি ভক্ত এবং ভারতীয় তথা প্রাচ্য কৃষ্টির প্রতি অতি শ্রদ্ধাশীল।

১৬ই সকালবেলা আমরা প্রথম 'বাওবেহোরদে' (নির্মাণ অফিস) দেখতে যাই।

এই প্রতিষ্ঠান উন্নততর হামবুর্গ শহর নির্মাণের সমস্ত পরিকল্পনা ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তৈরীর কাজ করছে। ম্যাপের মারফতে তাদের কাজের একটা ধারণা আমাদের ছিল।

যুদ্ধের সময় এই শহরের ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বাড়ী ধ্বংস হয়ে যায় এবং কয়েকটি অঞ্চল প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। আমরা যখন সেখানে ছিলাম, সেই সময় পর্যন্ত ১ লক্ষ নতুন ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং আমাদের বলা হল যে সমস্ত বাড়ীই প্রায় জনসাধারণের অর্থে তৈরী আর তার মধ্যে কো-অপারেটিভের অংশই বেশী। মিঃ স্নাইডার 'বাও বোহারদে'র একজন ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর সঙ্গে আমরা শহর এবং কয়েকটি নতুন তৈরী ফ্ল্যাটবাড়ী দেখতে যাই। যে অঞ্চলে প্রকাণ্ড বাড়ীগুলি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তা দেখি। অভিজাত অঞ্চল এলবে নদীর তীর। সেখানে মিঃ স্নাইডারেরও বাড়ী। সে অঞ্চল দেখার পর যাই কয়েকটি নতুন তৈরী বাড়ী দেখতে। এগুলি সবই ভাড়া হয়ে গেছে। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে পুরুষ—যারাই উপস্থিত ছিল সুন্দর ব্যবহার করল। যে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যেকটির উত্তর তারা দিল। একটি বড় শোবার ঘর, দুটি ছোট শোবার ঘর, একটি বসবার ঘব (এর খানিকটা খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়), একটি স্নানের ঘর—চব্বিশ ঘণ্টা ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা এবং গ্যাসষ্টোভযুক্ত একটি রান্নাঘর—এ রকম সুন্দর আলো-হাওয়াযুক্ত ফ্ল্যাট বাড়ীর ভাড়া মাসিক ৭৫ জার্মান মার্ক। অবশ্য মাসিক ৭০ বা ৬০ জার্মান মার্ক ভাড়ার ফ্ল্যাটও আছে। ঘরদোর সাজানোর জন্য সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়াটেদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

এখান থেকে আমরা হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ দেখতে যাই। অধ্যাপক শলুবাক তাঁর ঘাস নিয়ে কাজ করার পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে, সে কথা প্রথমে বুঝিয়ে বলেন। তারপর তিনি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় ঘুরিয়ে দেখালেন। তখন দু'টো বেজে গেছে অথচ তখনও এই বিখ্যাত বৃদ্ধ অধ্যাপকের দুপুরের খাওয়া হয়নি—আমাদের এজন্য কুণ্ঠার শেষ ছিল না। অতি অমায়িক এবং সুন্দর মানুষ তিনি। আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিঃ কুর্ট ফ্রিডরিশ আবার আমাদের শহরের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখালেন। পোতাশ্রয়ও বাদ গেল না। খুব পরিচ্ছন্ন শহর এটি। বিকেলে আমরা মিঃ কুর্ট ফ্রিডরিশের বাড়ী যাই সান্ধ্য ভোজনের জন্য। আগের দিনই তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আইরিণের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তাঁর যত্নের অবধি ছিল না। মনে হল, কৃষ্টিবান স্বামীর উপযুক্ত কৃষ্টিবতী সহধর্মিণী।

ভোজনের পর আসবার জন্য তাঁরা তাঁদের কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা শোনাই উদ্দেশ্য। একে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ, শিক্ষিত এবং কৃষ্টিসম্পন্ন লোকের সমাবেশ বলা চলে। তাঁদের কাছে যা বলি, তার সারাংশ নীচে দিচ্ছি—

"সত্য ও অহিংসা—এই-ই মহাত্মা গান্ধীর দর্শন এবং কর্মের আসল কথা।

ভারতবর্ষে ভগবান বুদ্ধ অহিংসা মন্ত্রের উদগাতা। কিন্তু শুধু ধর্মক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। মহাত্মা গান্ধী সে অহিংসাকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক—সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন। অহিংসা-অস্ত্রে তিনি যে শুধু বিদেশীর গ্রাস হতে মুক্তি পেতে চাইলেন তা নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যে অবিচার ভারতের মাটিতে চালু ছিল, মানুষের মধ্যেকার সর্বোত্তম গুণটুকুকে উদ্বুদ্ধ করে ঐ অবিচারের গ্রাস থেকেও মুক্তিস্থানের ইঙ্গিত দিলেন। বর্তমান ভারত যে সে পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছে, সে কথা আমি বলি না, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ, ভারতের মুক্তির পথ ঐটিই। মহাত্মাজীর জীবদ্দশায় বহুবার অনেক লোক ভেবেছে যে, তাঁর প্রভাব বুঝি বা নিঃশেষ হয়ে গেছে; কিন্তু ঘটনাপরম্পরা এ কথা তাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ধারণা কত ভুল। আজকের ভারতের অনেক মানুষও সে কথা ভাবতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত পথের জয় সুনিশ্চিত। এমন কি আমি একথাও বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, মানব জাতির চিরন্তন শান্তি ও সুখের একমাত্র পথ এই,—আজ হোক, কাল হোক দুনিয়া সে কথা উপলব্ধি করবে।"

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরও আমি দেই। সাধনা একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনায় এবং ইংরেজীতে তার অর্থ বুঝিয়ে বলে। অনুষ্ঠান শেষ হল, অতিথি-অভ্যাগতরাও বিদায় নিলেন। মিঃ কুর্ট ফ্রিডরিশ সাধনাকে আবার গান করতে অনুরোধ করলেন। সেই গান ম্যাগনেটোফোনে রেকর্ড করে নিলেন। তিনি প্রাচ্য সঙ্গীত ভালবাসেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তা সংগ্রহ করে রেখেছেন।

পরদিন সকাল। আবার মিঃ স্নাইডার আমাদের নিয়ে গেলেন শহরের বিলস্টেড অঞ্চলে তৈরী একটি নতুন স্কুল দেখাতে। স্কুলটি বন্ধ ছিল—গ্রীষ্মের ছুটির জন্য। প্রধান শিক্ষক স্কুল দেখাতে এলেন। হামবুর্গ এ রকম স্কুল নিয়ে গর্ব করতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন সুন্দর স্কুল দেখিনি, এমন কি ধনী আমেরিকায়ও নয়। স্কুলে ঢুকতেই সামনে মস্ত ফুলের বাগান, কত রকমারি ফুলই না তাতে রয়েছে, চমৎকার সব গোলাপ ত বটেই। ভেতরে স্কুল প্রাঙ্গণে এবং পেছনের দিকেও বাগান রয়েছে। তাদের মধ্যে চির-সবুজ গাছপালাও আছে। ক্লাস ঘরের মধ্যে ফুলের টবে অর্কিড, লাল ও নীল রংয়ের মাছ কাচের চৌবাচ্চায় রাখা আছে। দেয়ালগুলোতে সুন্দর ছবি আঁকা। স্নানের ঘর আছে। ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা তাতে। ভারী সুন্দর খাবার ঘর। এক সঙ্গে দু'শো লোক বসে খেতে পারে। কি চমৎকার বন্দোবস্ত! শিশু দেবতাদের জন্য যেন রাজকীয় অভ্যর্থনা। বাগানের দেখা-শোনা করে ছাত্ররাই, এমন কি ছুটির সময়ও ছেলেমেয়েরা পালা করে বাগানের কাজে আসে। অমন আগ্রহ নিয়ে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে! দেখে বড় ভাল লাগল। একটি ফুলও কিন্তু কেউ ছেঁড়ে না। স্কুলে সর্বমোট ৮৫০ জন ছাত্র, স্থান-সঙ্কুলান হয় না বলে দু'বার করে স্কুল হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সংকল্প একবার স্কুল করা এবং ছাত্র-সংখ্যা হাজার পর্যন্ত বাড়ান। ইতিমধ্যেই

৫ লক্ষ মার্ক খরচ করা হয়েছে স্কুলের জন্য। আরো যা ব্যয়ের পরিকল্পনা আছে, তা মিলিয়ে মোট ২০ লক্ষ মার্ক খরচ হওয়ার কথা। আহা, এমন স্কুলে যদি পড়তে পারতাম!

হামবুর্গে মানুষের দু'টো হাত দেখতে পাই,—একটি যা ধ্বংসসাধন করে, অপরটি যা ধ্বংস হয়েছে তার চেয়ে সুন্দর জিনিস তৈরী করে। এই কি প্রকৃতিব অমোঘ বিধান? এর জন্যই কি ভারতে হিন্দুরা রুদ্র দেবতার উপাসনা করে? এর পেছনে দর্শন-শাস্ত্রের যে সত্যই লুকানো থাকুক না কেন, ধ্বংস মানুষের মনে বেদনা ও দুঃখের সৃষ্টি করে, আর সৃষ্টি বা নির্মাণ তাকে আনন্দ দেয়। সৃষ্টির আনন্দ জয়ী হোক ধ্বংসের বেদনাকে পরাজিত করে। হামবুর্গ শহরে পুনর্গঠনের যে কাজ হচ্ছে, তা সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য।

স্কুল থেকে মিঃ স্নাইডার আমাদের নিয়ে গেলেন 'গার্ডেন এগজিবিশনে'। কত রকম ফুলেরই না চমৎকার প্রদর্শনী করা হয়েছে। অবশ্য এখানকার ফুলেও কোন প্রকারের গন্ধ নেই। প্রদর্শনীতে এক জার্মান তরুণী এসে সাধনাকে বললে—দিল্লী থেকে আসা একটি মেয়ে বন্ধু আছে তার, নামটিও বললে, সাধনা তাকে চেনে কিনা? সাধনা জবাব দিলে যে, সে কলকাতা থেকে এসেছে, দিল্লীর ঐ নামের কোন মেয়েকে সে চেনে না। জার্মান মেয়েটি এ উত্তরে সন্তুষ্ট হল বলে মনে হল না। ইউরোপে দেখেছি, সাধারণতঃ সেখানকার লোকের ধারণা, এক ভারতবাসী অন্য ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই চেনে। যেন ভারতবর্ষ ছোট্ট একটি জায়গা আর অল্প কিছু লোক বুঝি বা সেখানে বাস করে।

মিঃ কুর্ট ফ্রিডারিশের ইচ্ছে, আমরা তাঁর বাড়ীতে থাকি। তাই তিনি আমন্ত্রণ জানালেন কোপেনহেগেন যাবার পথে অন্ততঃ একদিনের জন্যও হামবুর্গে নেমে যেন তাঁদের সংগে কাটিয়ে যাই। তাই দ্বিতীয়বার হামবুর্গে এসে ২৪শে ও ২৫শে আগষ্ট এই পরিবারে থাকি। পশ্চিম জার্মানী ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংগে সেই দুইদিনের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করছি। কোন জার্মান পরিবারে বাস করা এই আমাদের প্রথম। স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের এক বছরের ছেলে মার্টিন—এ নিয়েই এ'দের পরিবার। সাধনা মার্টিনকে খুবই ভালবেসে ফেলেছিল, মার্টিনও সাধনাকে পেয়ে ভারী খুশী। আইরিণ তো যেন সাধনার বড় বোন—এমনি তাঁর ব্যবহার। আমাদের পেঁছাবার পরদিন সকালে আইরিণ আমার কাছে এল এবং কাপড়-চোপড় কিছু ধোবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে। আমি জানতাম, সে নিজেই ধোয়ার কাজ করবে তাই যত কম সম্ভব জিনিস ধুতে দিলাম। ইউরোপে ক্রমাগত ভ্রমণের সময় লণ্ড্রী থেকে কাপড় ধুইয়ে আনা একরকম অসম্ভব। খুবই বিবেচনার কাজ করেছিলাম যে আমেরিকা থেকে একটি ড্যাকরণ সার্ট এনেছিলাম। এ জামা সহজে ধোয়া যায়, অতি সহজেই শুকিয়ে নেওয়া যায় এবং ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হয় না। অনেক অসুবিধার হাত থেকে জামাটি আমাকে রক্ষা করেছে। ভ্রমণের সময় এটা কম কথা

নয়। আইরিণ বেশ পরিশ্রমী মেয়ে। এত সুন্দর ঘাসের আঙিনা, আপেল ও পিয়ার্সফলের গাছসমন্বিত বাড়ীখানা নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে সে।

দুটো দিন হামবুর্গের নানা জায়গা ইত্যাদি ঘুরিয়ে দেখানো ছাড়াও এরা আমাদের আনন্দ দিয়েছে বিঠোফেণ, বাক্, ভাগনার এবং অন্যান্য সংগীত রচয়িতার রেকর্ড-করা গান ইত্যাদি শুনিয়ে। সে সঙ্গে প্রাচ্য সংগীত এবং ডন কসাকস্‌দের সঙ্গীতের রেকর্ডও ছিল। সাধনার আরো দু'খানা গান ম্যাগনেটোফোনে রেকর্ড করে নিলেন। যখন কোপেনহেগেন যাবার জন্য হামবুর্গ ছেড়ে আসি তখন আইরিণ মার্টিনকে কোলে করে দাঁড়িয়েছিল গাড়ীর কাছে। মার্টিন বড় বড় চোখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। এ বিদায়-ব্যথা এতখানি বেজেছিল সাধনার যে, তা বুঝে মিঃ কুর্ট ফ্রিডরিশ তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, "এ তোমার দ্বিতীয় বাড়ী।" সর্বত্রই মানুষের সেই চিরন্তন অন্তরের প্রকাশ।

এবার হামবুর্গে আমরা অধ্যাপক আলসডর্ফের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দও পেলাম। ইনি ভারততত্ত্ববিদ। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক টসিমারের ছাত্র এবং আধুনিক ভারতবর্ষ নিয়ে গবেষণা করেন। ইউরোপ সফরের প্রাক্কালে ভারতে থাকা-কালীন এঁরই লেখা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক 'ইণ্ডিয়েন' পড়ি। তা থেকে বুঝতে পারি যে ভারতবর্ষের অনেক গান্ধীবাদীর চেয়েও তিনি মহাত্মা গান্ধীকে অনেক গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন। তিনি তিনবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। একবার কিছু সময়ের জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর নিশ্চিত মত এই যে, ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই হওয়া উচিত। ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা তাঁর মতে নেহাৎ বোকামি। তাঁর লাইব্রেরী ও সেমিনার দেখালেন। ভারতে ফিরে আসার পর ডাকযোগে প্রেরিত তাঁর রচিত একখানা পুস্তিকা পাই, তার নাম "মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় আত্মার প্রতিনিধি ও পুনরুজ্জীবক।" অধ্যাপকের মতে যার ভারতীয় পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এবং ভারতের মাটির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, শুধু তার পক্ষেই মহাত্মা গান্ধীকে বুঝতে পারা সম্ভব, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সমস্ত মানব জাতির জন্য।

১৭ই জুলাই, অপরাহ্ন। আমরা হামবুর্গ ছেড়ে রওনা হই বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয় শহর গ্যটিংগ্যেনের উদ্দেশ্যে। হোটেলে পৌঁছেই আমরা দেখি খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ ডাঃ আর্নষ্ট ভালডশমিড্‌ট্-এর পাঠান খবরটি অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাদের সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। হোটেলের লোকেরা একটি বাসে আমাদের তুলে দিল। নির্দেশ অনুযায়ী জায়গায় নেমে বুঝলাম রাস্তাটা একটু গোলমেলে। এক জার্মান দম্পতি সে পথে যাচ্ছিলেন। কিভাবে ঐ অধ্যাপকের বাড়ীতে যেতে হবে তাঁদের জিজ্ঞাসা করি। রাস্তার নাম এবং নম্বর জানালাম। ভদ্রলোকের হাতে কিছু জিনিসপত্র ছিল। সেগুলি স্ত্রীর হাতে দিয়ে তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে চললেন। শুধু নির্দেশ দেবার পরিবর্তে

আমাদের অধ্যাপকের বাড়ীর দরজার সামনে পোঁছে দিলেন। এই সহজাত সদ্‌গুণের কথা কি ভোলা যায়?

অধ্যাপক ভালডশমিড্‌ট্‌ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। পালি এবং সংস্কৃত দুই ভাষাতেই তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী দেখলাম এবং বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আলোচনা হল। অনুভব করতে পারলাম যে, একজন প্রকৃত বৌদ্ধের মত তিনিও প্রেমধর্মে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বললাম। বুদ্ধের মত এত বিরাট ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। ভারতের নর-নারীর অসীম শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি। তাই অনেকের কাছেই এ এক রহস্য যে, প্রকৃতপক্ষে কেন এ দেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব নেই। অনেকে বলেন, রাজনৈতিক অত্যাচারই এর কারণ। সত্যই কি তাই? আমার উত্তর নিশ্চিত "না"। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব। তাঁর ধর্ম প্রধানতঃ নীতিমূলক। কিন্তু ভারতীয় মন চায় ঈশ্বরে বিশ্বাস। সেজন্য তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটল এবং ভারতবর্ষে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আশা করার আর কিছু নেই। অবশ্য সর্বকালের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন বুদ্ধদেব।

অধ্যাপককে এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন দেখলাম, কিন্তু কোন মতামত তিনি প্রকাশ করলেন না।

শ্রীমতী ভালডশমিড্‌ট্‌ আমাদের জন্য যে খাবার তৈরী করেন তাকে ভারতীয় খাদ্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। বেশ সুস্বাদু। কিন্তু অপরের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর সুন্দর ব্যবহার আমাদের আনন্দের আস্বাদ দিয়েছিল অনেক বেশী। তাঁর নাম রোজে, শুনে একটি কথা তাঁর সম্বন্ধে আমার মুখ থেকে চট্‌ করে বেরিয়েছিল,—"রোজে ইস্ট্‌ ভি আইনে রোজে,"—রোজে ঠিক গোলাপেরই মত!

জার্মানী ও ভারত সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির পর এবং সাধনা ও রোজে দু'জনেরই গান গাওয়া শেষ হলে আমরা চারজনে মিলে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। চলছিলাম পায়ে হেঁটে। প্রায় দুই মাইল দূরে স্থিত হোটেলে আমরা পোঁছলাম রাত পোনে বারটার সময়। বৃষ্টি ঝরছিল অঝোরে। তার মধ্যেই হেঁটে বাড়ী ফিরলেন তাঁরা।

অধ্যাপক ভিনার্টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাঃ ভালডশমিড্‌ট্‌। পরের দিন গ্যাটিংগ্যেন বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন অধ্যাপক ভিনার্ট।

১৮ই জুলাই, সকাল। মিস্‌ ফ্রাইবার্গ এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। প্রথমে গির্জা এবং পরে লাইব্রেরীতে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরীতে বসে পড়বার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। লাইব্রেরী-দালানের একটা অংশ এবং ১০ লক্ষ বইয়ের মধ্যে ৬০ হাজার বোমায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫ হাজার। বার্ষিক খরচ প্রায় ৫০ লক্ষ জার্মান মার্ক।

বিখ্যাত জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্ক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। শুনে বিস্ময় মানি,—আধুনিক জার্মানীর একজন স্রষ্টা এমন যে কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ বিসমার্ক তাঁকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আটকখানায় (জেলকক্ষ) উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সে কক্ষটি আমাদের দেখান হল।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। প্রায় ৭৫০ জন ছাত্র এখানে বিজ্ঞান পড়ছে। অধ্যাপক শেঙ্ক আমাদের রসায়নাগার দেখালেন। ভিক্টর মায়ার, ভালাক এবং ভিনডাউস—এই তিনজন জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক গবেষণা করে গিয়েছেন এই বিজ্ঞানাগারে। শেষোক্ত বিজ্ঞানী এখনও এখানে "এমেরিটাস অধ্যাপক।" অসুস্থ বলে তিনি আসতে পারেন নি,—সেজন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হল না। অধ্যাপক শেঙ্ক আলোক-রশ্মির সাহায্যে সংশ্লেষণের কাজ করছেন। হুকওয়ার্ম রোগের জন্য যে 'ক্যাডারল' ব্যবহৃত হয়, তিনি তা সংশ্লেষণ করেছেন এই উপায়ে। কিন্তু ঐ সংশ্লেষিত জিনিসের মূল্য বর্তমানে উদ্ভিদ জগৎ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের চেয়ে বেশী। অধ্যাপক আশা করেন যে, ভবিষ্যতে সংশ্লেষিত জিনিস কম মূল্যে দিতে পারবেন। এ পর্যন্ত সাজ-সরঞ্জামাদির বিচারে শ্রেষ্ঠ যত গবেষণাগার দেখেছি, ডাঃ শেঙ্কের গবেষণাগার তার মধ্যে একটি। খ্যাতনামা রসায়নী বুটেনাড্‌ট্‌ যেখানে কাজ করে গিয়েছেন সেই প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানাগারও আমাদের দেখান হল। ইনি এখন টিউবিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যাই মাক্স প্লাঙ্ক গেজেলশাফট (সোসাইটি) দেখতে। অধ্যাপক বন্‌হোফার রসায়নাগার দেখান। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সংগঠনের কথা আলোচনার সময় তিনি জানালেন যে, ভারতের পুণা শহরের "ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী"র ডিরেক্টর পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান হয়েছিল কিন্তু জার্মানীতে থাকাই তিনি পছন্দ করলেন। অধ্যাপক অতি সাদাসিদে এবং দিলখোলা লোক। অধ্যাপক অটোহান এবং ভেরনার হাইসেনবার্গ,—এই দুই বিশ্ববিশ্রুত আণবিক পদার্থবিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের দু'জনেরই সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান এবং সুযোগ আমার হয়েছিল।

আমি প্রথম যাই অধ্যাপক অটোহানের কাছে। তিনিই "মাক্স প্লাঙ্ক গেজেলশাফ্‌ট,"-এর সভাপতি। পরিষ্কার সুন্দর ইংরেজী বলেন। "নিখুঁত ভদ্রলোক" তিনি। আর কত যে বিনয়ী! অধ্যাপক বনহোফার যখন শুনলেন, এক সময় আমি জৈব রসায়নী ছিলাম, তখন তিনি বললেন,—"তা হলে আপনিও আমারই মত একজন জৈব রসায়নী!" আমি বলি,—"আপনার সঙ্গে তুলনায় আমি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রসায়নী।" আমার এ কথার প্রতিবাদ করলেন তিনি এবং বললেন—"না, না, আপনার এরকম বলা ঠিক নয়।" তারপর যখন শুনলেন যে, বিজ্ঞান চর্চা ত্যাগ করে আমি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রাজনীতিতে যোগ দেই, তখন তিনি অতি আনন্দের সঙ্গে বললেন,—"আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার মহাভাগ্য।" সঙ্গে সঙ্গেই

আমি জবাব দিলাম,—"আপনার চেয়ে আমিই অধিক ভাগ্যবান।" আমার কথা শেষ হতেই অধ্যাপক মন্তব্য করলেন,—"তাহলে সৌভাগ্য আমাদের দুজনেরই।"

যুদ্ধকালীন জার্মানীতে আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানীদের নূতন উদ্ভাবনা সম্বন্ধে আমি অধ্যাপক হাইসেনবার্গকে প্রশ্ন করি। আরও বলি যে, ভারতীয় একজন বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম যে, জার্মান বিজ্ঞানীরা আণবিক স্তূপ (Pile) তৈরী করতে সমর্থ হন। সে কথা কি সত্য? তিনি জার্মান বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী কাজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বললেন এবং তারপর স্বলিখিত ইংরেজী একটি প্রবন্ধের নকল আমাকে উপহার দিলেন। প্রবন্ধটির নাম—"আণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে জার্মানীতে গবেষণা।" পাঠকদের বিশেষ করে ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার জন্য সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। ১৯৪২ সালের ৬ই জুন যুদ্ধ-উৎপাদনমন্ত্রী মিঃ স্পিয়ারকে নিম্নলিখিত বিবরণী পেশ করা হয়ঃ—

—নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, একটি ইউরেনিয়াম স্তূপে আণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভবপর। তা ছাড়াও তত্ত্বীয় যুক্তিতে এ আশা করা যায় যে, এরূপ স্তূপে এটম বোমা তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু এটম বোমা তৈরীর জন্য ব্যবহারিক দিককার গবেষণা—যথা ক্রান্তিক সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করা হয়নি।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের অধিকাংশ হাইগারলক নামক স্থানে জড় করা হয় এবং এবারে ভারী জলে চতুষ্কোণ ইউরেনিয়াম টুকরার সাহায্যে নূতন স্তূপ তৈরী হয়। এর বাইরের অংশ কৃষ্ণসীস বা গ্রাফাইটে তৈরী। ২২শে এপ্রিল আমেরিকানরা হাইগারলক দখল করে এবং এই সমস্ত উপাদান সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে।

শুধু জার্মানরা নয়, ব্রিটেন ও আমেরিকাবাসীরা এ প্রশ্ন আমাদের করে,—কেন জার্মানী এটম বোমা তৈরীর চেষ্টা করে নি। এ প্রশ্নের নিতান্ত সহজ জবাব এই,—জার্মানীর যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই পরিকল্পনা সফলকাম হত না। ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলেও এর সাফল্য সম্ভবপর ছিল না। আমেরিকার কথাই ধরা যাক না কেন। শত্রুর আক্রমণে দেশের কোন কিছুই ধ্বংস হয়নি। তার বৈজ্ঞানিক জনশক্তি, কারিগরি ও শিল্পশক্তি অনেক বেশী। তথাপি জার্মানীর সংগে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে দেশে এটম বোমা তৈরী হয়নি। বিশেষ করে সামরিক পরিস্থিতির জন্যই জার্মানীর এটম বোমা তৈরীর পরিকল্পনা সফল হত না। ১৯৪২ সালে জার্মানীর শিল্প একরকম শক্তির শেষ পর্যায়ে এসে পেৌঁছেছিল এবং ১৯৪১—৪২ সালের শীতকালে রাশিয়ায় জার্মাণ সৈন্যবাহিনী সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। সে সময়ে বিপক্ষের বিমান বহরের প্রাধান্য উপলব্ধি হতে থাকে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কাজে নিযুক্ত লোক বা মালমশলাকে অন্য কাজে সরিয়ে আনা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। আর এ কাজের জন্য যে বিরাট কারখানার প্রয়োজন, শত্রুর বিমান আক্রমণের হাত থেকে তাকে রক্ষা করাও ছিল শক্ত। পরিশেষে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, জার্মান যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যাঁরা দায়ী ছিলেন, তাঁদের মানসিক পটভূমিকার বিরুদ্ধে এ কাজে প্রবৃত্ত হওয়াও সম্ভব ছিল না। তাঁরা আশা করছিলেন সত্বর যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা চরম সিদ্ধান্তে পোঁছাতে পারবেন। তাই যে সমস্ত পরিকল্পনা খুব তাড়াতাড়ি ফলপ্রসূ হবে না সে সমস্তই নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের সমর্থনের জন্য আশু ফল পাওয়া যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ত—এ কথা জেনেই যে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা সামরিক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট এটম বোমা তৈরীর জন্য বিরাট শিল্প প্রচেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান নি।

অধ্যাপক হাইসেনবার্গ বড় সৌহার্দবান এবং তাঁর ব্যবহারের কোথাও বাহ্যিক দেখানো ভাবের লেশমাত্রও ছিল না।

আমি যখন মাক্স প্লাঙ্ক গেজেলশাফট দেখায় ব্যস্ত, সাধনা তখন গিয়েছিল "ফিভে" দেখতে। এ কারখানা ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি তৈরী করে: ডাঃ গটহেলফ লাইমবাক এখানকার ডিরেক্টর। খুব উৎসাহ ও আন্তরিকতা নিয়ে সাধনাকে সব ঘুরিয়ে দেখান। দুঃখের বিষয় তিনি ইংরেজী বলতে পারেন না বলে একজন দোভাষীর মারফতে কথাবার্তা চালাতে হয়। কিন্তু প্রতিটি ব্যাপারে তিনি যে ব্যবহার করেন তাতে তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। যে কামরায় বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পাঠ নিচ্ছে সেখানেও তাকে নিয়ে যান। ভারত ও পাকিস্থানের ছাত্রও ছিল। শরীরতত্ত্ব শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে যে 'সমস্ত' মডেল তৈরী হচ্ছিল সাধনার তা খুব ভাল লাগে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার উন্নতির এই প্রচেষ্টা তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বিদায়ের প্রাক্কালে ডাঃ লাইমবাক একটি ছোট শরীরতত্ত্ব বিষয়ক মডেল তার হাতে গুঁজে দিলেন এবং সম্মানিত অতিথির মর্যাদা দিয়ে ফটো তুলে রাখলেন। এরকম যন্ত্রপাতি যদি ভারতবর্ষে তৈরী হত তবে তা কত আনন্দেরই না হত!

অপরাহ্নে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব সেমিনার দেখতে গেলাম। ডাঃ ভালডশমিড্‌ট্ ঘুরিয়ে দেখালেন। লাইব্রেরী এবং সেখানে বাংলা ভাষায় লিখিত যে সমস্ত বই আছে তাও দেখালেন। অধ্যাপক কয়েকজন লোককেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাদের সংগে সাক্ষাতের জন্য। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপকের পরিচালনায় গবেষণা করছে এমন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রও ছিল। তিনি সাধনাকে ভারতের জাতীয় সংগীত গাইতে অনুরোধ জানালেন। ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য তিনি ম্যাগনেটোফোনে সে গান রেকর্ড করে রাখলেন। আমরা জার্মানীর জাতীয় সংগীত শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, বর্তমান জার্মানীর জাতীয় সংগীত বলতে কিছু নেই। অবশ্য পুরানো সংগীত—"ডয়েট্‌শল্যান্ড ডায়টশল্যান্ড ইউবার আলেস' গাইলেন। ভারতীয় একজন ছাত্রীও সেই সংগে সুর মিলাল। সে কিন্তু বললে ভারতীয় জাতীয় সংগীত গাইতে জানে না। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে যারা গাইতে

জানে, বিদেশে যাবার আগে আমাদের জাতীয় সংগীত অন্ততঃ যেন তারা শিখে যায়—এটি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আবার আমরা গেলাম অধ্যাপক ভালডশমিড্‌ট্‌-এর বাড়ীতে সান্ধ্য ভোজনের জন্য। "ফ্রাউ রোজে" (শ্রীমতী রোজে) একখানা বেনারসী সিল্কের শাড়ী পরেছিলেন এবং আমাদের জন্য বিশেষ খাবারও তৈরী করেছিলেন তিনি নিজে। যে সমাদর ও যত্ন তিনি করলেন তা ভুলবার নয়। সুদূর বিদেশে এ রকম বন্ধু পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যশালী মনে করলাম। গত রাতে আমরা জার্মানীর বিখ্যাত "রাইন ভাইন" খেতে অস্বীকার করি। তবু শ্রীমতী আজও আমাদের অনুরোধ জানালেন। সাধনাকে তিনি বলেন, "তুমি আমার মেয়ের মত। যদি কোনরকম অন্যায়ের কিছু হ'ত, কখনো তোমাকে আমি অনুরোধ করতাম না। অন্ততঃ একটু চেখে ত দেখ।" আমার অনুমতি নিয়ে সাধনা এক আউন্সেরও কম "রাইন ভাইন" খায়। আমি অবশ্য খেলাম না। যখন বিদায় নেবার সময় এল তখন মনে হ'ল কে জানে কখন আবার আমরা পরস্পরের সংগে মিলিত হব। তাই ১৯৫৪ সালে যখন কোলকাতায় তাদের পেলাম আমাদের মাঝে তখন আনন্দের সীমা রইল না।

ফ্রাংকফুর্ট গ্যেটের স্মৃতিজড়িত শহর। ১৯শে জুলাই আমরা তার উদ্দেশে রওনা হলাম। ট্রেণে ডাঃ ব্রেটস নামক এক ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হল। নানাভাবে সহায়তা করলেন।

সান্ধ্য ভোজনের পর আমরা পায়ে হেঁটে মাইন নদীর দুই তীর ঘুরে এলাম। এ যে কি আনন্দের। দেখলাম ছেলে মেয়ে এমন কি বৃদ্ধ মহিলারাও নাচের ভংগীতে 'স্কী' অভ্যাস করছে। তাদের স্বাস্থ্য মনে সোজাসুজি হিংসে জাগায়। ফ্রাংকফুর্ট ভীষণভাবে বোমাবিধ্বস্ত হয়েছিল। এখনও পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, তবুও জীবনের স্পন্দন অনুভব করলাম।

পরদিন সকালবেলা আমরা প্রথম "যোহান উল্‌ফগাংগ গ্যেটে" বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। বিখ্যাত কবি গ্যেটের নাম অনুসারেই এ বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে। আইন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য—এই পাঁচটি বিভাগ মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র। বার্ষিক খরচ প্রায় ৬০ লক্ষ জার্মান মার্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর দয়া করে 'লেবেনস মিটেল শেমি' বা 'খাদ্য রসায়ন বিভাগ' দেখবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেন। ডিরেক্টর অধ্যাপক ডিমায়ার অতি চমৎকার ভদ্রলোক। ভারী হাসিখুসি মুখশ্রী। ইংরেজী একেবারেই জানেন না। আমার জার্মান ভাষার সামান্য জ্ঞান দিয়েই কোনমতে কাজ চালালাম। তিনিও যতদূর সম্ভব সরল জার্মান ভাষায় এবং খুব স্পষ্ট করে বললেন। সমস্ত বিজ্ঞানাগার আমাদের দেখালেন তিনি। তারপর নিয়ে গেলেন 'পাউল এর্রলিশ ইনষ্টিটিউট'-এ। এখানে প্রধানতঃ যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে গবেষণার কাজ চলছে। এখনও অবশ্য কোন অব্যর্থ রোগ আরোগ্যকারক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

দ্বপ্বরবেলার খাওয়াটি সেরে আমরা "গ্যেটে হাউজ" দেখতে গেলাম। বাড়ীর চারদিককার ধ্বংসের দৃশ্য স্থানটির শান্ত শ্রীকে নষ্ট করে দিয়েছে। এমন কি বাড়ীর খানিকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মন বললে—"যুদ্ধ সভ্যতা ও কৃষ্টির সবচেয়ে বড় শত্রু।"

এই মহান সাহিত্যিক সংক্রান্ত সমস্ত জিনিসপত্রই সযত্নে রাখা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী জানে গ্যেটে একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক। কিন্তু তিনি ছিলেন শিল্পীও। তাঁর আঁকা 'ছায়াছবি' এবং সুন্দর হস্তাক্ষর দেখবার মত।

যে ঘরে কবি জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে তাঁর একটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি আছে। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়ার সোসাইটি কবির জন্মদিন উপলক্ষে এ মূর্তির জন্য একটি "লরেল" পাতার মালা পাঠিয়েছে দেখলাম। কবি-জননী অতি উঁচুস্তরের নারী ছিলেন। কবির মনের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

"গ্যেটে হাউজ" দেখতে দেখতে আমার মনে চিন্তা এল—উল্‌ফগাঙগ গ্যেটে জার্মানীতে কেন জন্মালেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বা কেন জন্মালেন বাংলাদেশে? একি শুধুমাত্র প্রকৃতির খেয়াল, না কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে এর পেছনে? এ "কেন"র যথাযথ উত্তর কেউই দিতে পারে না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, একমাত্র জার্মানীতেই গ্যেটের জন্ম সম্ভব হয়েছিল এবং বাংলাদেশেই সম্ভব হয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আমাদের দুর্ভাগ্য,—গ্রীষ্মকালে সমস্ত রঙ্গমঞ্চই বন্ধ ছিল। সেজন্য দুরন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্যেটের কোন নাটকের অভিনয় দেখতে পারলাম না।

ফ্রাঙ্কফুর্টে মাইন নদীর তীরে একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গে দেখা হয় ঘটনাচক্রে। একটি বেঞ্চির উপর তিনি বসেছিলেন। কিছুক্ষণ হেঁটে আমরাও এসে বসি সে বেঞ্চিতে। সাধনা তাকে জিজ্ঞাসা করে—"ইংরেজী বলতে পারেন?" "আমি ইংল্যান্ড থেকে এসেছি"—জবাব দিলেন তিনি। সাধনা আবার জিজ্ঞাসা করে—"ফ্রাঙ্কফুর্ট আপনার কেমন লাগছে?" জবাবে বললেন—"একটুও ভাল লাগছে না আমার এখানে। এই জার্মানরা ইংরেজদের ঘৃণা করে। আমাদের সঙ্গে মেশে না তারা, নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে যেতে চাই।" কী করে জার্মানরা ভালবাসবে ইংরেজদের? যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ দখলদার সৈন্যদল সে দেশে থাকবে, ততদিন এ হতে পারে না। এ কথাই আমার মনে এল। কিন্তু বললাম না কিছুই।

"হোটেল হানসা"—যেখানে আমরা ছিলাম,—একজন আমেরিকান সামরিক কর্মচারী এলেন সেখানে চা খেতে। একই টেবিলে আমাদের সঙ্গে বসলেন তিনি। প্রশ্ন করি,—"কেমন লাগছে আপনার জার্মানদের?" তিনি বললেন,—"আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই তারা করে, কিন্তু পছন্দ করে না আমাদের। এতো স্বাভাবিক। আমেরিকান দখলদার সৈন্যবাহিনীর একজন আমি। জার্মানদের অবস্থায় পড়লে

আমিও আজ ঠিক ঐ রকম ব্যবহারই করতাম!" এই আমেরিকান যুবক কর্মচারীর স্পষ্ট উক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না।

জার্মানীতে হোটেলের লোকেরা সাধারণতঃই আমাদের সহায়তা করেছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টের হোটেল হানসার মিসেস বোলটজা করেছেন সবচেয়ে বেশী। অন্তর থেকে তাঁকে ধন্যবাদ।

২১শে জুলাই, সকালবেলা মিঃ ফিটাই গাড়ী নিয়ে এলেন আমাদের ডার্মষ্টাড্‌ট্ নেবার জন্য। সেখানকার—"ই, মার্ক"এর বিখ্যাত কেমিক্যাল কারখানা দেখাবেন এই উদ্দেশ্যে। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং বেশ খোশমেজাজী ও ভাল লোক। মিষ্টি রোদ ওঠা সকালে, দু'ধারে সুন্দর পাইন গাছের সারির মধ্য দিয়ে ডার্মষ্টাড্‌ট্ যাবার পথ সত্যই উপভোগ্য।

ডার্মষ্টাড্‌ট্‌ও যুদ্ধ-ধ্বংসের অংশীদার। যদিও অনেকাংশে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে, তবুও চার পাশে এখনও ক্ষতির চিহ্ন বর্তমান। 'ই মার্ক' কোম্পানীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বহু পরিমাণে। রহাওয়ের মার্ক কোম্পানীও (নিউ জার্সি, যুক্তরাষ্ট্র) এই একই পরিবারের লোকের, কিন্তু বর্তমানে দুটি কোম্পানী স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে।

'ই মার্ক'-এ অতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাই। বর্তমান অধিকর্তা কার্ল মার্ক-এর সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমাদের স্বাগতঃ জানালেন তিনি।

রাজকীয় 'লাঞ্চ' (দুপুরের খাওয়া) পেলাম আমরা—ফটো তোলা হল; সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছিল আমার মতামতের জন্য, যদিও কোন মতামত আমি দেইনি। এ সমস্ত অভ্যর্থনার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি একথা দুঃখের সঙ্গে লিখছি যে, ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও যে বিভাগে বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হচ্ছে, সেখানে আমাদের নেওয়া হয়নি। এই বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর জন্যই এ কোম্পানীর খ্যাতি। রহাওয়ের মত আমাদের গবেষণাগার, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি খুব উৎসাহ সহকারেই দেখান হয়। আগে যদি জানতাম এ রকমটি ঘটবে তাহলে নিশ্চিত—আমরা এ কোম্পানী দেখতে যেতাম না।

ডাঃ ফিটাই এবার আমাদের নিয়ে চললেন হাইডেলবার্গ। যতই দক্ষিণে এগোই, ততই চারদিকের দৃশ্যাবলী মনোরম হতে থাকে। পর্বতশ্রেণী, ঘনসন্নিবেশিত পাইন গাছের সারি, সুগার বিট ও বাঁধা কফির সবুজ ক্ষেত, আপেলের সুন্দর নূতন ফলন্ত গাছ—চোখ ও মনকে জুড়িয়ে দিল। আপেল গাছগুলি মনে করিয়ে দিল ভারতের আম গাছের কথা। ছেলে ও মেয়েরা ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদের উচ্ছ্বলিত স্বাস্থ্যই সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয় মনকে। মোহনীয় স্বাস্থ্যের সে রূপ! রাস্তার ধারে বসেই ছেলেরা বিশ্রাম নিচ্ছে। শুধু সামান্য পোশাক শরীরে,—অনাবৃত অংশ দেখিয়ে দিচ্ছে কী অপূর্ব স্বাস্থ্য তাদের।

'নেকার' নদীর দুই তীর ধরে হাইডেলবার্গ শহর। পাহাড়ের শ্রেণী

তরুরাজি, অরণ্যভূমি ও নদী—সব মিলেজুলেই রমণীয় শহর হাইডেলবার্গ। বিদায় নেবার আগে ডাঃ ফিটাই আমাদের নিয়ে গেলেন পাহাড়ের উপর "ক্যোনিগলিশে ষ্টুল"-এ। লিফট-এ করে আমরা টাওয়ারের উপরে উঠি এবং চার পাশের সুন্দর দৃশ্য দেখি।

জার্মানীতে এই প্রথম 'নেকার' নদীর পারেই মশার কামড়ে উত্যক্ত হই। বলতে গেলে কি, মশার সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, বসার জায়গা ছেড়ে উঠে আসতে হল আমাদের।

অধ্যাপক ডাঃ আইকহোলটস-এর সঙ্গে দেখা করতে যাই পরদিন সকালে। ইনি ভেষজ শাস্ত্রের অধ্যাপক। হাইডেলবার্গ-এ আমাদের কার্যসূচী ঠিক করার ভার ছিল তাঁর উপর। একটি 'ফেরী বোট'-এ করে নদী পার হই। মাঝিকে জিজ্ঞাসা করি—'হাউপট্ষ্ট্রাসে' যেতে হলে কোন্ জায়গা থেকে আমি 'ষ্ট্রাসেনবান' বা ট্রাম ধরব। মাঝি একটি খুঁটির সঙ্গে নৌকাটি বেঁধে রেখে আমাকে সঙ্গে করে যেখান থেকে আমি ট্রাম ধরতে পারব সেখানে নিয়ে এল। বুঝলাম গ্যাটিঙগেনের অভিজ্ঞতা একক নয়। সাধারণ একজন মাঝির এ ব্যবহার আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করল। বহুবার এভাবে নদী পেরোতে হয়েছে, তাই আমাদের বন্ধুত্ব জমতে দেরী হল না। একজন জার্মানী প্রবাসী হল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে সেই মাঝিকে একদিন সামান্য তর্কবিতর্ক করতে শুনলাম। হল্যাণ্ডবাসী প্রথম কি বললে খেয়াল করিনি। মাঝি হঠাৎ চটে বলে উঠল,—"তোমরা তো যেদিকে হাওয়া বয়, সেদিকে নৌকা বাও! হিটলার যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তো তাঁর পায়ের তলা চেটেছে, এখন বলছ একথা—!"

ভেষজ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যাপক আইকহোলটস আমাদের নিয়ে যান অধ্যাপক হানস গাডামারের বাড়ীতে। ইনি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জার্মান ভাষায় অনূদিত তাঁর অনেক বই তিনি পড়েছেন। ভারত ও জার্মানীর মিত্রতাই শুধু তিনি কামনা করেন না, বরং বলেন—কাজে ও চিন্তায় যতদিন পর্যন্ত মানব জাতির একত্ব স্বীকৃত না হবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কল্যাণ হবে না। অধ্যাপক গাডমারের মতে জার্মানীর ভয়াবহ যুদ্ধ-ক্ষতির পর এই যে অসাধারণ দ্রুত পুনর্গঠন—এর মূলে রয়েছে দেশের শিক্ষাপ্রণালী। তিনি চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে খুশী হলাম।

সেখান থেকে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ দেখতে। ট্যানিক য়্যাসিড সংশ্লেষণের কাজে অধ্যাপক এমিল ফিশারের সহকর্মী অধ্যাপক ফ্রয়েডেনবার্গ এ বিভাগের প্রধান কর্তা। এ বিজ্ঞানাগারের গবেষণা সম্বন্ধে অল্পক্ষণ আলোচনার পর আমাকে বিজ্ঞানাগার ঘুরিয়ে দেখান হল। অতি অমায়িক ভদ্রলোক এই অধ্যাপক।

অপরাহ্ণে যাই হাইডেলবার্গের মাক্স প্ল্যাংক গেজেলশাফট্-এর ডিরেক্টর খ্যাতনামা রসায়নী অধ্যাপক রিচার্ডকুন-এর সঙ্গে দেখা করতে। চমৎকার লোক এ অধ্যাপক—প্রশান্ত স্থির এবং গম্ভীর। সমস্ত কিছুই কত যত্নের সঙ্গে দেখালেন আমায়। বর্তমানে মনুষ্য-দুগ্ধ নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

ভারতবর্ষ এবং জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক কাজ সংগঠনের কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। তাঁকে বলি যে, "কাইজার ভিলহেলম ইনষ্টিটিউট" (বর্তমান নাম মাক্স প্ল্যাংক গেজেলশাফট্)-এর মত প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা শুনেছি জার্মানীর বাইরে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের সঙ্গে মাক্স প্ল্যাংক গেজেলশাফট্-এর মত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষেও। আগেই আমি জানতাম এবং তিনিও বললেন যে, প্রথম শ্রেণীর কোন জার্মান বিজ্ঞানীই এখন জার্মানী ছেড়ে বাইরে যেতে রাজী নন।

রাত্রিবেলা আমরা অধ্যাপক আইকহোলটস-এর বাড়ী গেলাম "হাই-টি"র নিমন্ত্রণ রাখতে। শ্রীমতী আইকহোল্টস একজন স্নেহপ্রবণ মহিলা। নিজের "গ্র্যান্ড পিয়ানো"টি তিনি খুব ভালবাসেন, কিন্তু দশ বছর ধরে তাতে হাত দেননি। অবশ্য তাঁদের বাড়ীতে আমাদের আগমন উপলক্ষ করে তিনি দুটি গান বাজালেন সেই পিয়ানোতে। গানের একটি বিঠোফেনের। আমরা উপভোগ করলাম। সাধনাও দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনাল।

পরের দিন। অধ্যাপক আইকহোলটস আমাদের হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। এর নাম এখন "কার্ল রুপ্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়।" ডাঃ ই, স্মিডট রেক্টর। আমরা প্রথমে তাঁর কাছে গেলাম। ইংরেজী জানেন না তিনি। দেখে তাঁকে ভাল লোক বলে মনে হল।

প্রায় ৫০০০ ছাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং বার্ষিক খরচ প্রায় এক কোটি জার্মান মুদ্রা। অধ্যাপকদের নিয়ে শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৩ শত। একজন অধ্যাপকের সর্বোচ্চ বেতন বার্ষিক ১৩,৬০০ জার্মান মার্ক। এ ছাড়াও প্রায় ১০০০ মার্ক তিনি পান ছাত্র-বেতন থেকে। একজন 'লেকচারার'-এর সর্বনিম্ন বেতন ৬০০০ জার্মান মার্ক।

রেক্টরের নিকট থেকে যাই শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ কাসেলমানের কাছে। তিনি বেশ ভাল ইংরেজী জানেন। দুঃখ প্রকাশ করে বললেন তিনি, শ্রমিকদের চেয়েও স্কুল শিক্ষকরা কম বেতন পাচ্ছেন। স্কুল শিক্ষকদের কম বেতনের এই অভিযোগ শুনেছিলাম "লন্ডন ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন"-এও।

ওখান থেকে আমরা যাই "ফিলসফ গার্তেন" বা দার্শনিকদের বাগানে। সত্যিই শান্ত সমাহিত ধ্যান এবং চিন্তা করার জন্য উপযুক্ত জায়গাই বটে। এ বাগান শহরেরই একটি অংশ বিশেষ, শহরের মধ্যে এমন বাগান থাকা নিতান্ত কাম্য। বৃষ্টির ধারা সত্ত্বেও আমরা সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকি। তারপর শহরটিকে ভাল করে দেখব বলে হেঁটেই হোটেলে ফিরি।

২৪শে জুলাই পাটনা বিজ্ঞান কলেজ-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ এ টি মুখার্জী এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রী ডাঃ শ্রীমতী স্নেহ ব্যানার্জি এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমরা একসঙ্গে প্রথম সেখানকার দুর্গ দেখতে যাই। ভারী সুন্দরভাবে পাহাড়ের উপর দুর্গটির অবস্থিতি। রোমানরা এ দুর্গ নির্মাণ করে। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে আংশিকভাবে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ দুর্গ থেকে শুধু যে শহরের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে তা নয়—দূর থেকে বিস্তীর্ণ রাইন উপত্যকাও দেখা যায়। বহু লোক দুর্গ দেখতে এসেছিল। ক্যামেরাধারীদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল শাড়ী পরিহিতা দুজন ভারতীয় মেয়ে। তাদের ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না। সাধারণ সরল গ্রাম্য লোকের মত ব্যবহার করেছিল তারা।

'নেকার' নদীর তীরে নেমে এলাম আমরা। চিড়িয়াখানায় যাবার জন্য একটি মোটর বোটে উঠলাম। উজ্জ্বল রোদে ভরা দিনটি। ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ যতসম্ভব কম কাপড় পরে ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। চিড়িয়াখানায় এক জার্মান যুবক আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করল। চিড়িয়াখানা দেখা শেষ করে আমরা তিনজন হাঁটতে সুরু করে দিলাম। ডাঃ মুখার্জি অনেক আগেই ফিরে এসেছিলেন। বেশ গরম লাগছিল। প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। একটি ফলের বাগানের কাছে যখন এলাম, এত সুন্দর পিচ, এপ্রিকট এবং প্লুম ফল দেখে সাধনা এবং স্নেহ দুজনেই কিছু তাজা ফল খেতে চাইল—অবশ্য সম্ভব হলে। যে কৃষক বাগানে কাজ করছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কিছু ফল আমরা কিনতে পারি কিনা। সে আমাদের বাগানের ভেতর যেতে ডাকল। তার নাম ওস্কারহাক, জাতিতে ডাচ, কিন্তু এখন হাইডেলবার্গে স্থায়িভাবে বসবাস করছে। তার ব্যবহারে মনে হল তথাকথিত অনেক শিক্ষিত লোকের চেয়েও এ মানুষটির কৃষ্টিজ্ঞান ও মনুষ্যসুলভ গুণ অনেক বেশী। তাজা ফল, গাছ থেকে পেড়ে সে আমাদের দিল, কিন্তু মনে হল নামমাত্র দাম নিল। তার সঙ্গে আমাদের ফটো নিলাম। তারপর সে কতকগুলি ভারী সুন্দর গোলাপ ফুল বাগান থেকে তুলে তোড়া বেঁধে সাধনাকে দিল। জার্মান ভাষায় ঐ সামান্য বিদ্যাটুকু যদি আমার না থাকত, তা হলে এমন অপূর্ব অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে পারতাম না। জার্মানীতে এ অভিজ্ঞতা সবচেয়ে আনন্দের। মাতৃভাষায় কথা না বললে সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায় না।

এমন যে সুন্দর শহর হাইডেলবার্গ তারও অসুন্দর দিক আছে। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই মোটরবাইক-এর দুরন্ত গর্জন, এত দুর্দান্ত গতি তাদের—যেন শত্রু দেশ আক্রমণ করেছে, আর তারা ছুটছে তাকে রক্ষা করতে। এ ছাড়া ভ্রমণকারীদেব মোটর গাড়ীর আধিক্যও স্থানটির শান্ত সৌন্দর্য এবং শান্তি নষ্ট করে ফেলেছে।

২৫শে জুলাই সকাল। আমরা ষ্টুটগার্ট রওনা হই। রেলের কামরায় যে

যাত্রীটি কাছে বসেছিলেন জার্মান ভাষায় তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন,—"আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন। আমি ইংরেজ।" গত তিন মাসের মত তিনি জার্মানীতেই ছিলেন। তাঁর জার্মানীর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। জবাবে বলেন,—"জার্মানীর জন্যই যেন ইংলন্ড যুদ্ধ জয় করেছে। এখানে কোন রেশনিং ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দোকানগুলি পূর্ণ, হোটেলগুলি অনেক পরিচ্ছন্ন এবং খরচও কম।" এই কয়েকটি কথায় তিনি ১৯৫৩ সালের পশ্চিম জার্মানীর একটি জীবন্ত বর্ণনা দিলেন।

তিনটি দিন ষ্টুটগার্টে অতি চমৎকারভাবে কাটল। একজন জার্মান যুবক হান্‌স্‌ ইয়োবষ্ট্‌ ডিঙ্কেল এবং তাঁর নববিবাহিত পত্নী শ্রীমতী গুডরুন,—এদেরই কৃতিত্ব এ জন্য।

হান্‌স্‌-এর মা-বাবার সঙ্গে কোলকাতাতেই আমাদের পরিচয় এবং বন্ধুত্বও। গত যুদ্ধের সময়ে হান্‌স্‌ জার্মান বিমানবাহিনীতে ছিল এবং কিছুদিনের জন্য যুদ্ধবন্দী হয়। আমরা যখন যাই সে তখন ষ্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা টেক্‌নিশে হোকশুলের স্থপতি বিদ্যা-বিভাগের ছাত্র। সে বছরই তার শেষ পরীক্ষার সময়। গুডরুনের বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী। যুদ্ধে তিনি মারা যান। গুডরুনের ভাইয়ের জীবনও সেভাবেই শেষ হয়। সেজন্য চেহারায় তার দুঃখের একটা ছাপ লেগেছিল। শিল্পী সে। তার তৈরী কার্পেট এবং জানলার কাচে আঁকা ছবি দেখে খুসী হলাম।

হোটেলে এসে পেঁছাবার একটু পরেই হানস্‌ 'স্বাগতম' জানাবার জন্য প্রচুর ফুলের স্তবক নিয়ে হাজির হল। একটা কাগজে লিখে রেখে গেল যে, একটু পরেই আবার আসবে। কথিত সময়ের কাঁটায় কাঁটায় সে এল এবং তার বাড়ী 'ষ্টুটগার্ট' 'ফয়ারবাক'-এ আমাদের নিয়ে গেল। গিয়ে মনে হল যেন কোন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে,—আত্মীয়ের বাড়ীতে এলাম। আপন করে নিল তারা আমাদের। প্রতিটি কাজের পেছনে এত স্নেহ, ভালবাসা জড়ানো ছিল,—ভুলে গেলাম এই আমাদের প্রথম পরিচয়। অতি সোজাসুজি সান্ধ্যভোজনের আয়োজন—ষ্ট্রবেরী ফলের রস দিয়ে আরম্ভ আর প্রচুর পরিমাণে দুধ খেয়ে ভোজন শেষ করার ব্যবস্থা। হান্‌স্‌ দুধ পছন্দ করে এবং দৈনিক দেড় লিটার থেকে দুই লিটার পর্যন্ত দুধ খায়। বিমান-বাহিনীর আক্রমণ, ধ্বংস ইত্যাদি,—ষ্টুটগার্ট-এর সমস্ত কথাই শুনলাম তাদের কাছে। এত অধিক সংখ্যক শরণার্থীর আগমন হয়েছে এ শহরে—জনসংখ্যা বেড়ে পাঁচ লক্ষে থেমেছে। যুদ্ধপূর্ব সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ।

পরদিন সকালে হান্‌স্‌ ও গুডরুন এল আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য। "কিলিস্‌বার্গ পার্ক গার্ডেন"-এ প্রথম নিয়ে গেল। ঝর্ণা, গাছপালা ও ফুলে ভরে আছে বাগানটি। পরিষ্কার ঘাসের লন্‌ এবং বেঞ্চি ইত্যাদি রাখা হয়েছে লোকজনদের বসবার জন্য। দর্শকদের আনন্দ পরিবেশনের জন্য ব্যান্ড বাজছিল,

ফলের দোকান ও রেস্তোরাঁর বন্দোবস্ত ছিল। এত পরিমাণে এমন সুন্দর কলা এখানে দেখতে পাব আশা করিনি। দর্শকদের সুবিধার দিকে নজর রেখে প্রত্যেকটি কাজ করা হয়েছে। দড়ির রেল বা "সেসেলবান"-এর ব্যবস্থাও ছিল। ওপোর থেকে সমস্ত বাগানের দৃশ্য দেখবার জন্য হান্‌স্‌ ও সাধনা দড়ির রেলে চড়ল। জার্মানরা আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানায়, কাছে এসে বসে এবং আলাপ জমায়। অবশ্য এদের মধ্যে কেউই প্রায় ইংরেজী জানতেন না। এখানে এসে কে ভাবতে পারবে যে, এ দেশ এত ক্ষতি সয়েছে এই কিছুদিন আগে? বাঙালীদের সঙ্গে জার্মান চরিত্রের একটা সমধর্মিতা আছে। এমন কি দুঃখের মধ্যেও তাঁরা আনন্দ করতে পারে।

বাসে করে সমস্ত শহর ঘুরে দেখবার পর আমরা "স্লশ সলিচিউড"-এ যাই। অষ্টম শতাব্দীতে ভ্যুরতেমবার্গ-এর রাজা কর্তৃক নির্মিত এ দুর্গের উপরে উঠে চার পাশের যে দৃশ্য চোখে পড়ল,—অতি চমৎকার। অরণ্যের ভেতর দিয়ে মেঠো পথে হাঁটবার লোভ সামলান গেল না। হেঁটেই চললাম। কাঁকর বিছান এই বন্ধুর পথ আশেপাশের বুনো ষ্ট্রবেরী ও ফুল—অদ্ভুত এর আকর্ষণ। হিমালয়ের পথে 'পাকদণ্ডি'র কথাই স্মরণে এল। এভাবে যে গ্রামে এসে থামি তার নাম "ভাইল ইম ডর্ফ"। ট্রাম ষ্টেশনের কাছে একটি বেঞ্চে বসলাম। এক বুড়ো ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় সেখানে এসে বসেছিলেন আগেই। আমাদের বসার সঙ্গে সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিলেন তিনি। ভারতবর্ষের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন—আমরাও জার্মানীর সুখী ভবিষ্যৎ কামনা করলাম।

২৭শে হান্‌স্‌ আমাদের নিয়ে গেল "টেক্‌নিশে হোক্‌শুলে" দেখাতে। প্রথমে গেলাম "ষ্টুডেণ্টেন হিলফে"-তে। ছাত্রেরা এখানে দুপুরের খাবার, এমন কি কম দামে পোশাক এবং জুতোও পায়। ৬০ ফেনিস্‌ (১০০ ফেনিস্‌=১ জার্মান মার্ক=১ টাকা ২ আনা) দিয়ে দুপুরের খাবার এবং ২৩ ফেনিঙ্‌-এ আধ লিটার দুধ পাওয়া যায়। সতেরো শ' ছাত্র দৈনিক এখানে খাবার খায়। রান্নাঘরটিও দেখলাম। ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। ব্যবস্থা অতি সুন্দর। প্রধান বিল্ডিং-এর চারিদিক ঘুরে আমরা গেলাম রসায়ন বিভাগে। একজন বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী,—অধ্যাপক সি. ভি. রমন,—এর আলোকচিত্র এই প্রথম দেখলাম এখানে। পাশ্চাত্যের আর কোথাও দেখিনি। বিজ্ঞানাগারে "রমণএফেক্ট-এর উপর গবেষণা চলছে। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সমস্তটা আমাদের দেখান হল।

চার হাজার ছাত্র পড়ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দুপুরের খাওয়ার জন্য একটি নিরামিষ রেস্তোরাঁয় গেলাম। খাবার ঘরটি প্রায় সম্পূর্ণ ভর্তি। কোথায় গিয়ে বসবো তা নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। একজন জার্মান মহিলা সাধনার কাছে এসে বললেন—"চলুন, আমাদের টেবিলে বসবেন।" ঠাসাঠাসি করে বসে তারা হানস-এর জন্যও একটা জায়গা করে দিল।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখ করি। জার্মানীতে নিরামিষ রেস্তোরাঁয় মাছ-মাংস থাকে না, কিন্তু ডিম থাকে।

হান্স্-এর বাড়ীতে রাত্রিবেলার খাবার তৈরী হবে বাঙ্গালী পদ্ধতিতে। বিকেলবেলা বাজারে গিয়ে আমাদের পছন্দমাফিক জিনিসপত্র কিনলাম। সম্ভবতঃ সে বাজারের কেউ ভারতীয় পোশাকে কোন ভারতীয় মেয়েকে কখনও দেখেনি। লোকজনের ঔৎসুক্য মনে বিস্ময় জাগাল। রান্না করল সাধনা, গুডরুন তাকে সাহায্য করল আর খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল কিভাবে ভারতীয় খাবার তৈরী করতে হয়। হান্স্ ও গুডরুন প্রাণভরে সে খাবার উপভোগ করল,—আমরাও। সমস্তটাই যেন পারিবারিক ব্যাপার।

২৮শে তারিখ সকালবেলা হান্স একটি "সর্বসাধারণ স্নানাগার"-এ আমাকে নিয়ে গেল। সকলের ধারণা এখানকার জলে খনিজ পদার্থ আছে, সেজন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। অনবরত ব্যবহৃত জল বেরিয়ে যাচ্ছে আর পরিষ্কার জল ঢুকছে। পুরুষ ও নারী—উভয়েরই জন্য এই স্নানাগার, কিন্তু কোথাও কোনও প্রকার অশিষ্টাচার নেই। আমাকেও কেউ কোন অসৌজন্য দেখাল না, এখানকার জলটি অবশ্য আমার পক্ষে একটু বেশী ঠাণ্ডা ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা স্নানে কাটাই!

স্নানাগার থেকে ফিরেই রওনা হলাম ষ্টেশনে। ন্যুরেনবার্গের ট্রেণ ধরব আমরা।

গুডরুন ষ্টেশনে এল, হাতে তার লাল ও হলুদ রংয়ের মিষ্টি গোলাপের গুচ্ছ।

আমাদের ট্রেণ ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বৃষ্টির মধ্যেও হান্স্ এবং গুড্রুন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি পথের আড়ালে না যায়। যে স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাদের কাছে পেলাম, স্মৃতিতে চির জাগরূক হয়ে থাকবে তা।

ট্রেণে খাবার গাড়ী ছিল না। ষ্টেশনে যা কিছু পাওয়া যাবে তাই খেয়ে নেব ঠিক করলাম। রেলওয়ে কণ্ডাক্টরকে খাওয়া সম্বন্ধে বললাম। তিনি নিজে খাবার কিনে নিয়ে এলেন। যত রকমে সম্ভব তিনি আমাদের সহায়তা করলেন।

ন্যুরেনবার্গের নাম জানে সমস্ত জগৎ,—অধুনালুপ্ত নাৎসী দলের সকল কাজের কেন্দ্র হিসাবেই এর খ্যাতি। কিন্তু একথা খুব কম লোকেই জানে, বিখ্যাত জার্মান শিল্পী আল্ব্রেক্ট ড্যুয়েরারের জন্মভূমিও এই ন্যুরেনবার্গ। "এম এ এন" কোম্পানীর প্রতিনিধি হের ভিলহেলম শ্যেফার প্রথম আমাদের নিয়ে গেলেন এই খ্যাতনামা শিল্পীর বাসস্থানে। তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলীতে প্রচণ্ড প্রতিভার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট।

নূতন ও প্রাচীন—দুই স্থাপত্য হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ন্যুরেনবার্গ-এ। দুই সুর তার পাথরে পাথরে। পুরাতন দিনের চিহ্ন দাঁড়িয়ে আছে তার বেদনার

কাহিনী শোনাবার জন্য আর বলবার জন্য—

"জগতের যত রাজা মহারাজ

কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ!"

—ক্ষণস্থায়ী সকল ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের আত্মিক প্রকাশ! ড্যুরেরারের বাড়ী এবং অন্য কয়েকটি পুরানো বাড়ীতে দেখলাম বাইরের দেয়াল চিত্রকলা। একই ধরণের কাঠের কাজও নজরে আসে। অতি পুরানো গির্জাটিও দেখি। এরও খ্যাতি নাকি ক্যোলন গির্জারই মত। এর ভাস্কর্যে মৌলিকত্ব আছে। যুদ্ধের সময়ে এটিরও ক্ষতি হয় প্রচুর। হেঁটে হেঁটে আমরা দুর্গ পর্যন্ত এলাম। উপরে উঠে সমস্ত নুরেনবার্গ শহরের পরিপূর্ণ ছবিটি দেখলাম!

শিল্পীর বাড়ীতে যাবার পথে চোখে পড়ে ফুল, ফল ও সব্জীর খোলা বাজার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জিনিসপত্রও ষ্টুটগার্টের চেয়ে সস্তা। মাঝারি আকারের একটি ফুলকপি ষ্টুটগার্টে এক জার্মান মার্ক অথচ এখানে তার দাম আধা মার্ক অর্থাৎ ৫০ ফেনিস্।

পরের দিন সকালে আমরা "এম এ এন" কোম্পানী দেখতে যাই। শতকরা ৮৫ ভাগ বোমায় ধ্বংস হয়েছিল এই কোম্পানীর। কিন্তু বিমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'আশ্রয়স্থল' এত মজবুত ছিল যে মাত্র দুইজন কর্মী নিহত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কারখানা প্রতিদিন কয়েকটি করে 'ট্যাঙ্ক' তৈরী করেছিল। ডার্মষ্টাড্‌ট-এ 'ই, মার্ক'-এর অভিজ্ঞতার দরুণ হের রিচার্ড কার্ষ্টেনইয়ানকে জিজ্ঞাসা করি আমরা সমস্ত কিছু দেখতে এবং ক্যামেরা ভেতরে নিতে পারি কিনা। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ইনি। বেশ মানুষটি,— মনখোলা ও ভারী রসিক। তিনি বললেন, "সমস্ত কিছুই দেখতে পারেন এবং নিজের ক্যামেরাও সংগে নিতে কোন বাধা নেই। একটা কারখানা শুধু মাত্র চোখে দেখে এবং কয়েকখানি ফটো তুলে যদি কেউ আমাদের চেয়েও ভাল কাজ করতে পারে তবে তিনি তার যোগ্যই।"

সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হলাম কারখানার পুরানো যে অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে তার সংগে নতুন তৈরী অংশের পার্থক্য লক্ষ্য করে। নতুন অংশ অনেক বেশী উন্নত। কলকাতার লেক অঞ্চলের সুন্দর বাড়ী ও বস্তি অঞ্চলের বাড়ীর মধ্যে যে পার্থক্য এও যেন প্রায় সে রকমটি। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এল কল্যাণ। এ কারখানা নতুন করে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে কর্মীরা অনেক বেশী সময় সেখানে থাকতে ভালবাসে। ৪০ ফেনিস্ বা সাত আনা মূল্যে কর্মীরা দুপুরের খাওয়া পেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার জন্য সর্বনিম্ন বেতনের হার ৬৩ জার্মান মার্ক। কারখানায় মাত্র একজন নারী কর্মী আছেন। তিনি এলুমিনিয়ম নলদণ্ড তৈরী করছেন। খুব সুখী মনে হল তাঁকে। প্রতি সপ্তাহে ৮৪ জার্মান মার্ক হিসাবে রোজগার করছেন তিনি।

দুপুরবেলার খাওয়া সেরে আবার আমরা শহর দেখতে বে'র হলাম। অমন সুন্দর টাউন হলটি একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। সামান্য অংশ মাত্র নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছে। নাৎসী দলের জমকাল কংগ্রেস ভবনটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। রোমান পদ্ধতিতে নির্মিত ভবনটি কৃত্রিম একটি হ্রদের পারে অতি সুন্দর-ভাবে অবস্থিত। যে "ষ্টেডিয়াম" থেকে নাৎসী নেতা জনতাকে সম্বোধন করতেন তা বাস্তবিকই মনের উপর রেখাপাত করে। বক্তৃতামঞ্চের দুই পাশের সিঁড়িতে প্রায় এক হাজার পদমর্যাদাশালী ব্যক্তির বসবার আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। মঞ্চের উপরে জার্মান জাতীয় চিহ্ন ঈগল পাখী আছে। প্রশস্ত রাজপথের কিনারা ঘেঁষে একদিকে এই—"ষ্টেডিয়াম" অন্যদিকে বিরাট সবুজ মাঠ—সেখানে এক লক্ষ লোকের বসবার মত জায়গা।

হের ও ফ্রাউ কার্ষ্টনেইয়ান এলেন বিকালবেলা। ছোট্ট নদী টাউবারকে নীচে রেখে পাহাড়ের উপরে ছোট্ট অথচ খ্যাতির চিহ্ন বুকে করা শহর রোঠেনবুর্গ। সে শহর দেখাতেই তাঁরা নিয়ে গেলেন। টাউবার উপত্যকা খুব উর্বর। মাঠে সোনালী গম, আপেল গাছের সারি আমাদের যাত্রাপথকে রঙীন করে রাখল। ফসল কাটার দিন তখন,—নারী ও পুরুষ একসংগে গানে মেতেছে। ব্যাভেরিয়াবাসী কৃষকদের জীবনের কিছুটা ইংগিত পেলাম এতে। একটি সুন্দর পার্ক আছে শহরে,—রকমারী রঙীন ফুলে ভরা। শরণার্থী মেয়েদের দেখলাম সে পার্কে,—বসে ব্লাউজে বুটি তোলা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত।

জুলাই ৩০শে। সকাল। আমরা ন্যুরেনবার্গ ছেড়ে ম্যুনসেন বা মিউনিক রওনা হলাম। হের এবং ফ্রাউ কার্ষ্টনেইয়ান আমাদের ন্যুরেনবার্গ-এর দিনগুলোকে সকল রকমেই মধুর করে রেখেছিলেন। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ রইল তাঁদের জন্য।

ম্যুনসেন-এ পেঁাছেই আমাদের প্রথম কাজ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে যাওয়া। অধ্যাপিকা এলিজাবেথ ডানের কাছে আমার পরিচয়পত্র ছিল। পশ্চিমের দেশগুলি সফর করার সময় এই একজন মাত্র মহিলা অধ্যাপক দেখি বিজ্ঞান বিভাগে। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশেই বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা অনেক কম এবং অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত মহিলার সংখ্যা আরও অনেক কম। কিন্তু একমাত্র মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম ক্যুরীই দুবার নোবেল পুরস্কারের সম্মান লাভ করেন।

অধ্যাপিকা ডানে বেশ সাধাসিধে হাসিখুশী মহিলা। সাধনার শাড়ী দেখার জন্য তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না—তাঁর মতে এ পোশাক 'ভারী সুন্দর।' বললেন আরও, এমন পোশাককে কোটের নীচে ঢেকে রাখতে হয়েছে এ বড় দুঃখের কথা। সাধনার কোট খুলে তিনি শাড়ী দেখলেন।

বিখ্যাত মিউনিক বিজ্ঞানাগারের কথা জিজ্ঞাসা করি। সজোরে হেসে জবাব

দিলেন যে, সেটি এখন একটা বড় গর্ত মাত্র—বোমায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। বললেন তারপর "যুদ্ধের পরে ভাবতে পারিনি আবার গবেষণা কাজ সুরু করতে পারব আমরা। কোনমতে সে কাজ আরম্ভ করতে সমর্থ হয়েছি অন্য বিভাগের একটা অংশ নিয়ে।" ঘুরে ঘুরে তিনি আমাদের সমস্ত দেখালেন। সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরানো বিজ্ঞানাগারটি যে স্থানে ছিল তা-ও দেখলাম। ফন বায়ারের প্রতিমূর্তিটি অবশ্য রক্ষা পেয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত বিজ্ঞানাগারের কাছে দাঁড়িয়ে সাধনা অধ্যাপিকা ডানেকে বলল—"আর্ট গ্যালারী, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—এগুলির ধ্বংস সত্যিই মনকে বড় বেদনা দেয়।" মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন,—"দুঃখ করবেন না, নতুন এসে পুরানোকে ভরিয়ে তুলবে।"

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অধ্যাপিকা ডানের প্রচুর শ্রদ্ধা। "তিনি সত্যিকার মানুষ ছিলেন," শ্রদ্ধার সংগে বললেন অধ্যাপিকা।

বিজ্ঞানাগারের বর্তমান কর্তা অধ্যাপক হুইচগেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এত বড় পদে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তাঁকে যখন অভিনন্দন জানালাম তিনি বললেন—"এ পদ অধ্যাপক রিচার্ড কুনকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খ্যাতনামা অধ্যাপক যখন হাইডেলবার্গ ছেড়ে আসতে অনিচ্ছুক হলেন, তখনই এ পদে আমার ডাক পড়ল।"

পুরানো বিজ্ঞানাগার যেখানে ছিল সেখানেই আবার প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানাগার নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন তিনি। তিনি বললেন "আরও, অনেক নামকরা অধ্যাপক কাজ করে গিয়েছেন এ বিজ্ঞানাগারে কিন্তু একে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানাগার বলা যায় না। যদি এটা বোমাবিধ্বস্ত না হতো তা হলে সম্ভবতঃ প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানাগার তৈরীর সুযোগ কোনদিনই পেতাম না আমরা।" তখন আমি বলি, "অমঙ্গলের ভেতর দিয়েও মঙ্গল আসে।" হেসে তিনি মাথা নাড়লেন। এর পর আমেরিকার রাসায়নিক গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করি। তিনি বলেন,—"গত পঁচিশ বৎসর বা সেরকম সময়ের মধ্যেই আমেরিকা অনেক দূর উন্নতি করেছে। তার প্রচুর অর্থ আছে, যন্ত্রপাতি এবং বিপুল সংখ্যক গবেষণাকারী কর্মীও আছে। অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ইত্যাদির সঙ্গে আমেরিকার পত্রিকার তুলনা করলেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।" অধ্যাপক হুইচগেন ও অধ্যাপিকা ডানে দুজনেই সুন্দর মানুষ, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাই আনন্দ পেলাম।

ভোর প্রায় সওয়া ছয়টা তখন। হোটেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি রাজমিস্ত্রীরা ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈরীর কাজে হাত লাগিয়েছে। দেখে বুঝলাম কত গুরুত্ব নিয়ে জার্মানরা তাদের গৃহ-সমস্যা সমাধানের জন্য উঠে-পড়ে কাজে নেমেছে।

ছোটখাট কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন হ'য়ে পড়ায় কিনবার জন্য কয়েকটি

দোকানে গেলাম। ব্যাভেরিয়াবাসীরা কত মিশুক এবং কত আন্তরিক তাদের ব্যবহার, এ সব দোকানগুলিতে এসে বুঝতে পারলাম।

বিকালবেলা আমরা গেলাম যানবাহন প্রদর্শনী দেখতে। পঁচিশ বছর অন্তর এই প্রদর্শনী হয়। ঐ চুর মধ্যে দেশ কতটা অগ্রসর হয়েছে জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে জানানোই উদ্দেশ্য। এবার অবশ্য হল আটাশ বছর পরে, আর হয়েছিল সেই ১৯২৫ সালে। কি বিপুল আয়োজন। রেল গাড়ী, মোটর গাড়ী, মোটর বাইক, ট্রাম, টেলিফোন, বিমান ইত্যাদির উন্নতি বিশেষ যত্নের সংগে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীর কেউই ভাবতে পারবে না যে, মাত্র অল্পদিন আগে যুদ্ধের দাপটে এদেশ এত দুঃখ সহ্য করেছে। গত মাত্র পাঁচ বছরে এতদূর উন্নতি করেছে এদেশ, দেখে আশ্চর্য হলাম! দূরাগত দুইজন ভারতীয়কে দেখে রেলওয়ে প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোক প্রায় দৌড়ে এলেন। বন্ধুজনোচিত আলাপ আরম্ভ করলেন এবং চা খেতে আমন্ত্রণ জানালেন আমাদের। কিন্তু হাতে সময় কম ছিল বলে দুঃখের সংগে তা প্রত্যাখ্যান করতে হল। তিনি বললেন, ধনগোপাল মুখার্জীর একটি বই এবং মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পড়েছেন। ভারতের কাশী নগরীতে এসে ভারতীয় ধর্মপুস্তক সম্বন্ধে পড়াশুনা করার ইচ্ছাও তাঁর আছে জানালেন।

১লা আগষ্ট, সকাল। আমরা বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক হাইনরিস ভিলাণ্ডের সংগে দেখা করতে গেলাম তাঁর বাড়ীতে। মুানসেন থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে ষ্টার্নবার্গ-এ তিনি থাকেন। বর্তমানে ৭৫ বছর বয়স পেরিয়ে গেছেন, স্বাস্থ্যও ভাল নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর মানসিক ক্ষমতা রয়েছে অটুট। তাঁর তিনজন বাঙ্গালী ছাত্রের নাম এখনো মনে রেখেছেন, গাঙ্গুলী, বোজে এবং বাসু। আন্তরিক দরদের সংগে তিনি তাঁদের নাম করলেন। ইংরেজী বলার সময় এত বেশী জার্মান শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন, জার্মান ভাষা সম্বন্ধে যার জ্ঞান নেই তার পক্ষে বোঝাই মুস্কিল। ইংরেজীতে যে চিঠি লিখি তাঁর কাছে, জার্মান ভাষায় তার জবাব লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু হাতের লেখাটি এত সুন্দর যে, আমার পড়তে বা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। সেই চিঠির জবাবের ভেতর দিয়েই তাঁর মানসিক সৌন্দর্যের আভাষ পেয়েছিলাম।

তিনটি প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রথমটি গত পাঁচ বছরের মধ্যে জার্মানীর আশ্চর্য রকম পুনরুত্থানের কারণ কি? তিনি বলেন—"যুদ্ধের ঠিক পরেই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। এমন কি আমার কয়েকজন বন্ধু আত্মহত্যা করলেন : কিন্তু জার্মান জাতির সহজাত জীবনীশক্তি আবার এদেশকে তুলে ধরেছে। আজ আমি সুখী।" দ্বিতীয় প্রশ্ন করি রাশিয়া সম্বন্ধে। বলি, "বিজ্ঞানের উন্নতিব পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়াকে আগে অনুন্নত দেশ বলে গণ্য করা হত। গত কয়েক বছরের মধ্যে সে এত বেশী উন্নতি করল, এ-কী করে সম্ভব হল?" রাশিয়া বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে আগে পিছিয়ে পড়া দেশ ছিল, একথা তিনি স্বীকার করলেন

না। "এমন কি ফন্‌বায়ারের সময়েও সেখানে অনেক বড় বড় রসায়নী ছিলেন। অনেক ভাল রসায়নী আমার বিজ্ঞানাগারেও গবেষণা কাজ করেছেন। কিন্তু এখন আমি তাদের কাছে চিঠিও লিখতে পারি না।" তৃতীয় প্রশ্ন হল ভারতবর্ষের রাসায়নিক গবেষণার মান কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন ইঙ্গিত তিনি দিলেন না।

পণ্ডিত নেহরুর বৈদেশিক নীতিকে তিনি সমর্থন করেন জানালেন। কিন্তু আজকের যে ভারতবর্ষ, তার প্রকৃত জন্মদাতা মহাত্মা গান্ধী—বললেন এ কথাও।

ঘরের মধ্যে আমাদের সঙ্গে তাঁর দুখানা ফটো তোলা হল। কিন্তু সেগুলি ভাল নাও উঠতে পারে ভেবে, সাধনা তাঁকে অনুরোধ জানাল, একটু কষ্ট করে বাইরে আসার জন্য। খুশী মনে তিনি বাড়ীর ভিতরের লনে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী এবং নাতনীও সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমাদের আনন্দ বাড়ালেন।

অধ্যাপকের সঙ্গে অনুপম একটি ঘণ্টা কাটিয়ে রওনা হলাম "ব্যাভেরিয়ান আল্পস"-এর উদ্দেশে। বাতগ্রস্ত রোগীদের স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে খ্যাত "বাড্ টোলটজ"-এ দুপুরের খাওয়ার জন্য থামি। এর পর গেলাম "টেগারণ-জী"তে। বৃষ্টি ছিল, সেজন্য বোটিং করা সম্ভব হল না। আরও উঁচুতে উঠে গেলাম "শিলয়ারজী" তারও পরে "স্পিঠজইং-জী।" পর্বত-শীর্ষে ছোট্ট হ্রদ এই "স্পিটজইং-জী।" মানুষের মনের সমস্ত সুন্দর কল্পনা জাগিয়ে তোলে, এমন জায়গা! এতদূর উঠতে পেরে কী যে আনন্দ হল, অপরিসীম! এখানেও জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে মিশবার জন্য উদগ্রীব ছিল। ফেরার পথে আবার "শিলয়ার-জী"র কাছে এলাম—বৃষ্টি থেমে গেছে তখন। চকচকে রোদ। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টার মত—বোটিং করলাম সে হ্রদে। গাড়ীর চালক এবার ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে বিখ্যাত রাজপথে এসে পেঁছাল। বিস্তৃত জায়গা জোড়া মোটর চলার পথ এটি। চারটি গাড়ী একসঙ্গে আসা ও চারটি একসঙ্গে যাবার মত যথেষ্ট যায়গা আছে। আমেরিকার লিঙ্কন হাইওয়ের কথাই মনে পড়ল তখন।

"এম-এ-এন" কারখানার হের আপেল গ্রেহাম যদি না থাকতেন, তাহলে ম্যুনসেনের এ সমস্ত জায়গা দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

জার্মান-ভূমিতে এই আমাদের শেষ দিন। জার্মান জাতি স্বভাব-মিশুক। তারা অতিথিবৎসল ও বিদেশীদের প্রতি মমত্ববোধ এবং অকপট ব্যবহার—তাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। সকল স্তরের লোক—অধ্যাপক, ছাত্র, কৃষক, মাঝি, হোটেল-চালক. রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর, শুল্ক বিভাগের কর্মচারী, রেলওয়ে ষ্টেশনের মালবাহক, দোকানী নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে—চেনা-অচেনা যারাই এসেছে কাছে, আমাদের সহায়তা করেছে। এত দূরে থেকে কিভাবে তাদের এ ঋণ শোধ করতে পারি। জার্মানীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আনন্দের হোক এ কামনাই করতে পারি মাত্র।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে,—যদি জার্মানরা এত ভাল হয় তবে বহুদেশে জার্মান সৈন্যের নিষ্ঠুরতার যে সব কাহিনী শুনতে পাই তার কি জবাব? অত্যুক্তিদোষ ও সবে কিছু পরিমাণে থাকতে পারে কিন্তু কাহিনীর সমস্তটুকুই যে একবারে মিথ্যে, তা বলতে পারি না। মানব প্রকৃতির দুটি দিক—দেবত্ব এবং পশুত্ব। যুদ্ধ মানুষের পশুত্বকে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়, সে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলন্ড, রাশিয়া অথবা ভারতবর্ষ যে দেশই হোক না কেন। পরিমাণে উনিশ-বিশ হতে পারে মাত্র। পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধ যদি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে মানুষ তার আত্মাকে ফিরে পাবে। উপরওয়ালাকে মেনে চলা জার্মান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ হয়ত তারা করেছে। জার্মানীতে রুশদের নির্মম অত্যাচারের কত কাহিনীও তো শুনেছি। রুশদের প্রতি জার্মানদের এত বেশী ঘৃণা যে বার্লিনে এমন কি তাদের বলতে শুনেছি,—"আমেরিকানরা যদি না থাকতো, রাশিয়ানরা এখানে আসতো। ওঃ সে যে বিভীষিকা!"

অতীতের জন্য অশ্রুবিসর্জন করছে—জার্মানীর কোথাও এ দৃশ্য দেখলাম না। অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাদের চোখে মুখে। সে আশা নিয়েই তারা খেটে চলেছে—পরিশ্রম ফিরিয়ে আনবে তাদের সুন্দর দিন।

মাত্র পাঁচ বছরের মত সময়ের মধ্যে জার্মানীর এত আশ্চর্য উন্নতি কি করে সম্ভব হল সংক্ষেপে তার কারণগুলি আলোচনা করতে চাই। বিশেষ বা একক কোন কারণকেই নিশ্চিত বলতে পারি না,—কিন্তু বহু জিনিসের সম্মিলিত ফল এই উন্নতি। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হানস্ গাডামারের মতে জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থাই এ উন্নতির কারণ। অধ্যাপক হাইনরিস ভিলান্ড-এর অভিমত এই যে, জার্মান জাতির সহজাত জীবনী শক্তিই এজন্য দায়ী। হামবুর্গের একজন ব্যবসায়ী জোর দেন জার্মানীর মুদ্রানীতির উপর। ১৯৪৮ সালে জার্মানীর সমস্ত প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে নূতন মুদ্রার প্রচলন করা হ'ল। দেশবাসীকে তাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যাংকে তিন দিনের মধ্যেই জমা দিতে বলা হল। মাথা পিছু মাত্র ৪০টি জার্মান মুদ্রা রাখার অনুমতি পেল। এর পরেই নতুন মুদ্রা বাজারে চালু করা হল। যাঁরা মুদ্রা ব্যাংকে জমা দিলেন শতকরা নির্দিষ্ট একটা হারে কিছুটা অর্থ তাঁদের তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেওয়া হল। তারপরে কি ভাবে সে অর্থ তাঁরা সঞ্চিত করেছেন সে বিষয়ে তদন্ত করা হল। সেই তদন্তের বিবরণীর উপর নির্ভর করে অর্থ পরিশোধ করা হল এবং তাও একসঙ্গে নয়,—আস্তে আস্তে, অন্যায়ভাবে উপার্জিত মুদ্রা সমেত দেশের সমস্ত মুদ্রা ব্যাংকের হাতে এসে গেল। তাদের নীতি একজন জার্মান অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের ভাষায়,—"খাদ্য দ্রব্যের রেশনিং-এর পরিবর্তে আমরা টাকা-পয়সার রেশনিং ব্যবস্থা করি।"

আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্যস্বরূপ পশ্চিম জার্মানী পেয়েছে তিন বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার পক্ষপাতী একজন ভদ্রলোক বলেন, এই অর্থ সাহায্যই জার্মানীর

দ্রুত পুনর্গঠনের মূল কারণ। সম্ভবতঃ একথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, ইউরোপের বহু দেশই মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার এ সাহায্য পেয়েছে, কিন্তু কোন দেশই তুলনায় জার্মানীর পাশেও দাঁড়াতে পারবে না। জার্মান সরকার এই অর্থের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং কোন্ বিষয়টিকে প্রথম প্রাধান্য দিতে হবে তা সরকার ভালোভাবেই জানতেন। এমন কি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধমতবাদী রাজনৈতিক দলও তাকে "অসাধু" নামে দোষী করে না। "পলিসি" সম্বন্ধে সমালোচনা চলে অবশ্য। জার্মান জাতি কঠোর পরিশ্রমী। তারা মনে করে একটি ঘণ্টাও যদি নষ্ট হয় তাহলে তাকে আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না। হয়তো বা উত্তরাধিকার সূত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গী তারা পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাই তাকে উজ্জিবীত করে রেখেছে। জার্মানীতে ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক এবং প্রত্যেকেই প্রয়োজন মত খাদ্য, পোশাক এবং চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকে। অনুভব করে সে—পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার তার আছে। জার্মানীর দ্রুত অভ্যুত্থানেব কারণ এগুলিই। আরও গুছিয়ে তাকে এভাবে বলা যায় ঃ—

(১) কঠোর পরিশ্রমী এই জার্মান জাতি। জীবনের একটি ঘণ্টা নষ্ট হলে তাকে আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না—এই তাদের জীবন দর্শন। (২) শাসন ব্যবস্থা সৎ। (৩) প্রাপ্ত তিন বিলিয়ান আমেরিকান ডলারের সদ্ব্যবহার। কোন্ কাজ প্রথম করতে হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান। (৪) নিজ পরিশ্রমের ফল উপভোগ করতে পারবে, জনসাধারণের এ বিশ্বাস। (৫) প্রচলিত মুদ্রা সংস্কার, পুরানো মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে নূতন মুদ্রার প্রচলন। এর ফলে সকলের মনে এ বিশ্বাস হল যে, রাষ্ট্র মাত্র কয়েকজন ধনীর চেয়েও সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতি অধিক যত্নশীল। (৬) উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কর্মক্ষমতা এবং শিক্ষা—এ দুটিই তাদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দায়ী। এ দৃষ্টিভঙ্গীই তাদের প্রকৃত শক্তি।

জার্মান জাতি যে কাজ সম্পন্ন করেছে সেজন্য তাকে প্রশংসা না করে পারি না। কিন্তু আমাদের মনে হল একটি কথা। যুদ্ধের কথা না ভেবে এবং সমস্ত মানবজাতি এক—এ কথা উপলব্ধি করে যদি মানবের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য নিজেদের বুদ্ধি ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করে তা'হলে অনেক বেশী কাজ সুসম্পন্ন করতে পারবে তারা,—পৃথিবীতে নামবে শান্তি ও সুখ।

পঞ্চম অধ্যায়

সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স

"লিন্‌ডাউ আম্‌ বোডেনজী" (কনষ্ট্যান্স হ্রদের উপর লিনডাউ)-ই জার্মান-ভূমিতে আমাদের শেষ ষ্টেশন। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা এলেন আমাদের ছাড়পত্র ইত্যাদি ঠিকমতো আছে কিনা মিলিয়ে দেখতে। রীতি এই ঃ—যাত্রীর কাছে খুচরো এবং 'চেক' সমেত কত পরিমাণ অর্থ আছে তার একটা ঘোষণা দিতে হয়—জার্মানীতে প্রবেশ করার সময় এবং সে দেশ থেকে চলে আসার সময়েও। জার্মান শুল্ক-কর্মচারীরা যখন এলেন, তখন আমাদের ঘোষণাপত্র লেখা হয়নি। সামান্য একটু অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করি যাতে ভুলে যাওয়া ঘোষণাপত্রগুলি আমরা পূরণ করতে পারি। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন,—"কিছু ভাববেন না, আপনাদের ছাড়পত্র আমাকে দিন। আপনাদের যা যা জিজ্ঞেস করা একান্ত দরকার তা জিজ্ঞেস করে ঐ ঘোষণাপত্র আমিই পূরণ করে দেবো।" তা-ই তিনি করলেন এবং তারপর বললেন, "অনুগ্রহ করে স্বাক্ষর করুন।" আশাতিরিক্ত এই ব্যবহার।

লিন্‌ডাউ-এর আগের ষ্টেশনে কিছু ফল আমরা কিনতে চাই। একজন সহযাত্রী জার্মান যুবক গিয়ে আমাদের জন্য ফল কিনলেন। ট্রেণ ছেড়ে দিচ্ছে প্রায়, এমনি সময়ে ঘর্মাক্ত শরীরে দৌড়ে তিনি গাড়ীর কামরায় উঠে এলেন।

লিনডাউকে জার্মানী এবং অষ্ট্রীয়ার শহর বলাই সংগত। ছুটির মরশুম সুরু, এবং অষ্ট্রীয়ায় তখন সংগীত-উৎসব চলছিল। নরনারী সকলেই নিজ নিজ উৎসবের পোশাকে সেজে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন খ্যাতনামা গায়ককে স্বাগতম জানাবার জন্যে। এ দৃশ্য "ব্রেগেন্‌ট্‌জ" ষ্টেশনে আরও মুখর হলো। সমবেত যন্ত্রসংগীত চলছিল ষ্টেশনেই। তাদের পোশাক ও চলাফেরা দেখে ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলের জনসাধারণের কথা মনে জাগলো।

আমাদের ঠিক সামনেই একজন আমেরিকান ভদ্রলোক (মিঃ এ এইচ ষ্টাওলার-ম্যান) এবং তাঁর স্ত্রী বসেছিলেন। একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁদের দেখবো আশা করিনি। ভদ্রলোক একজন বৈজ্ঞানিক, আমেরিকার নৌ-বিভাগের সংগে যুক্ত আছেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই আমাদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর দিলেন। মহিলা অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। ইউরোপে মাঝে মাঝে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে সে সম্বন্ধে বললেন কিছু কিছু আমাদের। প্রায় সকলেরই ধারণা—আমেরিকাবাসী মাত্রেই ধনী। সেজন্য যত পরিমাণ সম্ভব তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের একটা প্রবৃত্তি ইউরোপে রয়েছে। মাঝে মাঝে তাই রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁরা রাত কাটিয়েছেন তবু কোন হোটেলে যান নি।

ট্রেণে যাত্রীদের বেজায় ভীড় ছিল। অনেককে সারাটি পথ দাঁড়িয়েই থাকতে হল। এ সত্ত্বেও কোথাও গোলমালটি হল না। যাত্রীরা একজন অন্যজনকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করছে। একটি বৃদ্ধ সুইচ-পরিবার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নেহাৎ সাধারণ সরল চাষী-পরিবার। সমস্তটি পথেই তাঁরা মদ পান করেন, খেয়ে এবং প্রতি ষ্টেশনেই জানলার ধারে মুখ বাড়িয়ে একটা মজার আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন। বৃদ্ধা আমাদেরও 'পানীয়' দিলেন: "আমরা মদ খাই না"—এ জবাবে তার মুখচোখের অবস্থা দেখবার মত। সম্ভবতঃ সারাজীবনেও তিনি এমন কথা কারো কাছে শোনেননি এবং পৃথিবীতে মদ খায় না এমন লোকও আছে একথা ভাবতেও পারেননি নিশ্চয়। এর পরে তিনি আমাদের এপ্রিকট দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে তা গ্রহণ করলাম।

আমরা নেমে গেলাম জুরিখে। বিশ্ববিদ্যালয়-শহর হিসাবে এ জায়গার খ্যাতি। এখানকার কথ্যভাষা জার্মান। সুইট্জারল্যাণ্ডে তিনটি মুখ্যভাষার চলন আছে,—জার্মান, ফরাসী এবং ইটালীয়ান। জুরিখ, বার্ন, বাজেল এবং জেনেভা—এই চারটি শহর আমরা দেখি। তার মধ্যে কেবল জেনেভাতেই ফরাসী ভাষা ব্যবহৃত হয়। অন্য তিনটি শহরে জার্মান ভাষাই প্রধান। বলতে গেলে সমস্ত সুইট্জারল্যাণ্ডে জার্মান ভাষারই ব্যবহার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের মধ্যে।

জুরিখে পা দিয়েই বুঝলাম জার্মানীর সঙ্গে সুইট্জারল্যাণ্ডের পার্থক্য। রেলওয়ে পোর্টারের ব্যবহারই জানিয়ে দিল আমরা আর জার্মানীর মাটিতে নই। হোটেলগুলিও জার্মানীর হোটেলের মত পরিষ্কার নয় অথচ খরচও বেশী।

শ্রীমতী মার্গারেট হোনাওয়ার এবং শ্রীযুক্ত হোনাওয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ'রা জুরিখের বাসিন্দা। "ভিণ্ডাম" জাহাজেই এ'দের সঙ্গে আলাপ। তাঁরা যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। শ্রীমতী হোনাওয়ারের প্রাণখোলা হাঁসি ভোলা সহজ নয়। তা তাঁর প্রাণখোলা অন্তরেরই পরিচয়। তিনি যেন মহারাষ্ট্রনিবাসী শ্রীমতী আশাতাঈ বাঘমারের প্রতিমূর্তি। এ'র বাড়ীতে অতিথি ছিলাম এলোরা দেখতে গিয়ে।

শ্রীমতী হোনাওয়ার আমাদের জুরিখ হ্রদের চারপাশে ঘুরিয়ে দেখালেন, সে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ও। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বাইরে থেকেই শুধু দেখলাম। একটি পাহাড়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়টি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমস্ত শহরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনটি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রয়েছে নগ্ন পুরুষ ও নারীর পাথরে তৈরী প্রতিমূর্তি। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের নব-নির্মিত ভবনটি দেখতে ভারী সুন্দর। প্রখ্যাতনামা রসায়নী অধ্যাপক রুৎসিসকার কাছে আমার পরিচয়পত্র ছিল। কিন্তু তিনি দেশের বাইরে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানাগারটি পরিচ্ছন্ন করা ও সংস্কারের কাজ চলছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের ঘুরিয়ে দেখান হল। খ্যাতনামা অধ্যাপকের ব্যক্তিগত গবেষণাঘরটি

আমাদের জন্য খোলা হল। তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমরা সকল প্রকার সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার পেলাম।

জুরিখ ষ্টেশনে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। আমরা যখন ম্যুনসেন থেকে আসি তখন হোটেল থেকে একজন লোক ষ্টেশনে এসেছিলেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। তিনিই মালবাহককে পারিশ্রমিক ইত্যাদি দিলেন। হোটেলের লোকেরা বিল দেবার সময় সেই পারিশ্রমিকের পরিমাণ লিখে দেন তাতে। কিন্তু যখন জুরিখ ছেড়ে আসি বার্নে যাবার জন্য তখন সেই একই পরিমাণ মালপত্রের জন্য মালবাহক অনেক বেশী দাবী করল। আমি একজন রেলওয়ে কর্মচারীকে ডাকলাম এবং মালবাহক কম নিতে বাধ্য হল। এতদিনের মধ্যে পশ্চিমের কোথাও এ রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়নি।

৪ঠা আগষ্ট,—জুরিখ থেকে আমরা এলাম বার্নে। খরস্রোতা "আরে" নদীর উপর অবস্থিত "বুন্ডেস্‌হাউস্‌" বা পার্লামেণ্ট ভবনটি বাস্তবিকই চমৎকার। শহরটির সর্বত্রই রোমান ভাস্কর্যের প্রভাব চোখে পড়ে। শহরের নিজস্ব পতাকার উপর যে প্রিয় জন্তুটি স্থান করে নিয়েছে তা হল ভল্লুক।

শ্রীমতী বিনয়কুমার সরকার, ভারতীয় দেশভক্তের অষ্ট্রিয়াজাত স্ত্রী। বার্নে থাকার দিনক'টিকে সুন্দর করে রাখবার জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দ পেলাম। যদি ভারতবর্ষের জন্য তাঁর সেবাকে নেওয়ার ব্যবস্থা হতো তাহলে কতই না সুখের হতো,—তিনিও অনেক বেশী সুখী হতে পারতেন! তাঁর কন্যা ইন্দিরা ও তিনি শহর ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের।

বার্নে সুইচ্‌ রেডক্রশ-এর ব্লাড প্লাজমা প্রতিষ্ঠান দেখি আমরা। ডাঃ হানস্‌ সাগার খুব যত্নের সঙ্গে সে সব দেখালেন। সব মিলিয়ে সেখানে ৪০ হাজার লোক আছেন রক্ত দান করার জন্য এবং বছরে ৭০ থেকে ৮০ হাজার লোককে রক্ত দেওয়া হয়। রক্তদাতা এবং গ্রহীতা সকলেই সুইটজারল্যান্ডের অধিবাসী। ডাঃ সাগার মনে করেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্ত দেওয়া হচ্ছে। তাঁর নিশ্চিত অভিমত এই যে, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কাউকেই রক্ত দেওয়া উচিত নয়। প্লাজমা প্রস্তুতের সময় রক্তের হিমোগ্লোবিন অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা একে ব্যবহারের জন্য কোনও উপায় নির্ণয় করতে সমর্থ হননি। এ এক প্রচন্ড ক্ষতি। প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। ডাঃ সাগার সুন্দর ও আলাপী ভদ্রলোক, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকেও শ্রদ্ধা করতে জানেন।

পাহাড়ের চুড়োয় অবস্থিত "গুর্তেন ক্যুলম"-এ যাই বরফাচ্ছাদিত আল্পস পর্বতশ্রেণীর সুন্দর দৃশ্য দেখবার জন্য। চমৎকার রোদে ভরা দিন ছিল। জায়গাটিকে সযত্নে রাখা হয়েছে এবং একটি ভাল রেস্তোরাঁও রয়েছে ওখানে। কিন্তু উল্লেখ না করে পারছি না—কালিম্পং (দার্জিলিং জিলা) থেকে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য অনেক বেশী সুন্দর,—অতুলনীয় মহিমাদ্যোতক। অবশ্য যাত্রীদের সুখ-সুবিধার

ব্যবস্থা সুইটজারল্যাণ্ডে অনেক ভাল। গুর্তেনক্যুলম-এ একজন মহিলা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

৬ই আগষ্ট আমরা বার্ন ছেড়ে রওনা হলাম বাজেলের দিকে। পথে একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এলাম। এর দৈর্ঘ প্রায় ১০ কিলোমিটার (১·৬ কিলোমিটার= ১ মাইল)। এত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ এর আগে কখনো আর পেরোইনি। সুইচ ইঞ্জিনীয়ারা এ সকল সুড়ঙ্গ তৈরীর জন্য এবং পার্বত্যপথে রেললাইন তৈরীর জন্য বিখ্যাত। সমস্ত রেলগাড়ীগুলিই বিদ্যুৎচালিত।

রাইন নদীর তীরে বাজেল শহর; রাসায়নিক কারখানা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কো-অপারেটিভ সংস্থা ইত্যাদির জন্য খ্যাত। সুইট্জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানী এই তিনটি দেশের সংযোগ স্থলে রয়েছে বাজেল শহর।

সুইচ কনজিউমারস ইউনিয়ান-এর ডাঃ ভেরনার কেলারহালস আমাদের সব কিছু দেখাবার জন্য তাঁর যথাসাধ্য করেছেন।

সুইচ কনজিউমারস ইউনিয়ন একটি শ্রীসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। আমাদের জানান হল যে, সাড়ে চার মিলিয়ন লোকের মধ্যে ৭০০,০০০ লোক এ ইউনিয়নের সদস্য। বাজেল এবং তার উপকণ্ঠে প্রায় ৯০,০০০ সদস্য রয়েছে। দেশের লোকজনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের শতকরা ১০ ভাগ এই ইউনিয়ন সরবরাহ করে। ইউনিয়নের কয়েকটি দোকানও দেখলাম। খুশী হলাম।

বাজেলে রাইন নদী খরস্রোতা। নৌকাপথে এ নদী পার হবার ব্যবস্থা বেশ তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক।

রাইন বন্দর দেখতেও গিয়েছিলাম এবং লিফট-এ চড়ে টাউয়ারের উপরে উঠেছিলাম। সেখান থেকে তিনটি দেশের তিন অংশের মিলিত দৃশ্য দেখলাম। রাইনের অপর তীরে ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চল, কিছু দূরে জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেষ্ট। ফ্রান্স এবং জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাপটে লোরেনবাসীরা যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করেছে। যখন জার্মানীর অধীন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল জার্মান ভাষা আবার এখন ফরাসীর অধীন বলে সে ভাষার স্থান নিয়েছে ফরাসী।

বাজেলের রাইন নদীপথে জাহাজ আসা-যাওয়া-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত। সাঁতার কেটে অতি সহজে এপার থেকে ওপারে যাওয়া যায়, কিন্তু ভিসা না দেখিয়ে কেউ সে কাজ করতে পারে না। এমন কি নদীটিও ত্রি-শক্তির কাছে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভগবান নদী সৃষ্টি করেছেন সকলের কল্যাণের জন্য, কিন্তু মানুষের অনুদারতা তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে! এ ধরণের ভাগাভাগি অজ্ঞাতসারে বিরোধিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। এর পরিণাম যুদ্ধ। টাউয়ারের উপর দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম মধ্য ইউরোপের যুদ্ধবীজ। সাবাস সুইট্জারল্যাণ্ড! গত দুই যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখার হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল।

একটি সুইচ মহিলার সঙ্গে দেখা হলো এখানে। তাঁর বিচিত্র পোশাক অতি

সুশোভন। পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীরাই আগে এ পোশাক ব্যবহার করতো, এখনো কেউ কেউ করে।

'গাইগি' এবং 'সিবা'—এই দুই কোম্পানী রং. ওষুধ এবং পোকানাশক সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত। দুটি কোম্পানীই আমি দেখি। 'গাইগি' ডি, ডি, টি আবিষ্কার করে। এ সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূলে রয়েছে আলকাতরা। যতদূর আমি জানি সুইট্‌জারল্যান্ডে কয়লা নেই অথবা আলকাতরা তৈরীর কোন কারখানাও নেই। আলকাতরায় অবস্থিত জৈব যোগজ এবং রং তৈরীর জন্য তা হতে সংশ্লেষিত অত্যাবশ্যক পদার্থসমূহ সে আমদানী করে জার্মানী এবং আমেরিকা থেকে। সুতরাং এ অতি প্রশংসনীয় যে, সে উৎপন্ন সংশ্লেষিত রং ও ওষুধ জার্মানী ও আমেরিকা এই দুই দেশের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করে বাজারে বিক্রী করে। এখানেও আমি জানতে পারলাম যে, এই শিল্পে জার্মানী অতি দ্রুততায় স্ব-স্থানে ফিরে আসছে।

পশ্চিমের অন্যান্য কয়েকটি কারখানার মত 'সিবা' এবং 'গাইগি' এই দুই ফ্যাক্টরীতেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়াসমূহ দেখাবার অনিচ্ছা লক্ষ্য করলাম, যদিও উৎপাদন বিভাগ আমাকে দেখান হল। 'গাইগির' নূতন কারখানা "সোয়াইট্‌জার হাল" দেখাতে আমাকে নিয়ে যায়।

আলকাতরা হতে প্রাপ্ত জৈব যোগজ হতে রং প্রস্তুতের প্রক্রিয়ার একাধিক বা বহু স্তর আছে। শেষ স্তরে পৌঁছাবার পূর্বে যে সমস্ত যোগজ উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যকালীন যোগজ বলা যেতে পারে। এই 'হালে' সেইরূপ জিনিস তৈরী হচ্ছে। 'সিবা'য় কারখানার একটি নূতন তৈরী অংশ আমাকে দেখান হয়। এখানে কোরামিন ও আরো ওষুধ তৈরী হচ্ছে। এটি একটি সর্বাধুনিক যান্ত্রিক উৎপন্ন ব্যবস্থা। বিদ্যুৎচালিত নিয়ন্ত্রণ-কামরা হতে সবটা পরিচালিত। সমস্ত দালানে খুব অল্প কয়েকজন কর্মী আছে। বাংলার রাসায়নিক কারখানাগুলির সুইট্‌জারল্যান্ডের মত রং ও ওষুধ তৈরীর কথা চিন্তা করা উচিত।

এ সমস্ত কারখানা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা বর্তমান। রাইখষ্টাইন, রুৎসিসকা ও কাহরার—এদের মত খ্যাতিমান রসায়নবিদরা এ সকল কারখানার পরামর্শদাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির জন্য কারখানাগুলিও সহায়ক। অতি স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা! ভারতবর্ষের পক্ষে এ সহযোগিতার ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়।

৮ই আগষ্ট। আমরা বাজেল থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হই জেনেভা। এখানেও পথে মস্ত বড় এক সুড়ঙ্গ পার হতে হয়। চার পাশের সৌন্দর্যময় দৃশ্য আরও মনোরম হয়ে উঠেছে দ্রাক্ষালতা বাগানের স্পর্শে।

এক মাসেরও উপর ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তিন দিনের বেশী কোথাও একটানা থাকিনি। সুতরাং সুইটজারল্যান্ডে আসবার আগে

'বোডেনজী' হ্রদের তীরে কোন জায়গায় সপ্তাহখানেকের জন্য নিরিবিলি বিশ্রাম করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা স্থির করলাম যে, জেনেভায় সপ্তাহখানেক বিশ্রাম নিয়ে তার পর ফ্রান্স যাত্রা করব। এর মধ্যে ফ্রান্সে রেলওয়ে এবং ডাক-ধর্মঘট সুরু হল। সেজন্য অভিপ্রেত সময়েরও বেশী কাটাতে বাধ্য হলাম জেনেভায়; কিন্তু এখানে থেকে খুব যে আরাম পেলাম তা নয়। কারণ, আমাদের জন্য যে হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাকে খুব পরিচ্ছন্ন বলা চলে না। জেনেভা আসার দিনই একজন বাঙ্গালী মহিলাকে যখন হোটেলের অপরিচ্ছন্নতার কথা বলি, তখন তিনি বললেন,—"ফ্রান্সকে এর চেয়েও অপরিষ্কার মনে হবে।" এ মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ফ্রান্স থেকে এসেছেন জেনেভা ভ্রমণে। শুনে নিরাশ হলাম। যা হোক, প্রয়োজনীয় সময়টুকু ছাড়া হোটেলে আমরা খুব কমই থেকেছি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের (আই এল ও) শ্রীঅমল ঘটক এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য যথেষ্ট করেছেন।

জেনেভায় আমাদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণের বস্তু ছিল সূর্যোদয়, মনোরম হ্রদ এবং তুষার কিরীটি মঁঃ ব্ল্যা। হোটেলের কামরা থেকেই সূর্যোদয় দেখা যেতো। বিকালের পড়ন্ত রোদে বরফাচ্ছাদিত মঁ ব্ল্যা'র যে মহিমাময় দৃশ্য হ্রদের তীরে বসে চোখে পড়ত, স্বপ্নের মায়া দিয়ে আকর্ষণ করতো বুঝি বা। পশ্চিমের কতো দেশ ঘুরলাম, এত দীর্ঘ দিনের মধ্যে কোথাও অমন সূর্যোদয় দেখিনি একদিনও। প্রায় প্রতিদিনই 'বোটিং'-এ যেতাম এবং কয়েকদিন ধরে সাঁতারের আনন্দও উপভোগ করলাম হ্রদে। ইয়োরোপ ভ্রমণ শেষ করে আমেরিকা রওনা হবার আগে ভেস্‌লী যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, আমরা যে শুধু 'বোটিং' করলাম তা নয়, ষ্টীম-চালিত নৌকা করে আমরা তিনজন প্রাচীন "নিয়" শহর দেখতে গেলাম। দেখতাম, হ্রদে শত শত লোক দৈনিক স্নান করছে, আবার রোদে পুড়ছে। কেউ কেউ 'বোটিং'-এর আনন্দে মশগুল। অন্যের 'ওয়াটার স্কী' খেলায় মেতে আছে।

প্রথম দিনেই শ্রীযুত ঘটক পুরো শহরটি ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের। 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (আই এল ও)' এবং 'সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ বা ইউ এন ও' দেখলাম সেই সঙ্গে। আই এল-ও-এর সামনে একজন ডেনিস ভাস্করের নির্মিত কালো পাথরের দুইটি মূর্তি আছে,—একটি সাধারণ শ্রমিকের, অন্যটি কয়লাখনির শ্রমিকের। দুটিই শিল্পের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! ভবনের ভেতরে ডাচ জলচিত্র এবং ফরাসী "টেপেষ্ট্রী" বা চিত্রশোভিত দেয়াল-পর্দা রয়েছে।

এ সব দেখার পর একটি চিন্তা মনে এল। কেন হল্যান্ড এত শিল্পীর জন্মক্ষেত্র হতে পেরেছে—আর কেনই বা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের আকার-ভূমি, যার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য মানুষ ছুটে আসে প্রত্যন্ত থেকে—সেই সুইটজারল্যান্ড শিল্প-প্রতিভার সৃজন করতে পারেনি। সে চিন্তার ফলশ্রুতি হল এই—হল্যান্ড সৌন্দর্যপ্রেমিক এবং মুগ্ধ ভক্ত। সেজন্যই জগৎবিখ্যাত শিল্পীর জন্ম সম্ভব হয়েছে

সে দেশে। আর স্ইটজারল্যাণ্ড তার সমস্ত নৈসর্গিক র্পকে ব্যবহার করেছে অর্থ উপার্জনের কাজে, তাই শিল্পের স্ষ্টি-ক্ষমতা সেখানে বন্ধ্যা।

যে স্থানে 'লীগ অব নেশনস্'-এর ভবনটি ছিল, আজকের ইউ এন ও প্রাসাদটি ঠিক সেস্থানেই। সামনে একটি সোনালী রংয়ের "গ্লোব" রয়েছে,—রাশিচক্রের দ্বাদশটিই আছে তাতে। ব্হৎ শক্তির ক্ট চক্রান্তে ব্যর্থ হয়েছিল 'লীগ অব নেশনস্'। ভয় হয়, ঠিক ঐ একই কারণে 'ইউ এন ও' ভাগ্যের পাশাখেলায় সমানভাবেই হেরে যাবে।

'ফেটে ডি জেনেভ্' বা জেনেভা উৎসব স্র্ হল। আমাদের থাকাকালে এ উৎসবই হল মনে রাখবার মত জিনিস। উৎসবের দিনগ্লি স্ইচ জনসাধারণের মনকে খ্লে ধরল আমাদের কাছে। আত্মীয়ের মরমীভাবে ভরে উঠেছিল মন, বিদেশী শব্দটি ভুলে গিয়েছিল তারা সেদিন।

জেনেভা উৎসব আরম্ভ হয় ১৪ই আগষ্ট এবং তিনদিন চলে সে সমারোহ। সমস্ত হ্রদ অঞ্চলটি বিশেষভাবে সাজানো এবং আলোকমালায় দীপ্ত করা হ'ল। প্রথম দিন ব্যাণ্ড, বিউগল এবং পাইপ ইত্যাদি সঙ্গে শোভাযাত্রা বের হল। বাজেল, বার্ন, জেনেভা এবং পাহাড়ী অঞ্চলের নিজ নিজ বিশিষ্ট পোশাকে সজ্জিত হয়ে মহিলারা এ শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। তাঁদের সকলেরই হাতে ফ্লের তোড়া। আরও দক্ষিণে এগিয়ে দেখলাম, সমবেত জনতার উচ্ছ্বাস। কাগজের গোল ছোট ছোট রঙীন গন্ধভরা ট্করো ম্খে-মাথায় ছ্ড়ে দিয়ে একজন অন্যজনকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। চেনা-অচেনা—ঐ একই ভাবে সকলে সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছে। জনতা ঐ ভাবে আমাদেরও প্রীতি জানালে। স্ইটজারল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে একাত্ম অন্ভব করলাম আমরা। এ যেন ঠিক আমাদের 'হোলি উৎসব'। ম্খে ও মাথায় রঙীন আবীরের পরিবর্তে এরা ছ্ঁড়ে দিচ্ছে রঙীন গোল কাগজের ট্করো ম্ঠো ম্ঠো করে। সমস্ত রাস্তা ভরে আছে ঐ কাগজের ট্করোতে। মাথার চুলে, পোশাকের ভিতর সেদিন শ্ধ্ ঐ ট্করো কাগজ! সমস্ত জেনেভা ছ্টির আনন্দে মেতেছিল; কিন্তু সমস্ত উৎসব-আনন্দ হ্রদ অঞ্চলের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছিল।

১৫ই আগষ্ট রাত্রিবেলা বাজী পোড়ান হল এন্তার। মনে জাগল দীপালি উৎসবের কথা। এত স্সংবন্ধ করে বাজী পোড়াবার ব্যবস্থা ছিল, দ্র্ঘটনা ঘটবার কোন আশঙ্কাই ছিল না। সত্যিই এ চমৎকার বন্দোবস্ত। ছোট ছোট রাস্তায় বা যেখানে-সেখানে বাজী না প্ড়িয়ে এক জায়গা থেকে বাজীর খেলা দেখান হ'ল, আর হ্রদের তিনধারে ঘিরে বসে সকলে দেখতে পেল এবং উপভোগ করল। বাজীগ্লিও খ্ব উন্নত র্চির মনে হ'ল। সত্যিই প্রাণভরে উপভোগ করলাম সমস্তট্কু।

সবচেয়ে মজার শোভাযাত্রা বে'র হ'ল ১৬ই আগষ্ট দ্প্রবেলা; কিন্তু আমরা পোঁছাবার আগেই এত ভীড় হয়েছিল যে, ঠিকমতো দাঁড়াবার একফোঁটা জায়গাও

ছিল না। একজন ভদ্রমহিলা সাধনার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন, যাতে সে ভালভাবে দেখতে ও ফটো নিতে পারে। রাজ্যাভিষেকের কায়দায় ঘোড়া এবং কোচগাড়ী সাজানো হয়েছে, ফুল দিয়ে কত রকমেরই না সব মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। একজন লোক ভল্লুক সেজে এসেছে, কে বলবে সে আদপেই ভল্লুক নয়! ফুল দিয়ে বিচিত্র পোশাক পরে মেয়েরা পরী সেজেছে। এ সব দেখে পূর্ববঙ্গের ঢাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমী মিছিলের কথা মনে এল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে দুদিন ধরে এ উৎসব পালন করা হত ঢাকায়। মানুষের প্রকৃতি এবং মন অদ্ভুতভাবে এক। পূর্বই হোক আর পশ্চিমই হোক। জেনেভা উৎসব সুইচদের জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা দিল, অন্য কিছুই তা দিতে পারেনি।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছিল ১৫ই আগষ্ট। সেইদিনের স্মরণে জেনেভার ভারতীয় 'কনসাল জেনারেল' উপস্থিত সকল ভারতীয়দেরই আমন্ত্রণ জানান। বহু ভারতীয়ের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করে দিল এ আমন্ত্রণ। অবশ্য আমার মনে হ'ল ঐ দিনের অনুষ্ঠানকে আরও সুন্দরভাবে পালন করা যে'ত। যে গ্রামোফোন রেকর্ডে জাতীয় সংগীত বাজান হ'ল, তা অতি নিচুদরের; এ ধরণের রেকর্ড ব্যবহার করা নিতান্তই অনুচিত। ভারত সরকারের উচিত, ভারতীয় সমস্ত বৈদেশিক দপ্তরকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড রেকর্ড সরবরাহ করা। সাধনা, নানজী (বোম্বের একটি পার্শী মেয়ে) এবং শ্রীমতী ঘটক তারপরে জাতীয় সংগীত গাইল। দেখে ব্যথা পেলাম,—জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় কয়েকজন ভারতীয় দিব্যি কথা বলে চলছিলেন।

ঘড়ি তৈরীর জন্য সুইটজারল্যাণ্ড প্রসিদ্ধ এবং সুইচ রপ্তানী বাণিজ্যে ঘড়িই প্রথম স্থান অধিকার করে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশ তৈরীর সমস্ত কারখানাগুলিই "বিল" শহরে অবস্থিত। জেনেভায় যে সমস্ত কারখানা রয়েছে, সেখানে শুধু বিভিন্ন অংশ জোড়া দেবার কাজ হয় এবং টেষ্ট করা হয়। এ রকম দুটি কারখানা আমরা দেখি,—একটি "সলভিল" অন্যটি "রোলেক্স"।

ঘড়ির কারখানায় কাজ করার জন্য বিশেষ ট্রেণিং দরকার হয় এবং ঘড়ির কাজ করার অর্থ চোখকে পীড়ন করাও। 'সলভিল' কারখানায় মাসিক সর্বনিম্ন বেতনের হার চারশ' পঞ্চাশ সুইচ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় পাঁচশ ভারতীয় মুদ্রা। এ সকল কারখানা দেখার সময় বার বার মনে হচ্ছিল যে, এ ধরণের কাজ বাঙ্গালী শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর পক্ষে অতি যোগ্য।

জেনেভা থেকে নয় কিলোমিটার দূরের গ্রাম "বারনেক্স" দেখতে গেলাম। জার্মানীর যে কোন গ্রামের মত এটিও ঝকঝকে পরিষ্কার। আঙুরলতা-কুঞ্জ দু'চোখকে ভরিয়ে রাখে। এখানেই রোন নদীর উপর বাঁধ তৈরী করে যে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে, তা—দেখি।

এ ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসে সুইচ্ জীবনের একটি প্রয়োজনীয় দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলাম না। তা হল ভ্রমণকারীর আসা-যাওয়া।

জেনেভা উৎসব
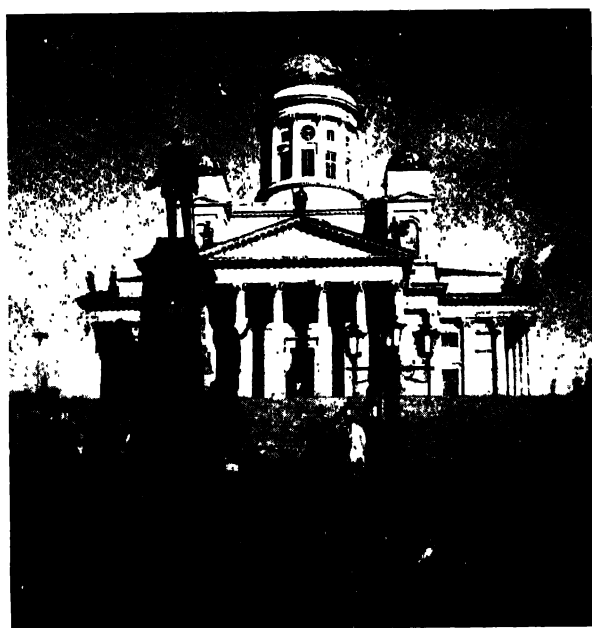
হেলসিংক--সেণ্ট নিকোলাস গির্জা

ডায়েনার মূর্তি

এ দেশের অর্থাগমের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং সে সঙ্গে দেশের দুর্বলতারও প্রধান উৎস। ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে সস্তা অর্থলাভ কিছু পরিমাণে জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছে।

সুইট্জারল্যান্ডের অন্যান্য স্থানে তত নয় কিন্তু জেনেভাতেই বিশেষ নজরে পড়ে যে, ব্যবসায়ীরা বিদেশী যাত্রীদের কেমন করে শোষণ করতে চায়। একটি ফোটোর দোকানে গিয়ে ৫টি তোলা ফিল্ম ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করার জন্য দিয়ে আসি। তারা বলে দাম পড়বে ১৫'৭৫ ফ্রাঙ্ক; কিন্তু যখন ফোটোগুলি আনতে যাই, তখন বলে দাম দিতে হবে উনিশ ফ্রাঙ্ক। জার্মানীর ষ্টুটগার্ট অথবা হামবুর্গের চেয়ে এ দোকানের কাজও নিকৃষ্ট অথচ মূল্য দিতে হ'ল অনেক বেশী।

ভারতীয় কনসাল জেনারেলের সুপারিশে আমরা একটি কোম্পানী থেকে ঘড়ি কিনি দুটি। ভবিষ্যৎতে প্রয়োজনীয় মেরামত ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে কোম্পানী আমাদের এক বছরের গ্যারাণ্টি দেয় এবং বলে, যদি কোন কিছু গোলমাল হয় ঐ সময়ের মধ্যে, তবে কোলকাতায় একটি সুইচ ফার্মের শাখা আছে, সেখানে বিনা খরচে ঘড়ি ঠিক করে দেওয়া হবে। ঐ কোম্পানীর নামও আমাদের দিয়ে দিল। কোলকাতা এসে যখন একটি ঘড়ি খারাপ হয়, তখন নির্দেশমত উক্ত ফার্মের শাখা অফিসে গিয়ে মেরামতের কথা বলি। কিন্তু তারা বিনা খরচে মেরামত করতে অস্বীকার করে। এতেই মনে হয়, সুইটজারল্যান্ডে এমন সব ফার্ম আছে, যারা দেশের সুনাম রাখার চেয়ে লাভের দিকেই দৃষ্টি দেয় বেশী। কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে এ ধরণের ব্যবসা ভাল নাও হতে পারে। সুইচ সরকারের এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রতিদিনই প্রায় আশা করছিলাম যে ফ্রান্সের ধর্মঘটের অবসান হবে। কিন্তু তা হ'ল না। কি আর করি, কিছুটা অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়েই আমরা জেনেভা ত্যাগ করে প্যারিসের পথে যাত্রা করি ১৮ই আগষ্ট। রেলগাড়ীতে আর তিলধারণের জায়গা মাত্র ছিল না। আমাদের আগে থেকেই বসবার জায়গা রিজার্ভ করা ছিল, সেজন্য বসতে পেলাম; কিন্তু বহু যাত্রী স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে দাঁড়িয়েছিলেন। বাক্স-প্যাঁটরা ইত্যাদি এমন কি পায়খানা ঘরের মধ্যেও বোঝাই করা হল। শ্রীযুত দস্তুর একজন ভারতবাসী পার্শী যুবক; তিনি শুধু যে আমাদের সহায়তা করলেন তা নয়, অন্যান্য যাত্রীদের জন্যও যথাসাধ্য করলেন।

ফ্রান্সের প্রথম ষ্টেশনে যখন আমাদের গাড়ী থামে দেখি, মেয়েরা বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে সামান্য জায়গার জন্য চারদিকে ছুটোছুটি করে দৌড়াচ্ছে। অস্বাভাবিক দেরী করল গাড়ী ছাড়তে। কারণ, ধর্মঘটী এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরা এঞ্জিনের সামনে বসেছিলেন। সাধারণ পুলিশের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হ'ল, ফল কিছু হল না। কেবল মিলিটারী পুলিশ যখন ষ্টেনগান ইত্যাদিতে সশস্ত্র হয়ে এল, তখনই তাঁরা স্থান ত্যাগ করলেন এবং বদ্ধমুষ্টি তুলে 'লা-মার্সাই' গাইতে সুরু

করলেন। জাতীয় সংগীতের কী অপব্যবহার! এক প্রৌঢ় ফরাসী পরিবার শ্রীযুত ও শ্রীমতী এমিল হেরিংফেল্ড আমাদের পাশেই বসেছিলেন। শ্রীমতী বললেন যে, এ সকল সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী কেবলমাত্র শ্লোগানে এসে থেমেছে। পরিবারটির সংগে আমাদের বন্ধুত্ব জন্মে।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে আমাদের ট্রেণ প্যারিসে পেঁাছানর কথা, কিন্তু পেঁাছাল অনেক দেরীতে, ৩টার সময়। শ্রীযুত হেরিংফেল্ড ষ্টেশনের বাইরে গেলেন এবং আমাদের জন্য কুলি নিয়ে এলেন। এ বিশৃংখলার সময়ে এ সাহায্য কম কথা নয়। একটি ট্যাক্সি সংগ্রহ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না যদিও ট্যাক্সি-ধর্মঘট ছিল না। একজন মধ্যস্থ লোকের মারফতে আমাদের ট্যাক্সি সংগ্রহ করতে হ'ল। এ সব দালালেরা যাত্রীদের জন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিয়ে টাকা রোজগার করছিল। ভোর ৪টার সময় হোটেলে আমরা ঘুমাবার অবসর পেলাম।

শ্রীসতীশ কালেলকার আমাদের জন্য হোটেলের বন্দোবস্ত করেন। তিনি প্যারিসের ভারতীয় দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের কর্তা ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, জেনেভা হোটেলের চেয়ে এখানকার হোটেল অনেক পরিষ্কার ছিল এবং খরচও বেশী ছিল না। হোটেলে শ্রীসীতারাম ঝা নামক একজন ভারতীয় ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষা বলতে পারতেন। আমাদের সুবিধা ইত্যাদির জন্য যথাসাধ্য তিনি করেছিলেন। তাঁর সংগে আগে আমাদের পরিচয় ছিল না। প্যারিসে ধর্মঘটের সেই সময়ে হোটেলে তাঁর উপস্থিতি যেন ভগবানের হাত! প্যারিস দেখা ছাড়াও ভার্সাই এবং তার সংলগ্ন জায়গাগুলি দেখাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে যাবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু ধর্মঘটের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সংগে যোগাযোগের সুবিধা করতে পারলাম না। এমন কি টেলিফোনেও তা সম্ভব হ'ল না। সেখানে যাওয়া তো সম্ভব ছিলই না। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে যাবার অভিলাষ আমাদের ত্যাগ করতে হ'ল।

সতীশ প্যারিসে ছাত্র ছিল একদিন। তারই উপদেশ অনুযায়ী প্যারিসে চারদিনের কার্যসূচী স্থির হয়। ছুটির সময়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল সে সময়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখতে পারলাম না।

শ্রী ঝা আমাদের প্রথম নিয়ে গেলেন বিখ্যাত 'টুয়ার আইফেল' বা 'ইফেল টাওয়ার' দেখাতে। টাওয়ারের পরিকল্পনা গঠন বুদ্ধিমত্তা এবং অতি নিপুণ ইঞ্জিনীয়ারিং শক্তির পরিচয় দেয়। সমস্ত শহরটির সাধারণ একটি দৃশ্য দেখা যায় টাওয়ারের উপর থেকে। অতি ঘন-বসতি কোন কোন অঞ্চল সত্ত্বেও প্যারিস সুপরিকল্পিত নগরী। পরে আমরা প্যারিস দেখি "আর্ক-দ্য-ট্রায়াম্ফ" থেকে। বারটি রাস্তা এসে মিলেছে এখানে তোরণকে কেন্দ্র রেখে। আর্ক-এর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বাতি জ্বলছে, যে সমস্ত সেনানী যুদ্ধে তাদের জীবনপাত করেছে, তাদেরই স্মরণে।

গত যুদ্ধের সময়ে প্যারিস কোনরূপ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়নি। ফরাসীরা একে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করে। সেই জন্য সেখানে বোমা পড়েনি। এমন কি, যখন জার্মানরা সে নগরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল, তখনও তারা কোন কিছুই নষ্ট করেনি। আমার মনে হল হয় তো বা জার্মানরা নেপোলিয়ানের প্রতিমূর্তি শীর্ষে রাখা স্মৃতিস্তম্ভটি ধ্বংস করে যেতে পারত। কেন না এই স্তম্ভের জন্য ব্যবহৃত ধাতুর সমস্তটি ১৮০৬ সালে (যেনার) যুদ্ধে নেপোলিয়ান কর্তৃক পরাজিত জার্মানী থেকে আনা কামানের গলানো ধাতু। যা হোক, সমস্ত স্তম্ভটিই অক্ষত অবস্থায় আছে দেখলাম। আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর পরিচালনায় সমস্ত প্যারিস ঘুরে দেখা বাদেও আমরা নিজেরা মিঃ ঝা-এর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে অনেকটা দেখি। কোথাও যুদ্ধ-ক্ষতির চিহ্ন চোখে পড়ল না। আমরা অবশ্য শুনেছিলাম যে, ফিল্ডমার্শাল গোয়েরিং শিল্প-সম্পদের কিছু দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে এর সব কিছুই আবার উদ্ধার করে আনা হয় ফ্রান্সে।

ল্যুভ্রে মিউজিয়ামের শিল্পসংগ্রহ অনুপম। প্রতিভাবান শিল্পী র‍্যাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিন্সি, বত্তিচেলী এবং আরও বহু শিল্পীর আঁকা মৌলিক চিত্রসম্পদ এখানে দেখা যাবে। ঢোকার পথেই বিশ্বস্বপ্ন 'ভেনাস'-এর অপরূপ ভাস্কর্য চোখে পড়ে। মিউজিয়ামের বিশাল কলা-বিভাগের বর্ণনা দেওয়া আমাদের অভীপ্সা নয়, বইয়ের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে তা দেওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে, র‍্যাফায়েলের বিখ্যাত চিত্র 'ম্যাডোনা' ও লিওনার্দোর 'মোনালিসা'র অঙ্কিত আসল চিত্র দেখতে পেলাম। আরও কিছু সময় থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরিচালনাধীন ভ্রমণ ব্যবস্থায় সময়ের পরিধি সীমায় আবদ্ধ। রাজা প্রথম ফ্রান্সিস্ এই ভবন তৈরী করেন রাজপ্রাসাদ হিসাবে। পরে তাকে মিউজিয়ামে পরিবর্তিত করা হয়।

খ্যাতনামা চার্চ 'নোতরদাম্।' -এর জানলার চিত্রখচিত কাঁচগুলি ফরাসীর সৌন্দর্য-পিপাসু মনের দরজা খুলে দেয় দর্শকের চোখে; কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই,—সে মন আজ ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। অন্য কিভাবে ব্যাখ্যা করব এ দৃশ্যের। দেখলাম, দেহের ঊর্ধ্বাংশের সমস্ত পোশাক খুলে রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় এক তরুণীর ফোটো তোলা হচ্ছে! আমাদের কাছে এ দৃশ্য মর্মঘাতী! পথে চলতে চলতে দেখলাম এ ব্যাপার। সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হ'ল জনতা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। ঝা বললেন যে, সমস্ত ফোটো বিক্রী করা হবে। অবনতির এ নিশ্চিত চিহ্ন! সোনালী রংয়ের ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তিতে জোয়ান অব আর্ক ফ্রান্সের যে শক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে, তার সঙ্গে এর তুলনা? আকাশ-পাতাল তফাৎ তাতে।

অসামান্য শক্তিসম্পন্ন জোলা, ভিক্টর হিউগো এবং ভলটেয়ারের সমাধি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'প্যানথিয়ন'। ফ্রান্সের স্রষ্টা এঁরা। তাই প্যানথিয়ন দেখে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে এলাম।

প্যালেস অব জাস্টিস দেখলাম। যে কক্ষে মেরী আন্টোইনেৎ-এর বিচার

হয়েছিল এবং ফাঁসীর হুকুম হয় তা দেখি। এই প্যালেসেই কয়েক বছর আগে মঁশিয়ে লাভাল এবং মার্শাল পেঁতার বিচার হয়েছিল। এ সকল দেখতে দেখতে ফ্রান্সের ইতিহাস যেন মনের সামনে এসে দাঁড়াল। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্শাল পেঁতা ফ্রান্সের একজন মহান বীর হিসাবে সমাদর পেয়েছিলেন। সেই একই লোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাঁর পতন হ'ল। কারাদণ্ড পেলেন তিনি।

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ভার্সাই রাজপ্রাসাদ! বাহিরের রূপে এ প্রাসাদ অতি জমকাল কিন্তু ভেতরের শিল্প আরও সম্পদশালী। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই নির্মাণ করেন এটি। পরিকল্পনা এবং রচনা কৌশল যাঁরই হোক না কেন, তিনি কল্পনাশক্তিতে মহীয়ান ছিলেন। বিসমার্ক যে কাঁচের ঘর থেকে কাইজার প্রথম ভিলহেলমকে জার্মান-সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেটিও দেখি। চরম ঔদ্ধত্যের পরিচয় ছিল সে কাজের পেছনে। বিজেতারা প্রায় সব সময়েই তাদের সঙ্গতিবোধ হারিয়ে ফেলেন এবং পরবর্তী যুদ্ধের বীজ বপন করে থাকেন। আবার ঐ প্রাসাদেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানদের অপমানের পূর্ণ পেয়ালা পান করতে হয়েছিল। এর জন্য দায়ী বিসমার্ক।

এ সমস্তই যা কিছু দেখলাম সকলই ফরাসীর অতীত কীর্তির নমুনা মাত্র। নিজের মনেই জিজ্ঞাসা এল—এদের বর্তমান কি! বন্ধুদের বৃথাই জিজ্ঞাসা করলাম, প্যারিসে কি কি জিনিস আমরা দেখতে পারি যার জন্য আজকের ফরাসী দেশ গর্ব করতে পারে। কিছুই তারা দেখাতে পারল না। বরঞ্চ আমাকে প্রশ্ন করা হ'ল "বহু বিদেশী ভ্রমণ করে এমন সব বিশেষ জায়গা দেখতে চান কি?" তৎক্ষণাৎ আমাকে বলতে হ'ল "ইয়োরোপের নর্দমা দেখতে আমি আসিনি। আমার সে প্রয়োজনও নেই।" প্যারিসের হাওয়ায় বিলাসিতা এবং শ্রমবিমুখতা অনুভব করেছি। অবনতির নিশ্চিত লক্ষণ এ সকল! ব্যথিত হ'লাম দেখে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্থান হামবুর্গ। ধর্মঘটের অবসান তখনও হয়নি, অতএব —ট্রেণ পাওয়া মহামুস্কিলের ব্যাপার। বিমানে ব্রাসেলস গিয়ে সেখান থেকে ট্রেণ ধরার উপদেশ দিলেন সকলেই। সে অনুসারেই ব্যবস্থা করি।

২৩শে আগষ্ট সকালবেলা আমরা প্যারিস ছেড়ে আসি। "সাবেনা" বিমান-এর কর্মচারীরা সকলেই অত্যন্ত ভদ্র ছিল। তাই আশা করেছিলাম, বেলজিয়ামের কয়েকটি ঘণ্টাও আমাদের আনন্দ দেবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম সে আশা কত ভুল। 'সাবেনা' বিমান কোম্পানীর লোকেরাও কোন না কোন ভাবে ভুল খবর পেয়েছিল। তাই তারা আমাদের সেণ্ট্রাল ষ্টেশন "মিডো"তে না পাঠিয়ে পাঠাল নর্ড ষ্টেশন বা নর্থ ষ্টেশনে। সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের হামবুর্গে যাবার জন্য ট্রেণ রিজার্ভ সম্বন্ধে খবর জানবার বৃথা চেষ্টা করলাম। রেলওয়ে কর্মচারীদেরও নেহাৎ দরদহীন ব্যবহার। অবশেষে একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর কাছে সব কথা খুলে বলি। তিনিও ষ্টেশনে এসেছিলেন। বহু ধন্যবাদ

তাঁকে। কারণ আমাদের প্রয়োজনীয় খবরাদি বে'র করে দেবার জন্য তিনি কষ্ট স্বীকার করলেন। তিনি আমাদের সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে যেতে বললেন এবং সেজন্য কি করা দরকার তারও নির্দেশ দিলেন।

প্রত্যেক জায়গাতেই আমি আগে থেকেই ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরখানা অথবা বন্ধু-বান্ধব থাকলে তাদের খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফ্রান্সের ডাক ধর্মঘটের জন্য ব্রাসেলস-এ কাউকেই কোন খবর পাঠান সম্ভব হয়নি। সেদিন আবার ছিল রবিবার। পোঁছেই আমি বৈদেশিক দপ্তরখানায় টেলিফোন করি কিন্তু সেখানে তখন ইংরেজী অথবা ভারতীয় ভাষা বোঝেন এমন কেউই ছিলেন না, সুতরাং ভারতীয় দূতাবাস আমাদের কোন কাজেই এল না।

আমরা শহর ঘুরে দেখি। রাজপ্রাসাদের সামনে ফ্রান্সের কয়েকজন গার্লস গাইড সদস্য এবং জার্মান মেয়ের একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। এরা সকলেই অতি আন্তরিক ব্যবহার করল আমাদের সঙ্গে। প্রাসাদের প্রবেশ পথের সান্ত্রীটিও বেশ অমায়িক এবং বন্ধুচিত ব্যবহার দেখাল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বিদ্যালয় ভবনটিই বাইরে থেকে দেখলাম। স্বাধীনতা লাভের ১৫ বৎসর পরে নির্মিত স্মারক "গেডেনবুগ ফেন হেট য়ুবেল পার্ক" স্মারকস্তম্ভটি বাস্তবিকই মনে রেখাপাত করার মতই। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল শহরের উপান্তের বনানী এবং ছোট্ট হ্রদটি। বৃহৎ আকারের ভবন এবং পাথরের প্রতিমূর্তি দেখতে আর ভাল লাগছিল না। তাই চোখ মনকে তৃপ্ত করে দিল এ দৃশ্য। বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে এ রকম মনোরম স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের ট্যাক্সি চালক ও কুলীদের ব্যবহার আমাদের দুঃখিত করে। ট্যাক্সি চালক নির্দিষ্ট দামের প্রায় দেড়গুণ দাম নিল। এ বিষয়ে যখন পুলিশের কাছে রিপোর্ট দিতে যাই, তখন একজন আমেরিকান মহিলা সাধনার কাছে এসে বলেন, "আমি কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?" সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, "আপনারা কি জানেন না যে, এরা বিদেশী ভ্রমণকারীদের ঠকাতে সব সময়ই চেষ্টা করে।" উপস্থিত বেলজিয়ামবাসী প্রত্যেকেই তাঁকে রুখে ধরে। আমি অবশ্য বুঝলাম যে, পুলিশেরও সহযোগিতা ছিল ঐ ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে। হামবুর্গ থেকে কোপেনহেগেন যাবার পথে সুইডেনবাসী একজন সহযাত্রী ব্রাসেলস্-এ আমাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে জানান যে, তাঁরও সেই একই ধরণের দুর্দশা হয়েছিল বেলজিয়ামে। নিজ দেশের সুনাম রক্ষার জন্য বেলজিয়াম সরকারের উচিত দায়িত্বশীল লোকদের ব্রাসেলস্ ষ্টেশনে রাখা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড

হামবুর্গ ছেড়ে কোবেনহাবেন (কোপেনহাগেন) রওনা হ'লাম ২৬শে আগষ্ট। এক প্রৌঢ় সুইডিশ পরিবারও ছিলেন আমাদের কামরায়। তাঁদের বন্ধুত্ব ও যত্ন মনে থাকবে। ইয়োরোপের এ অঞ্চলে আর কখনও আসিনি, সেজন্য পথে দেখবার মত কিছু থাকলেই তাঁরা আমাদের দেখিয়ে চললেন। এ পথে কিয়েল খালই দেখবার মত জিনিস। এর উপরের সেতু এক মস্তো পূর্তবিদ্যা প্রতিভার পরিচয় দেয়। ডেনমার্কের প্রথম ষ্টেশন "পাড্‌বর্গ"-এ যখন ট্রেণ থামে তখন শুনলাম রেডিও ঘোষণা দিচ্ছে "ডেনমার্ক-এ স্বাগতম।" কোবেনহাবেন শহরের ট্যাক্সি চালক ও রেলওয়ে ষ্টেশনের মালবাহীদের ব্যবহারও ভাল,—ব্রাসেলস্‌-এর মত নয়।

ডেনমার্ক একটি ক্ষুদ্র দেশ। এর জনসংখ্যা ৪৩ লক্ষ এবং আয়তন ১৭,১০০ বর্গমাইল। সমস্ত দেশের কোথাও কয়লা বা লোহার খনি নেই। জনসাধারণের শতকরা ২৫ জন কৃষিকাজ এবং ফলচাষ-এর কাজে নিযুক্ত। খামারের শতকরা ৯৫ ভাগের মালিক নিজেরাই চাষ-আবাদ করে। ডেনবাসীর অভিজ্ঞতা,—"রায়তচাষীর চেয়ে মালিকচাষী অনেক বেশী প্রগতিশীল কারণ চাষের উন্নতির সম্পূর্ণ ফল ভোগকারী তিনিই।" ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন কম মূল্যের বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গম ইত্যাদিতে ইয়োরোপের বাজার ডুবে গেল, তখন ডেনিস কৃষক নিজ কর্মশক্তির মোড় ঘুরিয়ে দিল গৃহপালিত পশুজাত দ্রব্য মাখন, ডিম, শূকরের মাংস ইত্যাদির দিকে। এখন পর্যন্ত পশুজাত এ সকল দ্রব্যসামগ্রী ডেনিস রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা দাবী করে।

ডেনমার্কে ছিলাম চারদিন। এর মধ্যে আমাদের প্রথম কাজ ছিল কৃষিমন্ত্রী দপ্তরে যাওয়া। ভারতীয় বৈদেশিক দপ্তরের মিঃ ফ্রিজ মিকেলসনকে সেখানে যাবার ব্যবস্থা ইত্যাদি করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরে যাবার বন্দোবস্তও করেন তিনি।

কৃষি-বিভাগের মিঃ মুনক শুধু যে আমাদের তথ্য, সংখ্যা এবং সাহিত্য সরবরাহ করলেন তা নয়, অনুগ্রহ করে "ট্রলেসমিণ্ডে" সরকারী খামারটি দেখবার বন্দোবস্তও করলেন। কোপেনহেগেনের "এগ্রোনমিক রিসার্চ লেবরেটরী"র অধীনে গৃহপালিত পশু ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার জন্যই এই খামার। কৃষিমন্ত্রণা দপ্তরের অধীনে গৃহপালিত পশুদের জন্য সরকারী কমিটিই এর পরিচালনা করে।

গৃহপালিত পশুজাত দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীভূত নীতির ফলে গরুর সংখ্যা ১·৬ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ৩·২ মিলিয়ন। ছয় লক্ষ শুয়র ছিল। তার সংখ্যা হয়েছে ৩০ লক্ষেরও উপর। মুরগীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় এক কোটি থেকে আড়াই কোটিতে

দাঁড়িয়েছে। ডেনমার্কে প্রায় পাঁচ লক্ষ ঘোড়া আছে। এ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীও বেড়েছে বহুল পরিমাণে। বছরে গাই পিছু দুধ বেড়ে ১৯০০ সালে পরিমাণ যেখানে ২০০০ কিলোগ্রাম ছিল, সেখানে ১৯৩৯ সালে হয় ৩৩০০ কিলোগ্রাম। যুদ্ধের ঠিক পরেই এর পরিমাণ কমে গিয়েছিল। কিন্তু আবার পরিমাণ যুদ্ধের আগের অবস্থায় এসেছে। বৎসরে সর্বমোট দুধের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৫২৫ কোটি কিলোগ্রাম। দুধের মাখন শতকরা পরিমাণে বেড়েছে ৩·৪ থেকে ৪·১৮।

এ সমস্তই করা হ'য়েছে উপযুক্ত প্রজনন ও খাদ্য ব্যবস্থা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। ষাঁড় সমিতি আছে, যারা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ষাঁড় সরবরাহ করে। শতকরা ষাটটি গাভীর জন্যই কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু আছে। শীতকালে ছাড়া সকল ঋতুতেই গাভীদের ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় রাখা হয়। গরুর যক্ষ্মারোগ সম্পূর্ণ ভাবেই দূরীভূত হয়েছে। ঘাস, লুসার্ণ এবং ফডারবিট ইত্যাদি গরুর খাদ্য হিসাবে উৎপন্ন করা হয়।

প্রাক্ যুদ্ধকালে বৎসরে শুয়রের মাংস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫৮ মিলিয়ন কিলো এবং যুদ্ধের সময়ে তার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ২০০ মিলিয়ন কিলো। এখন আবার সেই হার বেড়ে পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০০ মিলিয়ন কিলো। একটি প্রবাদ আছে ডেনমার্কে,—"শুয়র ঝোলে গরুর লেজে।" অর্থাৎ মাখনের উৎপাদন বেশী হ'বার ফলে শুয়রকে মাখন তোলা দুধ প্রচুর খাওয়ানো যায়। এভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শুয়রের মাংসের উৎপাদনও বাড়ছে—পাশাপাশি থেকে। মাখন তোলা দুধ খাওয়াবার ফলে মাংসের গুণ বেড়ে যায়। মুরগী পালন কেন্দ্রও আছে বহু। "বহু বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে প্রজননের ব্যবস্থা, উপযুক্ত খাদ্য এবং পরিচালনাই ডিম উৎপাদনের পরিমাণকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়াছে।" সমস্ত দেশের জন্য প্রতি মুরগী পিছু ডিমের সংখ্যা বাৎসরিক ১৬০টি, আমেরিকার সম অবস্থা। প্রজনন কেন্দ্রে ডিমের সংখ্যা ২৩৩টি।

সমস্ত পৃথিবীর বাজারে যত পরিমাণ মাখন এবং ডিম সরবরাহ করা হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় ডেনমার্ক তার এক-চতুর্থাংশ সববরাহ করে। আর শুয়রের মাংস সরবরাহ করে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

অবশ্য একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে. সে গমজাতীয় শস্য উৎপাদনে উপযুক্ত মনোযোগ দেয় না। শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ কিছু কমেছে এবং বলতে গেলে এখন সেখানে কোন জমি অনাবাদী পড়ে' নেই। এই শতাব্দীর গোড়ায় উৎপাদনের পরিমাণ যা ছিল এখন তারও দ্বিগুণ উৎপাদন হয়। এ কথা উল্লেখ করার মত যে, এদেশে সব মিলিয়ে ৭·৭৫ মিলিয়ন একর কৃষিক্ষেত্র আছে। অর্থাৎ মাথাপিছু ডেনমার্ক ইয়োরোপের প্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। প্রতি হেক্টরে গম উৎপন্নের পরিমাণ ৩০০০ কিলোরও বেশী। তুলনামূলকভাবে আলোচনা

করা যেতে পারে যে, একর পিছু জার্মানীতে উৎপাদনের পরিমাণ ২৩০০ কিলো, ইংল্যাণ্ডে ২৩০০ কিলো, ফ্রান্সে ১৬০০ কিলো, হল্যাণ্ডে ৩০০০ এবং আর্জেন-টাইনাতে ১০০০ কিলো।

প্রায় সমস্ত কৃষিক্ষেত্রই ভালভাবে কর্ষিত এবং তাতে প্রচুর সার ব্যবহার করা হয়। বহু সংখ্যক পশু থেকে সার তৈরী করার সময় কৃষকরা খুবই যত্ন নিয়ে থাকে। সে সংগে প্রচুর পরিমাণ কৃত্রিম সারও ব্যবহার করা হয়। বৎসরে ২৪৫,০০০ টন নাইট্রোজেন সমন্বিত সার (শতকরা ১৫,৫ ভাগ নাইট্রোজেন), ১৫৪,০০০ টন পটাস (শতকরা ৪০ ভাগ পটাসিয়াম-অক্সাইড) এবং ৩১৫০০০ টন ফসফেট (শতকরা ১৮ ভাগ ফসফরাস পেণ্ট-অক্সাইড) সার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সমস্ত সারই আমদানী দ্রব্য। নরওয়ে থেকে আমদানী হয় নাইট্রোজেন সমন্বিত সার, জার্মানী ও ফ্রান্স থেকে পটাস্ এবং আফ্রিকা থেকে ফসফেট আসে। একজন কৃষকের বার্ষিক আয় ৫০০০ হাজার ক্রোনার। এক ক্রোনার ভারতীয় মুদ্রায় এগারো আনা।

জমির প্রকৃতি এবং জলবায়ু তো আছেই, এ'ছাড়াও ডেনমার্কের এই অসাধারণ উন্নতির মূলে রয়েছে আরও তিনটি কারণ। (১) কৃষিসম্বন্ধীয় শিক্ষা, (২) কো-অপারেটিভ আন্দোলন এবং (৩) মানবহিতব্রতী কবি ও দার্শনিক গ্রুণ্ডভিগ্ প্রবর্তিত জনসাধারণের জন্য স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা। আমি নিজে আরও সহায়ক কারণ এ সংগে যুক্ত করতে চাই ঃ—ডেনমার্কের কোন উপনিবেশ নেই এবং তারা জলদস্যু-বৃত্তিও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সেইজন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে তাদের নিজ দেশের উন্নতির জন্য। এ কাজে সময় দিতেও পারছে তারা। স্বভাবতই উদ্যমশীল জাতি বলে কাজে ফলও দেখাতে পেরেছে।

সারা দেশ জুড়ে এখন ২৮টি কৃষিবিদ্যালয় আছে। বৎসরে ৩০০০ ছাত্র পড়া-শুনা করে। তরুণ কৃষকদের তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভের জন্যই এ সকল স্কুল। উদ্দেশ্য হ'ল ভবিষ্যত কৃষকদের শস্য উৎপাদন, গৃহপালিত পশুর প্রজনন ও খাদ্য, কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার ইত্যাদি বিষয়ে যতদূর সম্ভব তথ্যাদি দেওয়া। পাঁচ, ছয় এবং নয়মাসের কোর্স আছে। তারপরে আছে কোপেনহাগেন-এ "রয়্যাল ভেটারিনারি ও এগ্রিকালচারেল কলেজ"। সেখানকার সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১১০০ জন। ছয়টি বিভাগ রয়েছে সেখানে ঃ—পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, সব্জী ও ফলের চাষ, দুগ্ধজাত দ্রব্য শিল্প, জায়গা, জমি জরিপ ও অরণ্য রক্ষা ব্যবসায়। তিনবছরের কোর্স। তারপরে কোর্স শেষ হ'লে তাদের উপাধি দেওয়া হয় "কৃষি স্নাতক বা" ল্যাণ্ডবুর্গস্ কানডিডাট।" এই কলেজে ভর্তি হ'বার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশের দরকার হয় না। ছাত্রদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অন্ততঃ ছয় মাসের কম নয়। এ সময়ে গৃহপালিত পশু ইত্যাদির যত্ন, তাদের খাওয়ানো, এ সমস্ত কাজের পরেও গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং ভাষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা প্রায় বাধ্যতামূলক।

ডেনিস কৃষকদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজনেরও বেশীর দশ হেক্টার-এর কম জমি আছে। সুতরাং উন্নত কৃষি-শিল্প প্রসারের জন্য 'কো-অপারেশন' অতি দরকারী হয়ে পড়ে। বিভিন্ন 'কো-অপারেটিভ' সংস্থার মাধ্যমে বড় বড় সংস্থা গড়ে উঠল যেখানে অল্প বা বেশী জমির মালিক কৃষক উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দর পশুর খাদ্য ও সার খরিদ ইত্যাদি ব্যাপারে সমান সুবিধা পায়। এ ভাবে 'কো-অপারেটিভ' আন্দোলন ডেনিস্ কৃষির অসাধারণ উন্নতির প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য হয়েছে।

কো-অপারেটিভ সংস্থার মাধ্যমেই মাখন, শুয়রের মাংস এবং ডিম রপ্তানী হ'য়ে থাকে। সেজন্যই জিনিসপত্রের গুণ এবং মান ঠিক রাখা সম্ভব হয়েছে।

'ফোক, হাইস্কুল' বা জনসাধারণের বিদ্যালয়ই কৃষি-বিদ্যালয় এবং কো-অপারেটিভ আন্দোলনের মূলে। তারাই নৈতিক, মানসিক এবং আদর্শগত পটভূমিকা। গ্রুনড্ভিগ্-এর মতে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে বাঁচতে পারে না, সব সময়েই তারা কোন গোষ্ঠী বা জাতির অংশ হয়ে বাঁচে; কিন্তু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রচারক ছিলেন না তিনি। বিভিন্ন জাতিগুলি পরস্পরের শত্রু নয়, প্রত্যেকেই মানবীয় শক্তির এক-একটি বিশেষ প্রকাশ। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমই ছিল তাঁর মতের ভিত্তিপ্রস্তর। জনসাধারণের জীবনকে ঘিরেই শিক্ষার প্রসার হওয়া উচিত এবং এর সম্যক বিকাশ হতে পারে একমাত্র মাতৃভাষায়;—এই ছিল তাঁর মূল আদর্শ। ল্যাটিন গ্রামার স্কুলের তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। এ সমস্ত স্কুলকে তিনি আখ্যা দেন, "মৃত্যু-পথের প্রস্তুতির বিদ্যালয়।" কারণ, জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞানলাভ করা এবং দেশ তথা মানব জাতির প্রতি প্রেমের পরিবর্তে ছাত্রদের ল্যাটিন গ্রামার দ্বারা পুষ্ট করা হয় সেখানে তারা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের জাতি ও যুগের সামনে অপরিচিত হয়ে থাকে। যে দেশকে সেবা করা একান্ত কর্তব্য, যে দেশ তাদের জীবন রক্ষা করছে, তাকেই এই ছাত্রেরা তুচ্ছ জ্ঞান করে। কারণ গ্রামার স্কুলের পুঁথিগত বিদ্যার আবহাওয়া তাদের মনকে বিষাক্ত করে দেয়।" পুঁথিগত অব্যবহারিক শিক্ষার সংস্কার-এর বিরুদ্ধে তিনি নতুন আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হলেন। "মানুষের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানালোক পাওয়া"—জীবনের জন্যই শিক্ষা ও দক্ষতার প্রয়োজন।

১৮৪৪ সালে প্রথম গ্রাম্য উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে কৃষকশ্রেণী এই আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এভাবে এ শিক্ষা তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। কো-অপারেটিভ আন্দোলনের জন্য মাটি তৈরী হ'ল এভাবে। কয়েকটি সর্ত মেনে চলার উপরই কো-অপারেশন বা সহযোগিতার সাফল্য নির্ভর করে। আসল কথা হ'ল উঁচুদরের স্বার্থ, যা ব্যক্তির আপাত স্বার্থকে দমন করে জাতির বৃহৎ উন্নতির জন্য এবং তার মাধ্যমে মনুষ্যজাতির স্বার্থই কামনা করে। এই সকল স্কুল এই মনোভাব সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে এবং এরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষকদের মধ্যেই কো-অপারেশন বা সহযোগিতা সাফল্য লাভ করে। ভারতবর্ষে এই পটভূমিকার অভাব,

সেই জন্য কো-অপারেটিভ আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারছে না।

২৮শে আগষ্ট আমরা গেলাম 'ট্রলেসমিণ্ডে সরকারী গবেষণা খামার' দেখতে। একজন আইরিশ তরুণও আমাদের সঙ্গী হয়। সেও এক কৃষক পরিবারের ছেলে। এই খামারে গরু, শুয়র, মুরগী, মিন্‌ক্‌ (নকুল জাতীয় লোমশ জন্তু), খরগোস ইত্যাদির উপর গবেষণা করা হয়। সহকারী ডিরেক্টর মিঃ এ্যাসগার ব্রুস খুব উৎসাহ নিয়ে ফার্মের সমস্ত কাজ আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। এখানকার কর্মচারী ডেনিস লোকেরাও অতি ভদ্র এবং বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করল আমাদের সঙ্গে।

ডেনিস গরু সাধারণতঃ তিন জাতের ঃ—লাল ডেনিস, কালো ও সাদা ডেনিস এবং বেঁটে শিং ডেনিস। লাল রংয়ের গরুই শতকরা ৬৮টি। তারপরে স্থান কালো-সাদা রং-এর গরুর (প্রায় শতকরা ২০টি)। এ খামারে ঐ তিন রকমের গরু বাদেও চ্যানেল দ্বীপ থেকে আমদানী করা ডেনিস জার্সি গরুও আছে। লাল ডেনিস গরুই উৎকৃষ্ট দুধ দেয়। অন্যান্য দিক থেকেও এ শ্রেণীর গরু শ্রেষ্ঠ। এ ধরণের গবেষণাকারী খামারের যে কি প্রয়োজনীয়তা, তা বোঝা যাবে নীচে দেওয়া হিসাব থেকে। ১৯৫১ সালে দুগ্ধজাত রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ডেনিস গরুর দুধ দেবার উচ্চক্ষমতা সম্বন্ধে এর আগেই বলেছি; কিন্তু লক্ষ্য করে খুশী হলাম যে, ডেনমার্কবাসীরা উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করছে এবং সকল সময়েই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলছে। ডেনিস মনোভাবের মূর্তপ্রতীক এ খামার। প্রজনন, লালন-পালন এবং রোগ প্রতিরোধ করা—এখানেও এ তিনটিই প্রধান ব্যবস্থা। মনে হল এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ১লা মে থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত গরুগুলিকে ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় রাখা হয়।

একটা জিনিস অবশ্য এখানে দেখবো আশা করিনি। অস্বাভাবিক সংখ্যক মাছি দেখলাম গো-বিভাগের কিছু অংশে। আমাদের বলা হল,—গ্রীষ্মকালে এরা বাড়ে এবং এদের আয়ত্তে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়। যদিও তারা বলে গ্রীষ্মকাল কিন্তু ডেনমার্কে সে সময় কোলকাতার নভেম্বর-ডিসেম্বরের মত ঠাণ্ডা।

শুয়রের খোঁয়াড় দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। অতি যত্নে লালিত-পালিত হচ্ছে শুয়রের দল এবং অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে তাদের। আমাদের দেশে মাংসাশী হিন্দুরাও শুয়রের মাংসের প্রতি একরকম ঘৃণার ভাব পোষণ করে, কারণ এরা অতি অপরিষ্কার জানোয়ার বলেই তাদের ধারণা। ডেনিস শুয়রের খোঁয়াড় একবার দেখলেই বোঝা যাবে, তা সত্য নয়।

এ খামারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাদা লেগহর্ণ মুরগীই ডিম দেওয়ার ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট। সঙ্কর-মুরগীও বৎসরে ২২০টি ডিম দিচ্ছে।

রুপালী খেঁকশিয়াল এবং মিন্‌ক্‌ এ খামারে পোষা হচ্ছে। এদের লোম আমাদের দেখান হ'ল। ভদ্রমহিলারা এ লোমকে খুব পছন্দ করেন এবং শীতের হাত

থেকে রক্ষা পাবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন। ফার্ম দেখা শেষ হলে মিঃ ব্রুস তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য আমাদের অনুরোধ জানান। তাঁর ছেলেমেয়েরাও এসেছিল। বাড়ীখানা খুব ঝকঝকে পরিষ্কার। তাঁর একটি সুন্দর পাঠাগারও আছে। তাঁর দর্শকের খাতাটিতে আমাদের নামও লিখতে অনুরুদ্ধ হই, তার পরেই একটি ফোটোগ্রাফ তোলা হয় মিলিতভাবে। তাঁর মিষ্টি ও আন্তরিক ব্যবহার আমরা ভুলবো না কোনদিনই।

২৯শে সকালবেলা আমরা গেলাম "কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন হল" দেখতে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪৫০,০০০ জন। তাদের প্রত্যেকেই এক-একটি পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে,—সে হিসাবে অনুমান করা যায় যে, ডেনমার্কের জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ জন কোন না কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন প্রকার কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে উৎপাদক সমিতিগুলিই (শস্য উৎপাদন ও বিক্রী সংখ্যা) মোট ব্যবসার অধিকাংশ ভাগ পরিচালনা করে।

২৮শে আগষ্ট তারিখে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণা দপ্তরেও যাই। বিভাগীয় কর্মী মিঃ হান্স কাইমস্ ডেনমার্কের শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি আমাদের দেন। সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষা অবৈতনিক নয়,—যদিও প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না। ছাত্রের অভিভাবক তার আয়ের অনুপাতে শিক্ষাকর দেয়। ১৮১৪ সাল থেকে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্কুলে উপস্থিত থাকতেই হবে এ অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। বাড়ীতে বসেও অভিভাবকেরা শিক্ষা দিতে পারে। শহর অঞ্চলের শিক্ষা এখন আরম্ভ হয় পাঁচ কি সে রকম বয়স থেকে। ইংল্যান্ডের মত এগারো বছর বয়সে ছাত্রদের একটি সাধারণ পরীক্ষা (টেষ্ট) দিতে হয় এবং তারপরে 'মিড্ল মাধ্যমিক স্কুল'-এ যায় কেউ, আবার কেউ কেউ যায় ইণ্টার-মিডিয়েট বা 'মধ্য শিক্ষাস্কুল'-এ। মিড্ল স্কুলের কোর্স চার বছরের। আঠারো বছর বয়সে ছাত্রেরা 'স্কুল-লিভিং' পরীক্ষা অথবা ম্যাট্রিক পাশ করে। অর্থাৎ স্কুল শিক্ষা এগারো বৎসর। ম্যাট্রিক পাশ সমস্ত ছাত্রই ইংরেজী শিক্ষা পায় চার বছরের এবং জার্মান ভাষা তিন বছরের। বিশ্ববিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম অবশ্য ডেনিস ভাষা। ডেনমার্কে সর্বমোট প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার স্কুল ছাত্র রয়েছে। স্কুলে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অভিভাবকের আপত্তি থাকলে অবশ্য এ বিষয়ে জোর করা হয় না।

ম্যাট্রিক পাশ করার পরই ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারে। তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় ডেনমার্কে। দুটি সাধারণ এবং তৃতীয়টি টেকনিক্যাল। কোপেনহাগেন ও আরহুস্ এ দুটিই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমটির ছাত্রসংখ্যা ৬।৭ হাজার এবং পরেরটির সংখ্যা প্রায় দু' হাজার। আরহুস বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র আঠাশ বৎসরের পুরানো আর কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৪৭৫ সালে। ডেনমার্কের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কোপেনহাগেনেই অবস্থিত। এর ছাত্র সংখ্যা ২১০০

জন। ১৯৫২-৫৩ সালের শিক্ষা-বাজেট ছিল ৩২৯ মিলিয়ন ক্রোনার অর্থাৎ প্রায় তেইশ কোটি টাকা।

ডিগ্রী নেবার জন্য কত সময় দরকার হবে সেটা নির্ভর করে শিক্ষার বিষয় এবং ছাত্রের যোগ্যতার ওপর। বৎসরে দু'বার করে পরীক্ষা নেওয়া হয়। কোপেনহাগেন-এ বিজ্ঞান বিভাগ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) গণিত-পদার্থবিদ্যা বিভাগ ও (২) জীববিদ্যা-ভূগোল বিভাগ। তিন অংশে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং গণিত পদার্থবিদ্যা কোর্স অন্ততঃ চার বৎসরের (২+১+১)। জীববিদ্যা-ভূগোল বিভাগ কোর্স পাঁচ কি ছয় বৎসরের (২ অথবা ৩+২—১)। ভেষজবিদ্যায় ডিগ্রী নিতে হয় সাত বৎসরে। প্রকৃত গড় আট অথবা সাড়ে আট বৎসর। ভেষজ-ডিগ্রী পাওয়ার পর হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার হওয়া যায় কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে ডাক্তার হিসাবে কাজ করার অনুমতি পান না যদি এক বৎসর অন্ততঃ 'হাসপাতালে কাজ না করেন। "বোর্ড অব হেলথ"ই স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য অনুমতি দিয়ে থাকে।

৩০ তারিখ সকালবেলা আমরা কোপেনহাগেন শহর ঘুরে দেখবার জন্য যাই। এ শহরের জনসংখ্যা দশ লক্ষ আর সেখানে সাইকেলের সংখ্যা চার লক্ষ। শহরে ট্রাম এবং মোটরগাড়ী প্রধান রাস্তার উপর দিয়েই চলাচল করে। প্রধান রাস্তার পাশেই পায়ে চলার ও সাইকেল চলার জন্য আলাদা আলাদা রাস্তা রাখা হয়েছে। বিশপ আব্সালন এই কোবেনহাবেন শহরের প্রতিষ্ঠাতা।

'সিটি হলে'র সামনে থেকেই আমাদের শহর ঘুরে দেখাবার—'কোচ্' রওনা হ'বার অল্প কয়েক মিনিট পূর্বে মজার একটি ঘটনা ঘটে। একজন আমেরিকান অফিসার টিকিটের জন্য টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেও তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি। সে কথা মনে করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কন্ডাক্টর জবাব দিলেন,—"চিন্তা করবেন না মশায়। মনে রাখবেন আপনি এখন আর ইটালীতে নন, ডেনমার্কে।"

মাংসের বাজার দেখলাম পথে। অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'গাইড্' বলে উঠলেন—"দেখুন, দেখুন! আহা! কি সুস্বাদু!" কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে 'সসেজ' এবং বহু রকমের মাংস দেখা যাচ্ছে—সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এবং বেকারদের চাকুরী সংস্থান দপ্তর দেখান হ'ল আমাদের। এতে বোঝা যায়, ডেনমার্কে বেকার লোক আছে। শহরের সমস্ত বাড়ীগুলিই রাষ্ট্রের অধীনে। পরিবারের আয়তন হিসাবে বড় অথবা ছোট ফ্ল্যাট দেওয়া হয়। দু'ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটবাড়ীর মাসিক ভাড়া পঞ্চাশ ডেনিস ক্রোনার (প্রায় ৩৪।৹ টাকা)। এর পরে আমাদের নিয়ে গেল বস্তী অঞ্চলে। সরু সুরু রাস্তা এবং এ অঞ্চলে সাত হাজার লোকের বাস। বহুদিনের পুরান বাড়ীঘর এবং বসতি অতি ঘন। কিন্তু বাইরে থেকে জঞ্জাল ও নোংরা ইত্যাদির বিন্দুমাত্রও দেখলাম না কোথাও। সুতরাং বস্তী বলতে সাধারণভাবে যা বুঝায়, এ তা নয়।

ষ্টীমার বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল পোতাশ্রয়ে। দূর থেকে ডেনিস নৌ-বহর দেখলাম। ডেনমার্কবাসীরা তাদের নৌ-বহর সম্বন্ধে খুব গর্বিত। অবশ্য আমার মনে হ'ল এও যেন দামী অলঙ্কারেরই মত, বাস্তবিক পক্ষে এর কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। জার্মানরা যখন এদেশ দখল করে, তখন তার বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুল তুলবার ক্ষমতাও ছিল না এ নৌ-বহরের। ডেনমার্কের জাহাজ তৈরীর একটি ভাল কারখানা আছে। সমুদ্রে মাছ ধরার কাজও ডেনদের বেড়ে চলেছে। পরে আমাদের দেখান হল মাছের বাজারটিও।

এর পরে আমরা এলাম লাংগেলিনে দ্বীপে। বিখ্যাত ডেনিস লেখক হানস্ ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসেন তাঁর রূপকথা "লিটল মারমেড্" লিখে এ অঞ্চলকে সুপরিচিত করে দিয়ে গেছেন। সমুদ্রের দিকে মুখ করে তৈরী করা পাথরের উপর 'ছোট্ট জলকন্যা'র ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি দেখলাম।

অল্প দূর এগোলেই গেফিয়ন ও চারটি ষাঁড়-সহ ফোয়ারার প্রস্তরমূর্তি রয়েছে। এর পেছনে যে গল্প আছে তা হল এই ঃ—সুইডেনের রাজা দেবী গেফিয়নের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন একদিনে যতদূর জমি তিনি কর্ষণ করতে পারবেন, ততদূর জমিই রাজা তাঁকে দান করবেন। দেবী তাঁর চারপুত্রকে ষাঁড়-এ রূপান্তরিত করে সমস্ত জী-ল্যান্ড কর্ষণ করেন। ঝরণাটি ভারী সুন্দর।

রাজপ্রাসাদ দেখলাম বাইরের দিক থেকে। এর বিশেষত্ব খুব কিছু নয়; কিন্তু এ আমাদের মনে করিয়ে দিল সেক্সপীয়ারের হ্যামলেটকে।

কোপেনহাগেন বেশ পরিচ্ছন্ন শহর।

জেনেভা উৎসব যেমন সুইচ জাতির জীবনদর্পণ, কোপেনহাগেনের টিভোলীও তেমনি ডেনজাতির। শহরের কেন্দ্রস্থলে 'টিভোলী' একটি বিরাট পার্ক এবং গ্রীষ্মকালীন আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থায়ী জায়গা। মস্তো মস্তো গাছ, ফুলের বাগান, ঝরণা ও ফোয়ারা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ তৈরী বিভিন্ন রকমের বাড়ী, কাফেখানা, রেস্তোরাঁ, ছোট হ্রদ—তাতে নৌচালনার ব্যবস্থা ইত্যাদি সব রয়েছে। ছোট শিশুদের উপযোগী নানা খেলনায় দোকানগুলি ভর্তি, ছেলে-মেয়েরা নাগরদোলা ইত্যাদি নিয়ে মেতে আছে। কাঠের তৈরী নকল উট, সিংহ, গাধা এবং হাতী রাখা আছে। শিশুরা এমন কি বড় ছেলে-মেয়েরাও এদের উপর বসতে পারে এবং যন্ত্রের সাহায্যে তাদের চরকির মত ঘোরান হয়। সমস্ত জিনিসটিই আমাদের মনে করিয়ে দিল ভারতবর্ষের সুপরিকল্পিত মেলার কথা। তিন দিন আমরা টিভোলীতে যাই। রাত্রিবেলা সমস্ত জায়গাটি ভেতর ও বাইরে আলোক-মালায় সুসজ্জিত করা হয়। খোলা হাওয়ায় সার্কাস, ব্যালে নাচ, সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত, ব্যান্ড ও পাইপসহ শোভাযাত্রা সমস্ত টিভোলীকেই আনন্দের ফোয়ারা করে তোলে। জনসাধারণের সুন্দর স্বভাবের স্পর্শ অনুভব করলাম আমরা। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক জায়গায় নাচ ও শারীরিক ক্রিয়া ইত্যাদি প্রদর্শনের সময় আমরা কাছে যাই

দেখার জন্য। সামনে বহু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাদের দেখে অনেক লোক পিছিয়ে এসে আমাদের অনুরোধ জানালেন সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যাতে ভেতরের সব জিনিস ভাল করে দেখতে পাই। চারপাশেই সহৃদয়তার একটা আবহাওয়া ছিল। শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করে খেলছিল, বয়স্করা বাইরে দাঁড়িয়েই ব্যালে নাচ ইত্যাদি দেখছিলেন। নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের কি চমৎকার ব্যবস্থা। ভারতীয় জীবনের বিকাশের জন্য স্থানীয় অবস্থানুযায়ী যদি এমন আনন্দের ব্যবস্থা সম্ভব হত! এ কথাই বার বার আমার মনে জাগল।

৩০শে তারিখ বিকালে আমাদের ষ্টকহলম্ রওনা হবার কথা। দুপুরের দিকে সাধনার একটু জ্বর হ'ল। ফ্রেডারিক্‌স্‌বার্গ হোটেলের পরিচালিকার যে ব্যবহার সে সময়ে পেলাম, তাতেই ডেনমার্কবাসীদের মধুর প্রকৃতির কথা বুঝতে পারলাম। সাধনাকে আরাম দেওয়ার জন্য তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা রইল তাঁর জন্য!

৩১শে আগষ্ট, অতি ভোরে আমরা সুইডেনের মাটি স্পর্শ করি। গাড়ীর ভেতর থেকেই দেখলাম, বুঝলাম সমতল ভূমিতে আমরা আর নই। অসমান দোলানো ভূমি, পাইন ও ফারের বনানী, লাল্‌চে মাটি, পাহাড়ের থাকে থাকে চাষ, এ সমস্তই জানিয়ে দিল যে আমরা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দেশে এসেছি।

ষ্টকহলম ষ্টেশনের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। ট্যাক্সি-ষ্ট্যান্ড থেকে এক এক করে ট্যাক্সি বেরিয়ে আসছিল পুলিশের ডাকে এবং যাত্রীরা পর পর গাড়ীতে উঠে যাচ্ছে। এর পেছনের নীতি হ'ল যিনি প্রথম এসেছেন তাঁর দাবী আগে।

হোটেলে পৌঁছাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ্রীমতী এ্যাসট্রিড্ ওংষ্ট্রম আমাদের কাছে আসেন। স্বামী নিখিলানন্দের পরিচয়-পত্রের জন্যই তা ঘটেছিল। মিঃ টর্ড তাঁর স্বামী, সুইডেনের অসামরিক বিমান বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল। এঁর পিতামহ বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ওংষ্ট্রমের নাম অনুসারেই বিদ্যুৎ-এর এক ইউনিট বা পরিমাণের নাম হয়েছে "ওংষ্ট্রম ইউনিট।" কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ষ্টকহলম গিয়েছিলেন তখন বিখ্যাত ভাস্কর কার্লমিলেচ্ ও তাঁর মধ্যে কথোপকথনের সময় অ্যাসট্রিডই দোভাষীর কাজ করেছিলেন। তিনি স্বভাব-শিল্পী। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিষ্যা এই মহিলার অগাধ শ্রদ্ধা মহাত্মা গান্ধীর উপর। সত্য ও অহিংসায় তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার প্রতি ভালবাসাও আছে প্রগাঢ়। সুইডেনে ছিলাম চারদিন। এরই মধ্যে আমাদের এত আন্তরিকতা জম্‌ল যে তিনি আমাকে এখন দাদা বলেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে চিরদিন এই স্নেহ-প্রীতির যোগ্য রাখেন। সাধনার প্রতি তাঁর ভালবাসা কন্যাস্নেহের রূপ ধারণ করল। নিজের আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতি উপহার দিলেন সাধনাকে।

এ্যাসট্রিড প্রথম আমাদের নিয়ে গেলেন "সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির

কার্যালয়ে। পার্লামেন্টের এ দলের সদস্যদের হাতেই রাষ্ট্রপরিচালন ক্ষমতা।

পার্টির সম্পাদক মিঃ কাইব্যুয়র্ক-এর পরামর্শ অনুসারেই আমাদের কার্যসূচী ঠিক হল। খুবই লম্বা কার্যসূচী ছিল। উপসালাতে আমাদের সুইডিস্ লোক-সভার সদস্য মিঃ জন লুণ্ডবার্গ-এর অতিথি হবার কথা। কিন্তু তিনি ইংরেজী বলতে পারবেন না বলে মিঃ কাইব্যুয়র্ক ষ্টকহলম থেকে একজন দোভাষীকেও সংগে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এ সমস্ত সহায়তার জন্য।

প্রায় সত্তর লক্ষ লোকের বাসভূমি সুইডেন। জনসংখ্যার অনুপাতে এ দেশের আয়তন বিশাল,—১,৭৩,৩৪৫ বর্গমাইল। শতকরা মাত্র দশ ভাগ চাষ চলে। কিন্তু এ দেশের বসতি ঘন নয় এবং এক জমি হ'তে নানাবিধ ও যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপাদনমূলক কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় এদেশ খাদ্যদ্রব্যে স্বাবলম্বী। অরণ্যানী এদেশের আয়ের প্রধান উপাদান। লাম্বার কাঠ, কাগজের মণ্ড ও কাগজ তৈরীর জন্য এর খ্যাতি। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করার চেয়ে কাগজের মণ্ড তৈরী করলে এ সব কাঠ হতে বেশী আয় হয়। সুইডেনে প্রচুর লৌহ আকরিক আছে এবং লোহার পরিমাণ যথেষ্ট রয়েছে তাতে। অথচ অতি সামান্য কয়লা, প্রায় নাই বললেও চলে। সেজন্য লোহার আকরিক প্রায় সমস্তটুকুই বিদেশে রপ্তানি করে। কয়লা না থাকার ক্ষতি অনেকটা পূরণ হয়েছে জলশক্তি থাকাতে। শিক্ষা ৭ বৎসর থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক।

আমরা প্রথমে গেলাম শিক্ষামন্ত্রী দপ্তরে।

সমস্ত স্তরেই শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা সুইডিস। এগারো বৎসর বয়স হলে ছাত্ররা জার্মান ও ইংরেজী ভাষা শেখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজী ভাষা শেখবার দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। প্রায় উনিশ বৎসর বয়সে ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে। আমেরিকার পদ্ধতির মতই বারো বৎসরের স্কুল শিক্ষার পর এই পরীক্ষা। স্কুলগামী ছাত্রের মোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। স্কুলে এক বেলার খাবার বিনাখরচে দেওয়া হয়।

সুইডেনে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় উপসালা, লুণ্ড, ষ্টকহলম এবং গটেবেরি। কয়েকটি টেকনিক্যাল স্কুল আছে এবং এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমর্যাদাসম্পন্ন। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চোদ্দ হাজার ছাত্র আছে। তাদের মধ্যে ৩০০০-এর কিছু বেশী ছাত্র মহিলা।

উপসালা সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার ছাত্র সংখ্যা চার হাজারের কিছু উপর।

শিক্ষা বিভাগ থেকে আমরা সোজা যাই শহর দেখার জন্য। এ শহরের জন-সংখ্যা সাত লক্ষ। এখানেও প্রচুর সাইকেল কিন্তু তুলনায় কোপেনহাগেনের চেয়ে কম পরিচ্ছন্ন শহর। রাজপ্রাসাদের মধ্য দিয়ে যাবার রাস্তাটিই সবচেয়ে মজার লাগল আমাদের। লোকজনকে প্রাসাদের ভেতরে রাজকক্ষে যেতে দেওয়া হয় না এই যা।

ব্রিটেন ছেড়ে আসার পর থেকে আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই ট্রাফিকের নিয়ম ছিল "ডাইনে চলো" কিন্তু একমাত্র সুইডেনেই দেখলাম নিয়ম ব্রিটেনের মত "বাঁয়ে চলো।"

বিকালবেলা মিঃ ওংষ্ট্রম এলেন এবং গাড়ী চালিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়ী আপেল-বাগানে। ষ্টকহলম-এর উপকণ্ঠে এ অঞ্চল। লাল টুকটুকে আপেলে ভরা প্রচুর আপেল গাছ একে অপূর্ব সুন্দর করে রেখেছে। বাংলাদেশে আপেল হয় না, সেজন্য আমরা যারা সে দেশ থেকে আসছি তাদের পক্ষে এ এক দেখবার দৃশ্য বটে। হ্রদ এবং অরণ্যানী এর শোভা বাড়িয়েছে আরও। অ্যাসট্রিড তার আঁকা ছবি ও স্কেচ ইত্যাদি দেখাল। এ স্থান প্রকৃতিপ্রেমিক কবি ও কলাকার-দেরই জন্য।

১লা সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের ট্রেনিং-স্কুল দেখতে গেলাম। ২৫০ জন নারী শিক্ষার্থী আছেন ঐ স্কুলে এবং শিক্ষাদান বিষয়ে অভ্যাস করার জন্য একটি স্কুল রয়েছে। তার ছাত্র সংখ্যা ৪০০। স্কুলের রেক্টর মিঃ আভিডসন আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখালেন। শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা সমবেত সংগীত গেয়ে আমাদের স্বাগতম জানাল এবং ইংরেজীতে তার অর্থও বলে দিল। তাদের অনুরোধে সাধনাও একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে তার অর্থ ইংরেজীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিল। দুজন ভারতবাসীকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে তাদের মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য তারা উদগ্রীব ছিল। তাদের সে অনুরোধে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েক মিনিট বক্তৃতা করি। ভারতের কৃষ্টি, তার গৌরবময় অতীত, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে বলি। সুইডেনবাসীর প্রতি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বলা শেষ করি। জানলাম স্কুল ভবনটি একশত বৎসরের পুরান কিন্তু দেখে বুঝবার জো নেই। সযত্নে রাখা হয়েছে এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন চারদিক। স্কুলটি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদিতেও পরিপূর্ণ।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা গেলাম "মহিলা-কল্যাণ-সমিতি"তে। বাপ ও মায়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক না হওয়া সত্ত্বেও যে সব শিশু জন্মেছে এবং অবিবাহিতা মা'দের দেখাশোনা করার ব্যবস্থা করে এই সমিতি। উপযুক্ত খোঁজ-খবরাদি নেবার পর কমিটি চেষ্টা করে শিশুর পিতা ও মাতা দু'জনের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করতে। শিশু-সহ একা বাস করছেন এমন মায়েদের জন্য কাজ এবং থাকবার জায়গা খুঁজে দেয় এ সমিতি। শিশুদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয়। প্রশ্ন করি,—সমাজের এ ধরণের উন্নতিমূলক কাজ অবৈধ সন্তান উৎপাদনের পক্ষে সহায়ক হচ্ছে কিনা। অবশ্য তাদের জবাব ছিল 'না'। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পথই বা কি? এ সমস্ত শিশুদের যদি উপযুক্ত যত্ন নেওয়া না হয় তাহ'লে পরিণত বয়সে তারা দেশের দুর্বলতার উৎস হয়ে দাঁড়াবে। গত দুই যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের মনে

ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব এসেছে। তারই ফল সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর এ পরিবর্তন। সেজন্য, সমাজের কল্যাণকামনায় জনসাধারণকে সহানুভূতি দিয়ে বিচার করা দরকার।

বিকালের দিকে এ্যাসট্রিড আমাদের নিয়ে গেল "কার্লমিলেচ গার্তেন"-এ। একটি হ্রদের তীরে, শহরের অপর দিকে এ বাগান। একটি সেতু দুই দিকের যোগ করেছে। সমস্ত বাড়ী এবং ভাস্কর্য বিখ্যাত ভাস্কর কার্লমিলেচ দান করেছেন রাষ্ট্রকে। এখনও এ বাগানের প্রসার ইত্যাদির জন্য তিনিই অর্থ সাহায্য করেন। অ্যাসট্রিড এ শিল্পীর পরম ভক্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েছিলেন। অ্যাসট্রিড দুই শিল্পীর কথোপকথনে দোভাষীর কাজ করেছিল। যে ঘরে কবি বিশ্রাম করেছিলেন সেটিও আমাদের দেখান হ'ল।

বাগানে ঢুকতেই দেখলাম ফোয়ারার সঙ্গে মাতৃমতী এক নারী প্রতিমূর্তি। মায়ের স্নেহ-ভালবাসার মত এই ঝরণা-ধারা,—এই এর অর্থ। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম এ মূর্তি। যত গভীরভাবে দেখলাম ততই অনুভব করলাম এই ভাস্করের শ্রেষ্ঠত্ব।

সমস্ত বাগানটি সম্পূর্ণ দেখতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। কত রকমেরই না প্রতিমূর্তি, ব্রোঞ্জের, পাথরের। তার মধ্যে একটি মূর্তি, শুধু দেহ, মাথা নেই—আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশী। নিখুঁত মানবদেহের অতি উৎকৃষ্ট মডেল এটি। কি অদ্ভুত সজীব গঠন! যতক্ষণ থাকা সম্ভব হ'ল রইলাম সে বাগানে। যখন আর থাকা গেল না তখনই মাত্র চলে এলাম। ওখানে থাকা আনন্দ ও শিক্ষা এই দুই-ই। দুঃখের বিষয়, শিল্পীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। কারণ তিনি সুইডেনের বাইরে গিয়েছিলেন সে সময়। অ্যাস্‌ট্রিড্‌ বললে,—শিল্পী খুব পরিশ্রম করেন। তিনি সব সময়ে বলেন,—"যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনশিখা জ্বলবে ততক্ষণ আমাকে কাজ করতে দাও।"

২রা সেপ্টেম্বর আমরা গেলাম উপসালা। মিস্‌ রুণে লিণ্ডহোলম সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মী। একই ট্রেণে তিনিও এলেন আমাদের দোভাষীর কাজ করতে। ষ্টেশন থেকেই মিঃ জন লুণ্ড্‌বার্গ সোজা আমাদের নিয়ে যান উলতুনা রাজকীয় কৃষি-কলেজ বা "রয়্যাল এগ্রিকালচারেল কলেজ" দেখাতে। পঞ্চাশটি কৃষি-বিদ্যালয় আছে এখানে কিন্তু এই একটি মাত্রই কলেজ যেখানে ২৫০ জন ছাত্র পড়াশুনা করছে। পাঁচ বৎসরের কোর্স বা শিক্ষা-ব্যবস্থা। প্রথম যে ডিগ্রী দেওয়া হয় তার মর্যাদা "বি-এস-সি কৃষি"র সমান। শিক্ষাদানের উন্নত ব্যবস্থা ও নানা বিভাগে গবেষণার সুবিধাসহ এ প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের আঠারোটি বিভাগের ভার-প্রাপ্ত এক-একজন অধ্যাপক আছেন এবং আর একটি বিভাগের ভার একজন লেকচারারের উপর। রসায়ন বিভাগ দেখি। তার পর আমরা আমন্ত্রিত হলাম ছাত্র ও অধ্যাপকদের

সঙ্গে লাঞ্চ খাবার জন্য। লাঞ্চের পর শুধু এ কথাই ভাবছিলাম কখন ভারতবর্ষে ছাত্রেরা এমন পুষ্টিকর খাবার খেতে পাবে। ডেনমার্ক এবং সুইডেন দুই দেশেই লক্ষ্য করলাম ঠান্ডা দেশ হওয়া সত্ত্বেও লোকজন লাঞ্চ সুরু করে ঠান্ডা খাবার দিয়ে। আমরা গরমদেশ ভারতবর্ষে বাস করি এবং পছন্দ করি গরম খাবার। সুইডেনের লোকেরা প্রচুর মাছ খায়। আমাদের বলা হয়েছিল প্রতি পরিবার গড়ে বার্ষিক একশ' পাউন্ড মাছ খায়। এখানে যারা দই খায় সকলেই টক দই খায় উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের মত। এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের ব্যবহার বড় সুন্দর ছিল।

এগ্রিকালচারেল কলেজ থেকে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের বিখ্যাত অটোলেরিনজোলজিকেল বিভাগ বা কান, নাক ও গলা বিভাগ দেখতে। ভাল হাসপাতালের জন্য সুইডেন বহুখ্যাত। সেখানকার এমন সুন্দর ব্যবস্থা দেখে ভারী আনন্দ পেলাম, এ ব্যবস্থার তুলনা হয় না। এ রকম আরামই অর্ধেক রোগ দূর করে দেয়। এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নাইলেন কী যে সুন্দর লোক!

আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীদেরও তারপরে দেখলাম। তিনজন সাংঘাতিক-ভাবে পুড়ে যাওয়া রোগী দেখলাম। চামড়া জোড়া লাগান হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় আমরা এখানে শিখলাম যে একজনের চামড়া অন্যের শরীরে লাগালেও তা ঝরে পড়ে। কেবলমাত্র নিজের চামড়াই জোড়া লাগে, অন্য কারো নয়। কয়েকজন গুরুতর অবস্থার রোগীকে দেখলাম তারা সেরে উঠেছে।

এর পরে দেখলাম উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রাচীনতম (১৪৭৭ সালে স্থাপিত) বৃহত্তম এবং সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ধর্ম বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা-শাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র (কলা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিভাগ আছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪৩০০। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি বাহিরের দিকে যেমন বিরাট ভেতরে তেমনি মনোরম। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ও প্রতিকৃতি আছে ভেতরে। উৎসব কক্ষেই সমাবর্তন উৎসব এবং বিশেষ অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। দুই হাজার লোকের বসবার জায়গা আছে সে কক্ষে। কক্ষের বাইরে প্রবেশ-পথের দরজায় একটি প্রতীক বাক্য লেখা আছে, 'স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ভাল, কিন্তু ঠিক ঠিক চিন্তা করা আরও ভাল।' রেক্টর সদালাপী, কথা বলে আনন্দ পাওয়া গেল।

এ সকল দেখা-শোনার সময় ভারতীয় রসায়নী ডাঃ নীলরতন ধরের দেখা পেয়ে বড় খুশী হলাম। আগে জানতাম না যে তিনি এখানে আছেন। সুতরাং এ আশ্চর্য হওয়া আনন্দেরই হল। তাঁর কাজকর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনে এবং উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দিয়েছে সে খবর শুনে খুব খুশী হলাম।

মিঃ লুন্ডবার্গ তার পরে আমাদের সমস্ত শহর নিজে গাড়ী চালিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। রমণীয় পরিবেশে তৈরী উন্মাদ হাসপাতাল দেখলাম বাইরে থেকে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরে স্নায়বিক দুর্বলতাজনিত ব্যাধির সংখ্যা অধিক

হয়েছে বলে শুনলাম। সামরিক বিমানবহরের যাতায়াত জনসাধারণের মনের উপর ভীতিজনক ছায়া ফেলে গেছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর উপসালায় উনষাট হাজার লোক বসবাস করছে।

সারাদিনের কার্যসূচী অন্তে আমরা মিঃ লুন্ডবার্গের বাড়ীতে গেলাম। সাধারণগোছের ভাড়াটে ফ্ল্যাট এটি। মিসেস লুন্ডবার্গ অতি সাদাসিধে এবং স্নেহশীলা রমণী। মিঃ ও মিসেস ধর এবং আরও কয়েকজন বন্ধুকে রাত্রিভোজনে (সাপার) নিমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং কথাবার্তা বলার সুযোগ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

মিঃ ও মিসেস লুন্ডবার্গের তিন ছেলে,—ভদ্র ও সুসভ্য। বড় ছেলে লারস্ ওলিফ-এর বয়স প্রায় তের বছর। সামান্য ইংরেজী জানে সে। এ তিনটি ছোট্ট ছেলের ব্যবহার ইত্যাদি দেখে মনে হল কোথায় যেন সুইডেনের সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টির একটা মিল রয়েছে। পরদিন তারা স্কুলে যেতে নারাজ হল, অতিথিদের সঙ্গে কাটাবার জন্য বাড়ীতেই থাকতে চাইল। বললাম, আমরা সারাদিনের সমস্তক্ষণই প্রায় বাইরে কাটাবো। স্কুলে যাবার সময় আমাদের বিদায়সম্ভাষণ জানাল অতি ভদ্রভাবে। কিন্তু তারা যে ব্যথিত হ'ল কচিমুখের ভাবই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

অরণ্য সম্পদের জন্য সুইডেনের খ্যাতি। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির দানকে আরও বাড়াবার জন্য এদের অবিরাম চেষ্টা চলছে। আর সুইডিস ষ্টীলও তার গুণের জন্য খ্যাত। সেজন্য আমরা কোনও পরি-কল্পনানুযায়ী তৈরী বনানী ও ষ্টীলের কারখানা দেখতে চাইলাম। যাতে আমরা এই দুটিই দেখতে পারি সেই জন্য ৩রা সেপ্টেম্বর "সোয়েডারফোর্স ষ্টীল ওয়ার্কসে" যাবার ব্যবস্থা হ'ল।

উজ্জ্বল রোদে ভরে ছিল দিনটি। পাইন এবং স্প্রুস-এর অরণ্যানী রাস্তার দুই পাশে। সূর্যের আলো তার উপর পড়ে দৃশ্যকে মনোরম করে তুলেছে। সম্পূর্ণরূপে আধুনিক-পদ্ধতিতে তৈরী এক বন দেখবার জন্য আমরা একজায়গায় থামলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, প্রত্যেক গাছের মধ্যে সূর্যের আলো পড়তে পারে এবং বাতাস খেলতে পারার মত ফাঁক রাখা হয়েছে। হেঁটে ভেতরে ঢুকলাম। সে এক নূতন আনন্দ!

জানলাম কয়েকটি বন আছে যেখানে নিচুদরের এক রকম গাছ জন্মায়, যার বাজার মূল্য কম। কিন্তু উঁচুদরের গাছ লাগাবার জন্য সোজা এ সমস্ত কেটে ফেলাও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিজনক। সেজন্য নূতন এক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিমান থেকে এ সকল অরণ্যের উপর 'হরমোন' ছিটিয়ে দেওয়া। হরমোন-শক্তি খুব তাড়াতাড়ি এ সকল গাছকে বাড়িয়ে তোলে। তখন তাদের কেটে ফেলা হয় এবং উন্নত ধরণের গাছ লাগান হয়। এ দেশ কিভাবে আপন বনজ সম্পদকে যত্ন করছে তা দেখবার মতই বটে।

উপসালা থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে ডালএলভেন নদীর তীরে—সোয়েডারফোর্স ষ্টীল কারখানা। আগেই বলা হয়েছে—সুইডেনে কয়লা প্রায় নাই বললেই চলে। কাঠকয়লারও সরবরাহ কম, কারণ কাঠ হ'তে কাগজের মণ্ড তৈরী করাই অধিক লাভজনক। কাজেই লোহা তৈরীর এমন একটি পন্থা আবিষ্কার দরকার যাতে অংগারের ব্যবহার করতে হয় খুব কম। 'সোয়েডারফোর্স'-এ এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হচ্ছে। মিঃ মার্টিন ভিবার্গ এর আবিষ্কর্তা। মিঃ জন ষ্টালহেড্ কারখানা ঘুরে দেখাতে দেখাতে এখানকার কার্যাবলী যা বললেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হ'ল এই—বৈদ্যুতিক তাপের সাহায্যে উত্তপ্ত কারবুরেটারে কারবন মনো-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস ২ : ১ এই অনুপাতে উৎপন্ন করা হয়। এখানে আকরিক হতে লোহা উৎপন্নের ফারনেস বা চুল্লী হ'তে নির্গত গ্যাসও জ্বালানীর সংস্পর্শে আসে। এই জ্বালানী মুখ্যতঃ কোন না কোন প্রকারের কার্বন (অংগার) ও হাইড্রোজেন। আকরিক হ'তে লৌহ তৈরীর শেষ প্রক্রিয়ার স্থানে গ্যাস আকরিককে লোহায় পরিণত করে।

মরচে না ধরে এমন ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য উঁচুদরের ইস্পাত তৈরী করা দেখলাম। মিঃ ষ্টালহেড সমস্ত পদ্ধতিই বিশ্লেষণ করলেন। যে প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলাম তিনি তার উত্তর দিলেন।

এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ছয় হাজার টন। সাত শত কর্মী আছেন কারখানায় এবং এক শত আছেন দপ্তরখানায়। কারখানায় শ্রমিককর্মীরা গড়ে বার্ষিক বেতন পায় আট হাজার ক্রোনার (১ সুইডিস ক্রোনার=১৪ আনা)। শ্রমিকদের খাওয়ার মান বেশ সন্তোষজনক।

কারখানার কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি খুবই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়েছেন। অল্প কয়েক ঘণ্টার অবস্থানকে যত রকমে পারেন আনন্দময় করার জন্য যতদূর সম্ভব তাঁরা তাই করেছেন। আমাদের তাঁরা গ্রহণ করলেন অতি আন্তরিকতা নিয়ে এ অনুভব করলাম। লাঞ্চের জন্য আমরা আমন্ত্রিত হলাম। শুধু যে রসাল সুন্দর খাবার পেলাম তা নয়, সুইডেনের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে এবং কিভাবে উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টা তাঁরা করছেন সে বিষয়েও আন্তরিক আলোচনা ইত্যাদি হল। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন, আমরাও শুভ ইচ্ছা জানালাম আমাদের দেশের তরফ থেকে। ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতির ভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ শুভেচ্ছা এবং আমাদের প্রতি এ সকল আন্তরিকতার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম।

উপসালা ফিরে আসার পর নূতন কয়েকটি অঞ্চল দেখলাম। একটি উদ্যানকে মাঝখানে রেখে এ অঞ্চলে নূতন বাড়ী ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। শিশুরা ঐ উদ্যানে খেলাধূলা করে। কোন রকমের মোটর গাড়ী এর ভেতরে আসতে পারে না, সুতরাং ছেলেমেয়েরা নির্ভাবনায় দৌড়াদৌড়ি ও খেলাধূলা ইত্যাদি করতে পারে। মনে হ'ল বাড়ী তৈরী করবার এ এক চমৎকার ব্যবস্থা, যেখানে শিশুদের সুখ-সুবিধাই প্রথম

স্থান পেয়েছে। মায়েরা শিশুদের সম্বন্ধে ভয় ও উদ্বেগশূন্য মনে বাড়ী ছেড়ে কাজে যেতে পারে।

বিকালে আমরা উপসালা থেকে বিদায় নিলাম। লুন্ডবার্গ পরিবারের জন্যই উপসালার দিনগুলি আমাদের অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। পরদেশী অপরিচিত লোককে আপন করে নেবার জন্য উদার হৃদয়ের প্রয়োজন। সেই বৃহৎ অন্তর ছিল ঐ পরিবারের।

উপসালা ষ্টেশনে আমাদের বিদায়ের ক্ষণটি করুণ হয়ে উঠেছিল। মিঃ লুন্ডবার্গের চেপে রাখা ব্যথা, তা প্রকাশ করার অক্ষমতা অনুভব করলাম। ট্রেণ প্রায় ছেড়ে দেবে। এমন সময়ে দোভাষীকে আমাদের একথা বলতে বললেন,—"আবার আসবেন। আমি ইংরেজী ভাষা শিখে নেবো। যখন আবার আসবেন তখন আমি নিজেই কথা বলতে পারবো যাতে পরস্পরের আরও নিকট হ'তে পারবো।" আমাদের জন্য যে প্রেম ও প্রীতি তাঁর ছিল সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং একথা বলে বিদায় নিলাম যে লুন্ডবার্গ পরিবারের স্মৃতি কখনো বিস্মৃত হ'ব না।

ষ্টকহলম-এ ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই এ্যাসট্রিড এবং মিঃ ওংষ্ট্রম এলেন আমাদের নিতে। তাঁদের বাড়ীতে আমাদের সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। পারিবারিক আনন্দের আস্বাদ ছিল এখানকার সব কিছুতেই। সুইডেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু কথাবার্তা হল। প্রথম যেদিন ষ্টকহলম-এ আসি সেদিনের একটি আলোচনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। একজন সুইডিস ভদ্রলোক বললেন, "আমরা রাশিয়ার বড্ড বেশী কাছে। আমাদের উপযুক্ত দেশরক্ষা ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের শক্তি ছিল বলেই তো হিটলার আক্রমণ করতে পারেনি।" তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা দেশরক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না, বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র সঙ্ঘের দরকার যেখানে সমস্ত রাষ্ট্রের জনতা একই সুযোগ সুবিধার অধিকারী হবে এবং নিজ নিজ সমৃদ্ধির জন্য পূর্ণ কার্যকরী হতে পারবে। হিটলারের সুইডেন আক্রমণ না করার কারণ দেশরক্ষার শক্তিশালী ব্যবস্থা নয়। প্রয়োজন মনে করেননি বলেই আক্রমণ করেন নি। সমস্ত দেশ বিশেষ করে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা এবং বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র সংস্থা গড়ার জন্য চেষ্টা করা দরকার। ঐ সংস্থার উপরই নির্ভর করে তাদের নিজ নিজ নিরাপত্তা তথা বিশ্ব-নিরাপত্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান জাতিগুলি অস্ত্রত্যাগ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের পক্ষে আশা করার মত কিছুই নাই। ভদ্রলোককে যে এ কথায় বিশ্বাস করাতে পারলাম, তা আমার মনে হল না। তবে অ্যাসট্রিড আমার সঙ্গে একমত হওয়ায় খুশী হ'লাম।

মিঃ ওংষ্ট্রম যদিও কথা বলেন কম কিন্তু ভারী রসিক। আমরা প্রাণভরে উপভোগ করলাম তাঁর কথাবার্তায় রসিকতা। ওখান থেকে চলে আসার সামান্য

একটু আগে তাঁদের মেয়েদের মধ্যে একজন এল। শুনে সে বিস্মিত হ'ল যে ভারতবর্ষে ঠাকুমারা নাতি-নাতনীদের যত্ন আত্যি করেন। বললে সে "আমার ছেলে-মেয়েদের যত্ন আমিই করব, মা অথবা শাশুড়ী কেন তাদের যত্ন নেবেন?" ভারতীয় রীতিনীতি তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। আমরাও পাশ্চাত্যের বুড়ো মা-বাবার তাচ্ছিল্যসূচক অবস্থার কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

৪ঠা সেপ্টেম্বর। আমরা ষ্টকহলম ছেড়ে রওনা হলাম হেলসিংকি। এ্যাসট্রিড এবং ওংষ্ট্রম দুজনেই ষ্টেশনে এলেন বিদায় দিতে। সুন্দর ফুল এবং বিভিন্ন রকমের বেশ কিছু আপেল ফল নিয়ে এলেন সংগে। এ সমস্ত আপেল খেয়ে বুঝলাম 'যেটি দেখতে ভাল, সেটি সবচেয়ে মিষ্টি নাও হ'তে পারে!' আমার সুইডিস বোনের কাছ থেকে বিদায় নিতে ব্যথা অনুভব করলাম, সাধনারও সে অবস্থা। জানতাম না কখন আবার আমাদের দেখা হ'বে। কিন্তু মিঃ ওংষ্ট্রম একটু ইংগিত দিয়েছিলেন যে, ১৯৫৪ সালের কোন সময়ে তাঁরা ভারতবর্ষে আসতে পারেন। তা সত্ত্বেও এ ধারণা করতে পারি নি যে, ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে এত শীঘ্র তাঁদের সংগে মিলিত হতে পারব। কয়েক দিনের জন্য আমাদের মাঝে তাদের পেয়ে আনন্দের অবধি ছিল না। ভারতীয় কৃষ্টিকে ভালবাসে এ্যাসট্রিড, তাই ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্বার সংগে নিজেকে মিলিয়ে দেখবার জন্য সে উৎসুক ছিল। দেখে আমাদের সকলেরই ভাল লাগল।

মিঃ জন ফন্ বিলিয়ন্ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী একজন ডাচ যুবক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধনার সতীর্থ ছিল। সেও আমাদের সংগে একই জাহাজে হেলসিংকি যাচ্ছিল। কোপেনহাগেন ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ সে আমাদের সংগী হল। আমাদের সংগে এমন আন্তরিকভাবে মিশেছিল যে, হেলসিংকি থেকে ফিরে আসার পথে একজন ডেনিস মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে আমি তার বাবা এবং সাধনা তার বোন কিনা। জবাবে সে বলেছিল,—"হ্যাঁ"।

এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, পশ্চিমে জাহাজের ভাড়ার সংগে খাওয়া খরচও যুক্ত। সেজন্য নেহাৎ প্রয়োজনীয় খরচের আন্দাজে সামান্য খুচরা মাত্র সংগে রেখেছিলাম। সুতরাং খাবার দাম দেবার জন্য "বারজারইয়ার্ল" জাহাজেই আমাদের 'ট্র্যাভেলার্স চেক' ভাঙাতে হ'ল। প্রত্যেক এক পাউন্ড ষ্টার্লিং মুদ্রার জন্য আমরা পেলাম মাত্র ৬৩০ ফিনিস্ মার্ক অথচ ঐ একই মুদ্রা ভাঙিয়ে হেলসিংকিতে পেয়েছিলাম ৯০০ ফিনিস মুদ্রা। এ রকম অস্বাভাবিক পার্থক্যের কারণ কি জানি না। যদি কোন আইনের ফলে এ ঘটে থাকে, তবে এর পরিবর্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। জাহাজে যে খাবার পেলাম আমাদের পক্ষে তা বড় সুখের হল না, কারণ গরু অথবা শূকরের মাংস আমরা খাই না। বলটিক সাগরও বড় অশান্ত ছিল।

৫ই সকালবেলা হেলসিংকির প্রায় কাছে এসে পড়লাম। চারদিকের দৃশ্যও ক্রমেই মনোহর হয়ে চোখে পড়ল।

ওয়াম্পুলা পরিবারের আতিথেয়তা ইত্যাদির জন্যই হেলসিংকিতে থাকার

চারটি দিন খুব উপভোগ্য হয়েছিল। মিসেস টেলেরভো ওয়াম্পুলাও লন্ডনে সাধনার সতীর্থ ছিলেন। তাঁরাই আমাদের সমস্ত দায়িত্ব নিলেন এবং আমাদের থাকাকে যথাসাধ্য আরামের করতে চেষ্টা পেলেন। তাঁদের বড় মেয়ে হিলেভীকে পাঠিয়েছিলেন বন্দরে আমাদের স্বাগতঃ জানাবার জন্য। হেলসিংকিতে পৌঁছাবার পরমুহূর্তেই মিসেস কাল্লিনেন টেলিফোনে তাঁদের গ্রামের বাড়ীতে তাঁদেরই সঙ্গে সপ্তাহ শেষটা কাটাবার জন্য আমাদের অনুরোধ জানালেন। ফিনল্যান্ডের ভূতপূর্ব দেশরক্ষাসচিব মিঃ ইয়ারো কাল্লিনেনের পত্নী তিনি। কিন্তু আমরা দুঃখিত যে, সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ ফিনল্যান্ডে মাত্র চারদিন থাকা স্থির ছিল। শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে মিঃ কাল্লিনেন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখনই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। গ্রামের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই তিনি আমাদের 'কো-অপারেটিভ ইউনিয়ান'-এ নিয়ে গেলেন। তারপরে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক ভিরতানেনের খামারে। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মিঃ ওলা ভিকস্ট্রমও সাহায্য করেছেন অনেক।

ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৪২ লক্ষ, ডেনমার্কের চেয়ে সামান্য কম। ফিনল্যান্ডের আয়তন ডেনমার্কের প্রায় আট গুণ (৩, ৩৭,০০৯ বর্গ কিলোমিটার)। এ দেশকে বলা হয় সহস্র হ্রদের দেশ—যদিও হ্রদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সেজন্য যারা খরচে কুলোতে পারে, তারা অন্ততঃ একখানা মোটর বোট রাখবার চেষ্টা করে। শতকরা নব্বই জন লোক ফিনিস ভাষা বলে, বাকী দশ জন বলে সুইডিস ভাষা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফিনল্যান্ডকে নিজ দেশের কিছু অংশ (১৭ হাজার বর্গমাইলের উপর) রাশিয়াকে দখল দিয়ে দিতে হয়। ঐ অঞ্চলের চার লক্ষ অধিবাসী সকলেই বাড়ীঘর ছেড়ে ফিনল্যান্ডে চলে এসেছে।

হেলসিংকির বিখ্যাত সেন্ট নিকোলাস গির্জা দেখতে গেলাম সর্বপ্রথমে। এখানকার স্থাপত্য ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জার্মানী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গির্জার ভেতরে উপাসনার বেদী ছাড়া অন্য কোন রকম সাজসজ্জা নেই। বেদীর উপর পোলিশ শিল্পী পাউল নেস-এর আঁকা একখানি ছবি আছে। স্বতঃই তা মনকে আকৃষ্ট করে। ক্রুশবিদ্ধ হ'বার পর যীশুখৃষ্টকে নামানো হচ্ছে,—এই ছবির বিষয়বস্তু। বাইরে গম্বুজের চারদিকে যীশুর দ্বাদশ প্রধান শিষ্যের প্রতিমূর্তি আছে। প্রবেশ-দুয়ার পর্যন্ত নীচ থেকে যে সিঁড়ি উঠে গেছে, তা সত্যিই দেখবার মত এবং সিঁড়িগুলিও বেশ প্রশস্ত।

গির্জার সামনে একটু দূরে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের একটি প্রতিমূর্তি আছে। তিনি ফিনল্যান্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে কথিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফিনল্যান্ড ১৮০৯ সালে রাশিয়ার জারের অধীনে এক স্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা মাত্র। এর পূর্বে প্রায় ছয়শ' বৎসর সুইডেনের রাজার অধীন ছিল এ স্থান। ১৯১৭-১৮

সালে ফিনল্যান্ড রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় একমাত্র ফিনল্যান্ডেই সাধারণতন্ত্র—ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে রাজতন্ত্র।

গির্জার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন মহিলা এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন কোন্ দেশ থেকে আমরা এসেছি। ভারতবর্ষ থেকে এসেছি শুনে নানা প্রশ্ন করলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। একটি শিক্ষায়তনে তিনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার শিক্ষক এবং ট্যাক্স ইত্যাদি বাদে মাসে বেতন পান পঞ্চান্ন হাজার ফিনিস মার্ক (প্রায় ৬০ পাউন্ড)। আমি জিজ্ঞেস করি—"যুদ্ধের পরে ফিনল্যান্ড এত তাড়াতাড়ি কি করে পূর্ব অবস্থায় ফিরে এল? এর কারণ কি?" জবাব দিলেন তিনি, "আমরা খুব কর্মঠ জাতি এবং পরিশ্রমই আমাদের প্রধান সম্পদ"—সেই একই প্রশ্ন যখন দু'দিন আগে করেছিলাম মিঃ কাল্লিনেনকে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "কাঠ এবং কাজ—এই দুটিই আমাদের প্রধান সম্পদ।"

মিঃ ওয়াপ্পুলা এলেন এবং তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন রাত্রিবেলায় স্বল্প ভোজনের (সাপার) জন্য। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়েটি মাত্র পনেরো বছরের। ভদ্র এবং ভারী সুন্দর প্রকৃতি সব কটি ছেলেমেয়ের। বংশগত কৃষ্টির আবহমান ধারার পরিচয় পাওয়া গেল তাতে। একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, পশ্চিমের অন্য কোন দেশে তা বড় একটা দেখিনি। ভারতীয় রীতির স্পর্শ ছিল তাতে। মিঃ এবং মিসেস ওয়াপ্পুলা দু'জনেই সারাক্ষণ 'এটা খান, ওটা খান' করে আমাদের জোর করছিলেন।

পরদিন সকালে মিসেস ওয়াপ্পুলা আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য সেন্ট নিকোলাস গির্জায় প্রার্থনায় যোগ দিলাম আমরা।

'জাতীয় আর্ট' গ্যালারী দেখা সত্যিই আনন্দের। পশ্চিমের অন্যান্য দেশের চেয়ে ভিন্ন এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ফিনিস চিত্রকলায়। বিখ্যাত ফিনিস চিত্রশিল্পী গ্যালেন কালেলার অঙ্কিত চিত্র "মৃত পুত্রের পাশে জননী" অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি।

দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন গবেষণাগার দেখতে। সেদিন ছিল রবিবার। মিসেস ওয়াপ্পুলার বন্ধু এবং একজন সহকারী অধ্যাপিকা শার্লি এসকোলা আমাদের জন্য গবেষণাগারের দরজা খুলে দিলেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এ ভদ্রতার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মিঃ ওয়াপ্পুলা আমাদের সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন। ডাঃ নিলো কার্লিও শিক্ষাবোর্ডের একজন সদস্য। তিনি এবং আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফিনল্যান্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম সেজন্য। ডাঃ কার্লিও তাঁর লেখা বই "ফিনল্যান্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা" পুস্তকখানি আমাদের উপহার দিলেন। এখানেই স্থির হ'ল মিসেস ওয়াপ্পুলা যেখানে শিক্ষক, সেই শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজটি দেখতে যাওয়া। ডাঃ কার্লিও নিয়ে যাবেন অন্য দু'টি বিদ্যালয়ে।

১লা সেপ্টেম্বর সোমবার ভোরে মিসেস ওয়াপ্পুলা আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে নিয়ে যেতে এলেন। তখন পৌনে আট-টা।

এই কলেজে সর্বমোট স্নাতক শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক শত। ট্রেণিং কলেজের সঙ্গে যুক্ত আছে হাতে-কলমে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিখবার জন্য একটি স্কুল। তার ছাত্র সংখ্যা সাত শত। এখানকার কাজ সুরু হয় প্রার্থনান্তে। সমস্ত শিক্ষার্থী-শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকবর্গ একটি হল ঘরে সমবেত হন। ফিনিস ভাষায় বাইবেলের স্তোত্র পড়া ও গান করা হয়। বড় পবিত্র অনুভূতি। এ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর ছাত্রেরা সকলে শান্তভাবে নিজ নিজ ক্লাশে চলে গেল। চারদিক ঘুরে দেখলাম, সুন্দর ব্যবস্থা; কিন্তু ডাঃ কার্লিও তার পরে নতুন তৈরী যে 'মুনকি নিমেন সেকেন্ডারী স্কুল' দেখালেন তাতেই বুঝতে পারলাম, ফিনল্যান্ডের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায়তন কতদূর উন্নত হয়েছে। চমৎকার পরিবেশে সুপরিকল্পিত এ বিদ্যায়তনটি। প্রায় আট শত ছাত্র রয়েছে সেখানে।

আমাদের যখন সর্বোচ্চ ক্লাশে নিয়ে যাওয়া হল, তখন ফিনিস কবি রুনেবার্গের লেখা একটি সমবেত গান গেয়ে তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। স্মরণার্থে তারা আমাকে এর ইংরেজী অনুবাদ দিল। তার সম্পূর্ণ অংশটুকুই এখানে উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি;—

"হারিউলার বিশাল সর্বোচ্চ
পাহাড়ের
সর্বোচ্চ বৃক্ষের শীর্ষে উড়ি আমি
ঘন নীল জল চক্‌মক্ করে
বহু বিস্তৃত, স্থির কাকচক্ষু জল ঃ
লাংগেলম্যভেসির প্রান্তদেশে।
সেখানে ঝক্‌মক্ করে এক
রুপালী রেখা
আর রোইন নদীর মধুর লহরী
চুম্বন করছে তার প্রত্যন্ত।
ছোট্ট একটি পাখী মাত্র আমি
ঝাপটানো ডানাসহ, দুর্বল।
কিন্তু হ'তাম যদি শক্তিমান ঈগল পাখী
যে উচ্চে, স্বর্গে উড়ে বেড়ায়।
চিরদিন উড়তাম তবে
আরো আরো উচ্চে
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের
সিংহাসনের কাছে

তাঁর পদ যুগলের ভেতর
যেতাম ডুবে
ঢেলে দিয়ে আমার
মৃদু কম্পিত স্বর।
ওহে পবিত্র স্বর্গের প্রতিভূ,
শোন এখন ছোট্ট পাখীর প্রার্থনা—
এত মধুর পৃথিবী তোমার
এমন অদ্ভুত সুন্দর তোমার স্বর্গ।
হৃদগুলি চির উজ্জ্বল হোক মোদের
প্রেমে, অগ্নিশিখার মত;
ওহে প্রিয় দেবতা আমাদের শিক্ষা দাও
আশা করতে, ভালবাসতে আর
শ্রদ্ধা করতে আমাদের জন্মভূমিকে।"

তাদের অনুরোধে সাধনাও একটি রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে শোনাল এবং ইংরেজীতে তার অর্থ বুঝিয়ে বলল।

এর পরে সমস্ত ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের সামনে একটি খোলা জায়গায় জড় হ'ল এবং বিদ্যালয়ের বারান্দা থেকে তাদের উদ্দেশে কিছু বলতে প্রধান শিক্ষক আমায় অনুরোধ জানালেন। প্রথমে নিকট সংস্পর্শে আসতে পারার সুযোগ দেবার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম। আমি বলি,—"ফিন জাতি বড় সাহসী ও পরিশ্রমী। যদি সমস্ত মানবজাতিকে এক বলে তারা মনে করে, তবে জগতের কল্যাণে তারা অনেক বেশী দান দিতে পারবে। আজকের ফিনিস ছাত্ররাই হবে আগামী দিনে ফিনল্যাণ্ডের স্রষ্টা। সমস্ত মানব জাতির প্রতি প্রেমের ভাব যদি তারা বাড়াতে পারে, তবেই তারা জগতের কাজে নিজেদের যোগ্য স্থান পাবে। মানবপ্রকৃতি সর্বত্রই এক—সে ভারতবর্ষেই হোক আর ফিনল্যাণ্ডেই হোক। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সেই সত্যকে ছাত্রদের মনে উদ্বুদ্ধ করা। ভারতবর্ষে আমরা তাতেই বিশ্বাস করি জেনো। যদিও আমরা বহুদূরে বাস করি, তবু বিশ্বাস করি আমরা পরস্পরের এত কাছে যে, তা কল্পনারও বাইরে। যদি তোমাদের স্কুলে আমাদের আসা সামান্য পরিমাণেও দুই দেশকে নিকটতর করার কাজে সাহায্য করে, তবে এ দিনকে জীবনের গর্ব হিসাবে স্মরণ করবো। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই যে, সে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আমার শুভেচ্ছা জানাই তোমাদের এবং সে সঙ্গে জানাই ভারতীয় জনসাধারণের শুভকামনা।" ফিন ভাষায় এর অনুবাদ করা হল। ছাত্ররা স্বাস্থ্যবান, পরিচ্ছন্ন পোশাক তাদের। অত্যন্ত সুশৃংখল ছিল তারা।

এর পরে ডাঃ কার্লিও অন্য আর একটি স্কুলে আমাদের নিয়ে গেলেন। স্কুলটির নাম "হেলসিংগিন সোউমীলাইনেন ইয় টাইস কোলু।" এখানকার ব্যবস্থা

ইত্যাদিও বেশ ভাল। এই স্কুলের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হ'ল এর উপরতলাকার বারান্দার সুন্দর ফুলের বাগানটি। এতে চিন্তার মৌলিকত্ব আছে।

এবার সংক্ষেপে ফিনল্যাণ্ডের শিক্ষা-পদ্ধতির বর্ণনা করা এখানে যুক্তিযুক্ত হবে মনে করি।

সরকারী ব্যবস্থা হিসাবে ১৯২১ সালের ১লা আগস্ট "বাধ্যতামূলক স্কুল উপস্থিতি আইন" পাশ হয়; কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে স্কুলে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক বস্তুতপক্ষে ফিনল্যাণ্ডে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ব্যবস্থা। ১৬৮৬ সালের "সুইডেন ফিনল্যাণ্ড গির্জা আইন" নির্দেশ দেয় যে, প্রত্যেককেই পড়তে শিখতে হবে, তার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের যথেষ্ট অংশ কণ্ঠস্থ করতে হবে। স্কুলে উপস্থিত থাকাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক করার জন্য সামাজিক আইনগুলি অতি কড়া ছিল। অশিক্ষিত ব্যক্তিকে এমন কি বিয়ে করার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হ'ত না; কিন্তু রাশিয়ার জারেরা ফিনল্যাণ্ডের বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে ভাল চোখে দেখতেন না। সুতরাং দেশ স্বাধীন হবার পরই মাত্র শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করা সম্ভব হল।

"শরৎকালের সুরু থেকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার সময় আরম্ভ হয়। শিশু সে সময়ে সাত বৎসর বয়সের হয়। নয় বৎসর এ শিক্ষার কাল। সাধারণ স্কুলের আট বৎসর শিক্ষাকাল যদি শিশু প্রশংসনীয়ভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে, তবেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ হ'ল। সেই অনুযায়ী প্রায় সমস্ত ছাত্রই আট বৎসরে তাদের স্কুল শিক্ষা শেষ করে।" ১৯৫০ সালে বাধ্যতামূলক বয়স শ্রেণীর প্রায় পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার ছাত্র ছিল স্কুলগুলিতে।

ঐ বয়সের অধিকাংশ ছাত্রই সাধারণ বা প্রাথমিক স্কুলে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করে। সাত বৎসরের শিক্ষাকাল যুক্ত প্রাথমিক স্কুলগুলি নিম্ন ও উচ্চ স্কুলে বিভক্ত। নিম্নস্কুলে দু'টি কি তিনটি শ্রেণী এবং উচ্চস্কুলে চারটি কি পাঁচটি শ্রেণী থাকে। তারপরে এক বৎসরের জন্য চলতি ক্লাস হয়, মাঝে মাঝে সে শিক্ষার কাল দুই বৎসরও হতে পারে। প্রাথমিক স্কুলগুলির মধ্যে উচ্চ প্রাইমারীগুলিই প্রধান। এখানেই সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত। উচ্চ ও নিম্ন দুই প্রাইমারী স্কুলেই কার্যকাল বৎসরে ৩৬ সপ্তাহ।

ফোক্ স্কুল বা প্রাইমারী স্কুল ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা স্কুল আছে। বিভিন্ন প্রকারের স্কুলগুলির মধ্যে সহযোগিতার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। একটি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালে এ কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে, সরকার তা গ্রহণ করেনি। নতুন একটি কমিটি সমস্ত বিষয়টি আবার পরীক্ষা করে দেখছে।

১৯৫২-৫৩ সালে এ দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এক শত ছিল এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫৬০০ এরও উপর। ফোক্ স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ নব্বই হাজার এবং শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল প্রায় একুশ হাজার।

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা। এটি দ্বিভাষিক দেশ। শতকরা নব্বই জনেরও বেশী

ব্যবহার করে ফিনিস ভাষা এবং বাকীরা সকলে ব্যবহার করে সুইডিস ভাষা। ফিনিস ছাত্র এগারো বৎসর বয়স হলে সুইডিস শিক্ষা সুরু করে। সুইডিস ছাত্রও ফিনিস শিখে এগারো বৎসর বয়সে। সুতরাং ছাত্র যখন স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে, সে সময়ের মধ্যে সে দুই ভাষাই আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র প্রথমে যে বিদেশী আধুনিক ভাষা শেখে, তা হ'ল ইংরেজী, জার্মাণ অথবা রুশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিনিস অথবা সুইডিস এই দু'ই ভাষার মধ্যে নিজ পছন্দ মাফিক একটি ভাষায় বক্তৃতা করেন। দু'টি ভাষাই ছাত্রদের আয়ত্তে সুতরাং এতে কোন অসুবিধাই তার হয় না।

কয়েক যুগ ধরেই সাধারণ স্কুলগুলির ছাত্ররা শিক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং বই ইত্যাদি বিনা খরচে পেয়ে থাকে। ১৯৪৩ সাল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত একবেলার খাবার বিনা খরচে ছাত্রদের দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। যে জিলাতে জনসংখ্যা কম এবং স্কুল থেকে অন্ততঃ পাঁচ কিলোমিটার দূরে বাস করে, সে সব ছাত্রদের জন্য বিনা খরচে থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা রয়েছে 'ছাত্র বোর্ডিং হাউস' এ। যেখানে এ ব্যবস্থা নেই সেখানে ঐরকম সাহায্য দেওয়া হয় যাতে অন্য বাড়ী ঘরে থেকে ছাত্র পড়তে পারে। এ ছাড়াও দরিদ্র শিশুদের পোশাক এবং জুতো ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়। ছাত্রদের সাধারণ চিকিৎসা বা দাঁতের চিকিৎসা ইত্যাদিও বিনা খরচে করা হয়।

গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছে। ১৯২০-২১ সালে ঐ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫৮৯; কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে সে সংখ্যা বেড়ে হয় ১৪,৪১৪। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (১০ হাজারেরও বেশী) ছাত্র রয়েছে হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

মাধ্যমিক স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ছাত্র ফিনল্যাণ্ডে রয়েছে—উত্তর ইয়োরোপের সমস্ত দেশগুলির তুলনায় সে সংখ্যা বেশী।

অধ্যাপক এ, আই, ভির্তানেন-এর প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানাগার দেখাই আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বিখ্যাত অধ্যাপক সে সময়ে ফিনল্যাণ্ডে ছিলেন না। তাঁর সহকর্মী মিঃ জে, কে, মিত্তিনেন সমস্ত বিজ্ঞানাগারটি ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের। তিনি প্রথমে অধ্যাপকের গরুর খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রধান কাজের তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন। ফিনল্যাণ্ডে বৎসরে প্রায় আট মাস বরফ পড়ে। সুতরাং সংরক্ষিত খাদ্যই গরুকে খাওয়ানো হয়। দুধের গুণাগুণ নির্ভর করে গরুর খাদ্যের গুণাগুণের উপর। যে পদ্ধতিতে সাধারণতঃ গো-খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে তাতে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ প্রোটিন এবং ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাপক ভির্তানেন একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছেন এজন্য। ঘাসের সঙ্গে ডাইলিউট, সাল্‌ফিউরিক্ এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এ্যাসিড্ মিশিয়ে তার পি, এইচ, মান তিন এবং চারের মধ্যে রেখেই তিনি গো-খাদ্য সংরক্ষণের নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেছেন।

এ পন্থায় শতকরা দুই কি তিন ভাগ প্রোটিন ও ভিটামিন নষ্ট হয় মাত্র। এই পদ্ধতি ফিনল্যাণ্ডে সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমস্ত দেশের দুধ উৎপাদন ব্যবস্থাকে অনন্যসাধারণভাবে উন্নত করেছে। গুণ হিসাবে এখানকার দুধ প্রথম শ্রেণীর। অধ্যাপকের আর একটি স্মরণীয় কাজ হল বায়ুর নাইট্রোজেনকে যোগজরূপে জমিতে ধরে রাখা। কল্যাই জাতীয় শস্যের গাছ ইত্যাদি দ্বারা যেভাবে নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করা হয় সে পদ্ধতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে, লুসার্ন ও ক্লোভার জাতীয় শস্য উৎপাদন ঠিক মতো করলে ভূমির প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। গত বিশ বছর বা সে রকম সময় ধরে তাঁর খামারে কোন রকম নাইট্রোজেনযুক্ত কৃত্রিম সার ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু তাতে কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। ভারতবর্ষেও এই পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করলে ফলপ্রসূ হতে পারে।

আরও একটি জিনিস শিখলাম এখানে। আমি জানতাম না যে, মানুষের রক্তে যে রঙীন পদার্থ (হিমিন) আছে তা উদ্ভিত জগতেও বর্তমান। একটি মটরশুঁটি জাতীয় ফলযুক্ত সব্জী দেখলাম, তার ভেতরে রক্তের মত একটা জিনিস রয়েছে। জানলাম ঐ রক্তের মত পদার্থ 'হিমিন' বলেই ধরা পড়েছে।

গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাওয়াটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ডাঃ কালিও আমাদের নিয়ে গেলেন সেখানে। যাওয়ার পথে দেখলাম ডাঃ এলিয়াস ল্যোনরত-এর সমাধিস্থল। বিখ্যাত ফিনিস মহাকাব্য 'কালেভালা'র সংগ্রহীতা তিনি। সাধারণ মানুষ এবং কৃষক ইত্যাদির মুখ থেকে এ সব গাথা ও কাহিনী তিনি সংগ্রহ করে সন্নিবদ্ধ করেছেন। "বধূর প্রতি উপদেশ"—এ অধ্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় প্রকৃতি ও মনোভাবের অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যাবে। নববিবাহিত বধূ হয়ে মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—মা, বাবার স্নেহ এবং সে সঙ্গে সকল অতীতকে ভুলে যাওয়ার জন্য। স্বামীর মা, বাবা, ভাইবোনকেই ভালবাসবার জন্য তাকে বলা হচ্ছে। একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি ঃ—

"ভিন্ন প্রকৃতি আজ অপেক্ষায়
তোমার—
আয়ত্ত করতে হবে তাকে—
পুরান দিন বিস্মৃতির গহ্বরে—
ফেলতেই হবে তোমাকে।
পিতার স্নেহ পড়ে থাক পিছনে
স্বামীর পিতাকেই ভালবাসার জন্য।
সকলকে খুশী রাখার ভাষা
তোমার দরকার,—
হৃদয়ের গভীরতা জাগাও বধূ!"

স্বামীকে না জাগিয়ে যেন সে ভোরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, সে উপদেশই

বর্ষিত হচ্ছে তার উপর ঃ—

"ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে এবার—
ওঠ তুমি, স্বামীর পার্শ্বদেশ থেকে
তাঁকে নিদ্রিত ও সুস্থ রেখে— ।"
এবার তাকে বলা হচ্ছে ঃ—
"গৃহের মধ্যে গিয়ে—
আগুন জ্বালাও পাইনের কাঠিতে—
গোশালা পরিষ্কার করতে যাও
তারপর ।
খাবার প্রস্তুত করে রাখ—
সমস্ত গরুগুলির জন্য— ।"

তার প্রতি উপদেশের আর অন্ত নেই। গম পেষাই, জলতোলা, সুতোকাটা ও বোনা সে সমস্ত কাজ তো করতেই হবে।

"তোমার পোশাক তৈরীর জন্য—
যত গজ কাপড় দরকার—
বুনতেই হবে তো ।
হাতের আঙুল চালিয়ে
ত্বরা করে—
বোনার কাজ শেষ কর গো ।"

বাড়ীতে অতিথি এলে তাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

"আরামে বসতে অনুরোধ কর
অতিথিকে ।
কথাবার্তা বল আত্মীয়ের ভাষায়
বলার ভঙ্গীতে খুশী কর তাকে,—
খাবার প্রস্তুত যতক্ষণ না হয় ।"

"অজানা অতিথির বিদায় বেলায়—
যখন বলছেন তিনি, 'আচ্ছা আসি'—
সঙ্গে তার যেও না এক পাও—
বাড়ীর দরজার বাইরে— ।
স্বামী তোমার রুষ্ট হতে পারেন
তাতে ।
প্রিয়তমকে নিরানন্দ করা
অধর্ম জেনো ।"

সমস্ত অধ্যায়টিই এককালীন ফিনিস সমাজের একটা ধারণা দেয়। ফিনল্যাণ্ডে প্রত্যেকেই গর্বের সংগে 'কালেভালা' পড়েন। মিঃ ওয়াম্পুলা এ বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ আমাদের উপহার দেন। সে রাতই আমাদের ফিনল্যাণ্ডে শেষ রাত। ওয়াম্পুলা পরিবারের সকলে মিলে পিয়ানো বাজিয়ে 'কালেভালা' থেকে গান গেয়ে শোনালেন।

"নুরমিইয়ারভি" গ্রামে একটি অতি সাধারণ কৃষক পরিবারের বাড়ীতে গেলাম। আমাদের অভিনন্দন জানালেন তাঁরা। বাড়ীর গৃহিণী প্রাঙ্গণের আপেল গাছটি জোরে ঝাঁকালেন,—পাকা পাকা আপেল ঝরে পড়ল মাটিতে। সেই ফল আমাদের দিলেন তিনি। আমরা মহানন্দে গ্রহণ করলাম। তাদের পারিবারিক 'সাওনা'—ফিনদেশীয় স্নানঘর—আমাদের দেখালেন। ফিনল্যাণ্ডের প্রত্যেক কৃষক পরিবার এক একটি 'সাওনা' রাখা পছন্দ করে। এ পরিবারের অতি পরিচ্ছন্ন ঘরদোর এবং ব্যবহার ইত্যাদি কৃষ্টির পরিচায়ক।

ফিরে আসার পথে ভিন্ন পথ ধরলাম গ্রাম্য জীবনকে আরও গভীরভাবে দেখার জন্য। ছবির মত সাজানো গ্রাম। বেশ বড় একটা বাড়ীর কাছে যখন এলাম ডাঃ কালিওকে জিজ্ঞেস করলাম এই অপরিচিত কৃষকের বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখতে পারি কিনা। গাড়ী থেকে নামলাম। ডাঃ কালিও ভেতরে গিয়ে আমাদের ইচ্ছে জানালেন। কৃষক ভদ্রলোক এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ১৫০ একর জমির মালিক এই কৃষক। তাঁর বাড়ীতে 'এ, আই, ভি' পদ্ধতিতেই গরুর খাবার ইত্যাদি জমা করে রাখা হয়। তাঁর মতে এ ব্যবস্থা অতি সন্তোষজনক। প্রত্যেকটি কামরা তিনি খুলে দেখালেন। বাড়ীটির সমস্ত ব্যবস্থা এমন সুন্দর যে ভারতীয় শহরের খুব কম বাড়ীতেই এ রকম আরাম পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। একজন কৃষকের বাড়ীতে এ রকম উঁচুদরের কৃষ্টির চিহ্ন আমাদের মুগ্ধ করল।

রাত্রিবেলা মিঃ কাল্লিনেনের বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ। মিসেস কাল্লিনেন শ্যামদেশীয় একটি বিড়াল কোলে নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ছেলেমেয়ে তাঁর কেউই নেই, বিড়ালগুলিকেই ভালবাসেন ছেলেমেয়ের মত। মিঃ এবং মিসেস কাল্লিনেন দু'জনেই দিলখোলা, খোসামেজাজী এবং 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু' গোছের লোক। মিঃ কাল্লিনেন ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র এনেছিলেন সে সমস্ত আমাদের দেখালেন মিসেস কাল্লিনেন। তারপর ভারতীয় সাধুদের সম্বন্ধে লেখা একটি বই দেখালেন। দুঃখের বিষয় বইটির নামটি ভুলে গিয়েছি, এই বই-ই আমেরিকাতেও দেখেছিলাম। আমাদের নিশ্চিত মত এ ধরণের বই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রহসন মাত্র। সমস্ত পশ্চিমী বন্ধুদের একথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, অধ্যাত্মবাদের রাস্তায় কোথাও 'পাক-দণ্ডীর' ব্যবস্থা নেই এবং ধর্মজগতে রহস্যবাদেরও কোন স্থান নেই।

মিসেস কাল্লিনেন ভারতবর্ষের সাপের কথা জিজ্ঞেস করলেন। ইয়োরোপের

উত্তরাংশের দেশগুলির ধারণা ভারতবর্ষের চারদিকে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সেদেশে বাস করা খুবই বিপজ্জনক। প্রকৃত অবস্থা তাঁদের বুঝিয়ে বললাম যে, বৎসরে যত লোক মারা যায় তার মধ্যে অতি সামান্য অংশই মরে সাপের কামড়ে। আরো বললাম ইয়োরোপের যে সমস্ত লোক নিজেদের সভ্য বলে অহঙ্কার করে ভারতবর্ষের সর্পকুল তাদের তুলনায় অর্ধেক বিপজ্জনক নয়! এ কথা সমস্ত পৃথিবীর লোক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সকল জন্তুর মধ্যে মানুষই সর্বাধিক হিংস্র! তাঁকে ভারতবর্ষে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললাম তাঁর স্বামীর মতই নিরাপদে তিনি স্বদেশে ফিরে আসতে পারবেন। তিনি তাঁর গ্রাম্য জীবনের নানা গল্প করছিলেন। নিজে তিনি যে সমস্ত আলু উৎপন্ন করেছেন সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর গর্বের সীমা ছিল না। তারপরে আমাদের প্রশ্ন করলেন কেন আমরা গরুর বা শূকরের মাংস খাই না। আমরাও মিঃ কাল্লিনেনকে জিজ্ঞেস করি গত যুদ্ধের পরে ফিনল্যান্ড এ রকম উল্লেখযোগ্য উন্নতি কি করে করল? তার উত্তর আগেই উল্লেখ করেছি, নতুন করে আর বললাম না। শুধু যে খাওয়াটিই উপভোগ করলাম তা নয়, কথোপকথনও হয়েছিল সমান আনন্দের।

সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ। সকালবেলা আমরা প্রথমে দেখি হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরে গেলাম "মেনারহাইম মিউজিও" দেখতে। ফিনিস রিপাব্লিকের সভাপতি ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মেনারহাইম্। সমস্ত দেশেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। মধ্য এশিয়া, চীন ও নেপাল পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। মধ্য এশিয়া এবং অন্যান্য জায়গা থেকে তিনি বুদ্ধমূর্তি এবং অনেক প্রাচীন স্মরণীয় জিনিস সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এই যাদুঘরে তা সযত্নে সুরক্ষিত হয়েছে। যে সকল বাঘ তিনি শিকার করেছিলেন তাদের চামড়া ইত্যাদি খুব গর্বের সঙ্গেই দেখান হ'ল।

তারপর মিঃ ভিক্ষ্ট্রম্ আমাদের লাঞ্চে নিয়ে গেলেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকেও এ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের ডিরেক্টর মিঃ আর এইচ ওস্তিনেনও ছিলেন। প্রাক্ সরকারে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিও সরকারের এক অংশ ছিল। এতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা কথা ও আলোচনার অধিক সুযোগ হল। শিক্ষার সাধারণ প্রয়োজনীয়তা নিয়েই আলাপ ইত্যাদি হ'ল। সাধনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল ফিনল্যান্ডের কোন্ জিনিস তাকে বেশী আকর্ষণ করেছে, সে জবাব দিল,—"লোকজনের দীর্ঘ উন্নত দেহ এবং চমৎকার স্বাস্থ্য।"

লাঞ্চের পর মিসেস ওয়াম্পুলা আমাদের নিয়ে গেলেন ফিনল্যান্ডের বিখ্যাত পোর্সেলিন ফ্যাক্টরী "এরেবিয়া" দেখাতে। সর্বদিক বিচারে এ কারখানায় প্রস্তুত মাল খুবই উন্নতশ্রেণীর মনে হল। নক্শা ইত্যাদি আঁকবার জন্য নামজাদা শিল্পী প্রভৃতি রয়েছেন। ফিনিস শিল্পীদের রুচিবোধ যে কত বেশী চীনামাটির সুন্দর

সুন্দর কাজগুলিই সে কথা বুঝিয়ে দেয়। সমস্ত বিভাগগুলি ঘুরে ফিরে দেখলাম। এত অধিক সংখ্যক নারী কর্মী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। যে ধরণের কাজ এ'রা করছেন বাংলা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা সে কাজ বেশ ভালভাবেই করতে পারেন। ১৪০০ জন কর্মীর মধ্যে প্রায় এক হাজার কর্মীই নারী এবং প্রায় চার শত মাত্র কর্মী পুরুষ। সাধারণ একজন কর্মী বেতন পান প্রতি ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ ফিনিস মার্ক হিসাবে (১০০ ফিনিস মার্ক ১৷৷০) বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্য অনেক বেশী টাকা বেতন পান।

এর পরে যে জায়গা দেখতে গেলাম তাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম দেখতে গেলাম, হিলুভীই এখানে আমাদের পথ-প্রদর্শক। পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট যত স্পোর্টস বিল্ডিং আছে তাদের মধ্যে হেলসিঙ্কি ষ্টেডিয়াম একটি। শীর্ষদেশ থেকে সমস্ত শহরের সুন্দর দৃশ্যটিও দেখা যায়। এ সত্যিই লক্ষ্য করবার মত যে, ফিনল্যাণ্ডের জনসংখ্যা মাত্র চল্লিশ লক্ষ। অথচ সেখানে এ রকম অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম রয়েছে। শুনে দুঃখ পেলাম, সেখানকার খেলাধুলায় ভারতবাসীরা তেমন কোন নাম রেখে আসতে পারেনি।

ফিনল্যাণ্ডে প্রায় প্রত্যেকেই বলেন যে, ফিনিস স্নান ঘর "সাওনা"র অভিজ্ঞতা না নিয়ে ফিরে যাওয়াই উচিত নয়। কিন্তু যখন মিঃ ওয়াম্পুলার কাছে শুনলাম স্ত্রী ও পুরুষের স্নানের ব্যবস্থা পৃথক হলেও নারী-কর্মীই উভয় দিকের কাজ করে, তখন আমি ও জন সেখানে না যাওয়াই স্থির করলাম। মিসেস ওয়াম্পুলা তাই শুধু সাধনা ও তাঁর নিজের জন্য জায়গা রিজার্ভ করলেন। যদি আগে থেকেই জায়গা রক্ষিত না হয়, তা হলে স্নানঘরে ঢোকার আগে অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। স্নানের পরে সাধনা খুব সতেজ ভাব অনুভব করল।

"এ স্নান ভারী আরাম দেয়,"—বললে সে।

ফিনল্যাণ্ডের বাইরের পাঠকদের জ্ঞাতার্থে "সাওনা" সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

এ স্নানের চারটি স্তর আছে। (১) কামরার ভিতর কাঠের টুকরা দিয়ে তৈরী বাঁশের মাচাং-এর মত জায়গায় উঠে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। ষ্টীম দিয়ে এ ঘরকে এত উত্তপ্ত করা হয় যে, গা থেকে ঘাম ঝরে জলের মত। সুগন্ধ জলসহ বার্চপাতা দিয়ে তারপর শরীরকে খুব পেটান হয়। (২) অন্য কামরায় নিয়ে শরীরকে সাবান দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করা হয়, প্রথমে ঠাণ্ডা ও পরে গরম জল দিয়ে। (৩) তৃতীয় কামরায় গিয়ে শুকনো গামছা দিয়ে মাথা ও পা বেঁধে প্রায় ৫ মিনিট শুয়ে থাকতে হয়। তখন কমলালেবুর রস অথবা মদ ইত্যাদি অন্য পানীয় দেওয়া হয়। (৪) ঠাণ্ডা জলের "সুইমিং পুলে" সাঁতার কাটতে হয়। এই তিন কামরাতেই একজন স্নানার্থীর সমস্ত যত্ন নেয় একজন নারী কর্মী। নিজে নিজে স্নান করার ব্যবস্থাও আছে। এ ধরণের স্নান বাতরোগীর পক্ষে নাকি খুব ভাল।

মিঃ ওয়াম্পুলা আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর শাশুড়ীও সেখানে ছিলেন। যেমনটি হয়ে থাকে বাঙালী পরিবারের দিদিমা, তিনি ঠিক তাই। খাওয়া-দাওয়ার পরে সমস্ত পরিবার একসঙ্গে 'কালেভালা'র গান গাইলেন। সাধনাও দুটি গান করল। পরদিনই আমাদের ফিনল্যাণ্ড ছেড়ে আসার কথা। তাই ওয়াম্পুলা-পরিবার সাড়ে এগারোটার আগে কিছুতেই হোটেলে আমাদের আসতে দিলেন না। সমস্ত ইয়োরোপে দশটার পরে শুতে গিয়েছি মাত্র হাতে গোনা কটি দিন,—আজকের দিন তার মধ্যে একটি। কিন্তু কোন রকম বিরক্তি বা অস্বস্তি বোধ করবার সুযোগই তাঁরা দিলেন না। সমস্ত পরিবারের স্নেহ ও যত্ন সারাক্ষণ আমাদের আনন্দে ভরিয়ে রাখল।

৯ই সেপ্টেম্বর। সকালবেলা মিঃ কাল্লিনেন আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রমিকদের একত্র হবার নিজেদের বাড়ী দেখাতে। একটি সুন্দর অফিস-ঘর, একটি মিটিং-হল আছে সেখানে। এক হাজার লোক সে হলে বসতে পারে। তারপরে নিয়ে গেলেন "কো-অপারেটিভ সোসাইটি"র বাড়ী দেখাতে। ফিনল্যাণ্ড কনজিউমারস্ কো-অপারেটিভের জন্য বিখ্যাত, আর ডেনমার্ক বিখ্যাত কৃষি কো-অপারেটিভের জন্য।

১৯৫১ সালের শেষের দিকে ফিনল্যাণ্ডে মাল যোগানদার সমিতির সংখ্যা ছিল ৪৯৮ এবং তাদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৯,৯১,৬৮২ জন। সমস্ত জনসংখ্যার শতকরা ২৪ জন হয় ঐ সংখ্যা। যদি সদস্যদের পরিবারকে গণনা করে সংখ্যা স্থির করা হয়, তাহলে বলতে হবে, সমস্ত দেশের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক লোক কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা দ্বারা সংগঠিত। এভাবে দেখা যায় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মাল ব্যবহারকারী কো-অপারেটিভের দিক থেকে ফিনল্যাণ্ড একটি শ্রেষ্ঠ সংগঠিত দেশ।

সমবায় আন্দোলন ফিনল্যাণ্ডে দু'ভাগে বিভক্ত। একটি শাখায় (এস. ও. কে) অধিকাংশই কৃষিকাজে লিপ্ত লোকেরা আছে। অন্য শাখায় (কে. কে) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা শ্রমশিল্পী। সদস্যসংখ্যা দুই শাখাতেই প্রায় সমান এবং বিক্রয়ও প্রায় সমস্তরের।

সমবায় সমিতি থেকে আমরা দেখতে গেলাম হেরত্তোনিয়েমী সমবায় শিক্ষায়তন। এটি নূতন তৈরী এবং নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভারী সুন্দর পরিবেশে হেলসিঙ্কি থেকে ছয় মাইল দূরে এই বিদ্যালয়। সমবায়-কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য এটি। যে ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেও দেখলাম, তাও প্রশংসনীয়।

তার পরের দর্শনীয় এবং ফিনল্যাণ্ডের অতি প্রয়োজনীয় স্থান ছিল অধ্যাপক ভিরত্তানেনের খামার। হেলসিঙ্কি থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে এই খামার। যাবার পথে মিঃ কাল্লিনেন অধ্যাপক ভিরত্তানেনের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে মানুষ হিসাবে তাঁর সারল্য এবং কর্মস্পৃহার কথা বলছিলেন। খামারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম সে সব কথা কত সত্যি। বৃষ্টি পড়ছিল তখন। মিঃ কাল্লিনেন গোশালায়

প্রবেশ করে ভিরত্তানেনের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তাঁর পায়ে ছিল কাদা-মাটিতে ভর্তি রবারের বুট জুতো। দেখেই বুঝতে দেরী হল না তিনি খামারে চাষীর মত কাজ করছিলেন। তৎক্ষণাৎ গান্ধীনীতির স্পর্শ অনুভব করলাম এখানকার সর্বত্র! নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ছেলে কাজ করছে চাষীর মত!

আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম, তা ছাড়া হাতে আমাদের সময় খুব বেশী ছিল না, কারণ সেদিনই বিকালবেলা আমাদের হেলসিঙ্কি ছেড়ে আসার কথা। তা সত্ত্বেও অধ্যাপক ভিরত্তানেনের ছেলে যতখানি সম্ভব দেখালেন। গরুর পাল এবং যে সমস্ত মাঠে লুসার্ণ ও ক্লোভার জাতীয় গুল্ম জন্মায়—দেখলাম। আমাদের সুনিশ্চিতভাবে বলা হল যে, তাঁদের খামারে নাইট্রোজেনযুক্ত কোন কৃত্রিম সারই ব্যবহৃত হয়নি; কেবলমাত্র ফস্‌ফেট্ এবং পটাস ব্যবহার করা হয়। আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত হলাম।

হেলসিঙ্কি থেকে বিদায় নেবার সময় এল। মিঃ ও মিসেস ওয়াপ্পুলা তাঁদের দুই মেয়ে হিলেভী ও থেলমা আমাদের জাহাজে তুলে দিতে এলেন। ও'দেব ছেড়ে আসতে মন ব্যথায় ভরে গেল। কে জানে আর তাদের সঙ্গে কখনও দেখা হবে কিনা। তাঁদের ভালবাসা ও স্নেহের স্মৃতি চিরদিন আনন্দমধুর হয়ে জেগে থাকবে মনে।

আমাদের যাত্রার প্রত্যন্তভূমি ফিনল্যাণ্ড—যত দেশ ঘুরে বেড়ালাম তার মধ্যে তীব্রতম শীতের দেশ। কিন্তু ফিন জাতির হৃদয়ের উষ্ণতা বাইরের তুষারকে গলিয়ে দেয়। প্রকৃতিই এভাবে একের অভাবকে পূরণ করে অন্য কিছুর সাহচর্যে।

আমরা এবার ফিরে চলেছি ভারতবর্ষের দিকে। হেলসিঙ্কি থেকে কোপেন-হেগেন এলাম একটি ডেনিস জাহাজে করে। জাহাজ কোম্পানীর সৌজন্য মনে রাখবার মত। খাবার টেবিলে আমাদের সঙ্গে বসবার জন্য এবং অন্য সুখ-সুবিধে ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য একটি ইংরেজী জানা ডেনিস মেয়ে-যাত্রীর ব্যবস্থা করে দিল তারা। পথে দেখলাম গটল্যাণ্ড দ্বীপ। এটি এখন সুইডেনের অধীন। ভীসবী শহরও দেখি। জাহাজের বেতার ঘোষণা করে বলল,—এ শহর "ধ্বংসস্তূপ ও সুন্দরী রমণীর জন্য বিখ্যাত।" কোপেনহেগেন-এ পৌঁছালাম। আমাদের অভিনন্দন জানান হল 'ওয়াণ্ডারফুল কোপেনহেগেন' গানের সুর বাজিয়ে। রেলপথে কোপেনহেগেন থেকে এসবিয়ারি এলাম, হারউইচ থেকে ব্রিটেনের জাহাজ ধরবো এই ইচ্ছা। দিনের বেলায় ডেনমার্কের ভেতর দিয়ে রেল ছুটে চলল,—একটা পূর্ণ ধারণা হল ও দেশের। বলতে গেলে মস্ত একটা সবুজ সমতলভূমি এ দেশ, মাঠে মাঠে নাদুসনুদুস গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে।

বিদায় ইয়োরোপ! ১৬ই সেপ্টেম্বর। আজ টিলবাড়ী ডককে অনেক পিছনে ফেলে আমাদের "হিমালয়ান" জাহাজ পাড়ি জমালো বোম্বে বন্দরের দিকে।

সপ্তম অধ্যায়

শেষ কথা

পাশ্চাত্যের দীর্ঘ ভ্রমণ সমাপ্ত হল। আমাদের দেখা দেশগুলির প্রায় সবগুলিই গণতান্ত্রিক, কয়েকটি প্রজাতন্ত্র। ছেলেমেয়েদের সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা অন্ততঃ চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত ঐ সকল দেশের সাধারণ ব্যবস্থা। কয়েকটি দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়সের সীমা পনেরো পর্যন্ত—এমন কি ষোল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। গণতন্ত্র কার্যকরী করার এটিই প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কিন্তু সকলের জন্য সমান সুযোগ সেখানে নেই। বাধ্যতামূলক শিক্ষার মত এটিও অত্যাবশ্যক। কোন কোন দেশে অবশ্য সে পথেই শিক্ষা-সংস্কার গতি ফিরিয়েছে। যত শীঘ্র জনসাধারণ বুঝতে শিখবে যে, গণতন্ত্রের এটিই যুক্তিসিদ্ধ আঙ্গিক, ততই মঙ্গল। আর একটি ত্রুটি আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, তা হ'ল শিক্ষা। এ সমস্ত দেশ অনুচিতভাবে জাতিকেন্দ্রীক। জাতির স্বার্থের প্রতি অতি মাত্রায় জোর দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব এবং হিংসা। সমগ্র মনুষ্য জাতি-চরিত্রের একত্ববোধক মনোভাব সৃষ্টির উদ্যম নেই সেখানে। দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম-নির্বিশেষে মানব-সুখ বৃদ্ধিই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মাতৃভাষা এ সমস্ত দেশেই শিক্ষার বাহন, এ অতি স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

ছাত্রদের যদি উপযুক্ত পুষ্টি না হয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল না হয়, তা হলে শিক্ষাকে ঠিক মতো গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এই সহজ সত্যকে এ সকল দেশই স্বীকার করে নিয়েছে।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ; সুতরাং শিক্ষা-সংস্কারের সাধারণ চাহিদা জেগেছে। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা এ কথাই বলছে যে, আমাদের নির্ভীকভাবে চিন্তা এবং কাজ করা দরকার—যাতে আমাদের দেশের প্রতিভার উপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা-প্রণালী সমগ্র দেশের প্রান্ত ও প্রত্যন্তে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সম্ভব হয়। এরই উপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ এবং জগতের অগ্রগতিতে আমাদের দানের হিসাব। আমাদের এই অভিমত, যে কোন সংস্কারসাধনে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন ঃ

(১) সর্বজনীন শিক্ষা, অন্ততঃ চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত। (২) সকলের জন্য সমান সুযোগ। (৩) জগতের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা। জাতির কল্যাণ এরই অন্তর্ভুক্ত। (৪) মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন। (৫) প্রচুর পুষ্টি ও শরীরের যত্ন।

আরও সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত বুনিয়াদী শিক্ষায়

এ সমস্ত বিষয়ই আছে এবং এই প্রণালী ভারতীয় প্রতিভা বিকাশের সহায়ক। কিন্তু তাতে এ কথা বোঝায় না যে, তিনি শেষ কথা বলে গেছেন। দেশের বিভিন্ন অংশের নানা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং আসল বস্তুকে অবিকৃত রেখে এ ব্যবস্থার অদল-বদল হওয়ার যথেষ্ট রাস্তা রয়েছে।

আজকের পশ্চিম গত দুই কি তিন শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফল। কোন কোন ইউরোপীয় জাতি এবং আমেরিকা এ ব্যাপারে অগ্রগামীর ভূমিকা নিয়েছে। প্রতিচীর নানা দেশে এসে প্রাচ্যের একজন সাধারণ ব্যক্তির চোখ ঝলসে যাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির চাকচিক্য দেখে। অবশ্য ও সব দেশ বহু আবিষ্কার ইত্যাদির জন্য প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বিজ্ঞানকে লাভের উপায় হিসাবে যতটা ব্যবহার করা হয়েছে, মানব-সমাজের সাধারণ কল্যাণের জন্য ততটা নয়। সেজন্য মাত্র কয়েকজনের পার্থিব সম্পদ সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, অন্যের ক্ষতিসাধন করে। বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিকে শোষণ করার কাজে সাহায্য করেছে পশ্চিমী বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সৌন্দর্যকে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। সৌন্দর্য যদি ব্যবসায়ের সামগ্রী হয়, অধোগতি তা হলে অনিবার্য। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির লম্বা ফিরিস্তিসত্ত্বেও লণ্ডন বা নিউইয়র্কে সুখী চেহারা খুবই কম দেখা যায়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দেখেছি ও দেশে, যাঁরা এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং স্রোতের গতি ফেরাবার চেষ্টা করছেন।

ভারতবর্ষে আমরা শোষিত হতে চাই না। সুতরাং অন্যদের শোষণ করা আমাদের চিন্তায়ও স্থান পেতে পারে না। অবশ্য দুর্ভাগ্য আমাদের পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ব্যভিচার যা অগ্রসর জাতির লোকেরা ত্যাগ করার চেষ্টা করছে, সেগুলিই আমদানি হয়েছে ভারতবর্ষে। এমন কি বিজ্ঞানবিদেরা নিজেদের জন্য বিশেষ সুবিধা ইত্যাদির দাবী করে "নব ব্রাহ্মণ" সমাজের সৃষ্টি করছেন। হুঁসিয়ারী দিতে চাই এ বিষয়ে।

বিজ্ঞানের জয়তিলক সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর নির্ভর করতে বাধ্য। প্রকৃতিই এভাবে ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডেনমার্কে লোহা অথবা কয়লা নেই, ব্রিটেনে তা পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ডেনমার্কে সুবিধা আছে নিজ প্রয়োজনের অধিক দুধ, ডিম এবং মাংস উৎপাদনের, অথচ ব্রিটেনের সে সুবিধা নেই। সুতরাং ব্রিটেনের উচিত ডেনমার্ককে লোহা এবং কয়লা দেওয়া, বিনিময়ে ডেনমার্কের উচিত ব্রিটেনকে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ডিম মাংস সরবরাহ করা। আজ এ সকল আদান-প্রদান নির্ভর করে কথিত দেশগুলির নিজ নিজ ইচ্ছার উপর। তারা সরবরাহ করতে পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়। বিশ্বাস করি, পৃথিবীর শান্তির তাগিদে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হওয়া এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরই মধ্যে বিভক্ত হওয়া দরকার।

এ সমস্ত দেশ পরিভ্রমণকালে একটি জিনিস সুস্পষ্ট হল যে, শ্বেত-

জাতিরা নিজেদের জন্য এবং তাহাদের জনসংখ্যার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখন্ড সংরক্ষণ করে রেখেছে। অথচ অন্যদের মাথা গুঁজবার স্থানটুকুও হয় না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পাশ্চাত্যের নিজ কার্যপ্রণালীর এই গণতন্ত্র-বিরোধী প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল থাকা নিতান্ত দরকার।

পশ্চিম আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে, পার্থিব সম্পদই শুধু সুখ আনতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক দুই সম্পদের মিলন।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতবর্ষ মহান হতে পারবে না। নিজ বিশিষ্ট ভঙ্গীতে তাকে অগ্রসর হতে হবে। অবশ্য অন্যান্য দেশের যা কিছু ভাল, তাকে গ্রহণ করে এবং নিজ প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে নেবে সে। এ কথাও অনুভব করেছি,—জগতের অগ্রগমনে ভারতবর্ষেরও দান দেবার আছে।

"পূর্ব পূর্বই এবং পশ্চিম পশ্চিমই,—এ দুয়ের মিলন অসম্ভব"—এই উক্তি যে কত অসার! এই দুইয়ের মিলন চিরদিনই ঘটবে, কারণ মানবপ্রকৃতি মূলতঃ সর্বত্রই এক।